জাতি রাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮-১৯৮৮): উত্তরবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পি.এইচ. ডি. ডিগ্রী (আর্টস) (Doctor of Philosophy (in Arts) এর জন্য প্রদত্ত থিসিস (গবেষণা সন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় , কোলকাতা--৭০০০৩২

গবেষক

যূথিকা বর্মা

সহকারী অধ্যাপক , ইতিহাস বিভাগ

নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ , নবগ্রাম , হুগলী

ইতিহাস বিভাগ ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা—৭০০০৩২

২০১৭

জাতি রাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮-১৯৮৮): উত্তরবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতি

(JATI RAJNITI O JATIYA RAJNITITE UPENDRANATH BARMAN (1898-1988): UTTARBANGER SAMAJ O RAJNITI)

A THESIS SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF HISTORY OF JADAVPUR UNIVERSITY FOR THE 'DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY' (IN ARTS)

By
JUTHIKA BARMA
Asst. Professor in History
Nabagram Hiralal Paul College, Hooghly

Under the Supervision of
Prof. Mahua Sarkar
Department of History, Jadavpur University
Kolkata 700032

Department of History
Jadavpur University
Kolkata—700032
2017

Certified that the Thesis entitled

"জাতি রাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮-১৯৮৮): উত্তরবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতি" (JATI RAJNITI O JATIYA RAJNITITE UPENDRANATH BARMAN (1898-1988): UTTARBANGER SAMAJ O RAJNITI) submitted by me for the Award of 'Doctor of Philosophy in Arts' at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Prof.Mahua Sarkar , Professor, Department of History, Jadavpur University ; And that either this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree/diploma anywhere/elsewhere .

Candidate

(Juthika Barma)

Dated ----------------------

Countersigned by the Supervisor

Prof. Mahua Sarkar
Department of History
Jadavpur University
Kolkata 700032

Dated -------------------------

মুখবন্ধ

সাম্প্রতিক কালে ভারতের ‘জাত-পাত’ ও ‘জাতি হিংসার’ (Caste violence) কয়েকটি ঘটনা গণমাধ্যমের দৌলতে ভারত ও ভারত বহির্ভূত বিশ্বের সচেতন মানবসমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একইসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জাতির রাজনীতিকরন (Politicization of Caste) ও নির্বাচনী রাজনীতিতে ‘জাতের’ (Caste) যথেচ্ছ ব্যবহার সমাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ‘সামাজিক সত্তা’ থেকে জাতির (Caste) ‘রাজনৈতিক অস্ত্রে’ পরিণত হওয়ার এই বৈশিষ্ট্য নতুন কোনো বিষয় নয়। ভারতে এটা শুরু হয়েছিল বিংশ শতকের গোড়ায়। জাতির রাজনীতিকরনের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা খুঁজে পাই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির ন্যায়বিচার (Justice) ও সামাজিক অধিকার (Social Rights) অর্জনের আন্দোলন, ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকারের ‘বিভাজন ও শাসন নীতি’ (Divide and Rule Policy) ও সাম্প্রদায়িক শক্তির পারস্পরিক সংঘাত ও আদানপ্রদানের এক জটিল ইতিহাস। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ‘নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির নিজস্ব জাতি-ভাবনা কিভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাতে প্রবাহিত হয়েছিল’ ও ‘স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পুনরায় নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির মধ্যে কেন আঞ্চলিক মানসিকতার জন্ম হল’ এই দুটি প্রশ্ন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত পাঠ গ্রহণ করার সময়। পরবর্তীকালে (২০১০)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি.র জন্য গবেষণার বিষয় বাছাই করতে গিয়ে আমি আমার পূর্ববর্তী প্রশ্নগুলোকে পুনরায় সামনে নিয়ে আসার সুযোগ পেলাম। আর উদাহরণ হিসাবে খুজে পেলাম উপেন্দ্রনাথ বর্মনের (১৮৯৮-১৯৮৮) মত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে যিনি তার জীবন শুরু করেছিলেন রাজবংশী জাতির মত একটি নিম্নবর্ণীয় জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু তার জাতিচেতনা (Caste Consciousness) ধীরে ধীরে ভারতের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও স্বাধীনতার পরে তিনি সর্বতোভাবে জাতীয়ভাবনাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তা সত্বেও তার জীবদ্দশাতেই উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে জন্ম নেয় আঞ্চলিকতার মনোভাব (Regionalism)। তাই উপেন্দ্রনাথ বর্মনের সময়কালকে (১৮৯৮-১৯৮৮) ধরে নিয়ে আমি ‘জাতি-রাজনীতির জাতীয় রাজনীতিতে রূপান্তর’ ও ‘স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরবঙ্গে আঞ্চলিকাতাবাদ বিকাশের ইতিহাস’ আলোচনা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আর আমার এই প্রয়াসকে চুড়ান্ত রূপ দিতে যিনি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমার গবেষণার তত্বাবধায়ক অধ্যাপক মহুয়া সরকার (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) । গবেষণার মূল প্রশ্নগুলো তৈরি করতে ও আমার ভুলত্রুটি শুধরে দিয়ে তিনি আমার গবেষণাকে বাস্তব রূপ দিতে নিরলসভাবে সাহায্য করেছেন। আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ।

বর্তমান গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগার, লেখ্যাগার ও প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ‘জাতীয় গ্রন্থাগার’ (কলকাতা), উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রিয় গ্রন্থাগার (কোচবিহার), ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারি য়েট লাইব্রেরি (কলকাতা), ওয়েস্ট বেঙ্গল স্ট্যাট্ আরকাইভ্স

(কলকাতা), কালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট (কলকাতা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (কলকাতা), কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার (যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যালয়, কলকাতা), বিভাগীয় গ্রন্থাগার (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা), তারকনাথ সংগ্রহশালা(আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা), ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও তার লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও প্রদত্ত ভাষনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন স্বর্গীয় পঞ্চানন বর্ম্মন (মিলনপল্লী, দম্‌দম্‌), স্বর্গীয় সুশান্ত হালদার (অদ্বৈত মল্লবর্মন এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, কলকাতা), শ্রীঅরবিন্দ ডাকুয়া (মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার), ড. রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (তুফানগঞ্জ, কোচবিহার), শ্রীঅজিত বর্মন (জলপাইগুড়ি), প্রমুখ। আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

বর্তমান গবেষণাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের (বিকাশভবন, কলকাতা) বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মীদের। আমার এই গবেষণা কোনোভাবেই সম্পূর্ণ হত না যদি না আমি একবছরের Special Study Leave পেতে এদের সহযোগিতা না পেতাম। এক্ষেত্রে যাদের কথা বার বার মনে পড়ছে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ড. শম্পা কুন্ডু , ড. নিমাই চন্দ্র সাহা, ও মধুমিতা রায় (IAS, Secretary, Higher Education Department, Government of West Bengal)। আমি এদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার এই গবেষণার কাজকে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমার কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের (নবগ্রাম, হুগলী) অবদান কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এখানকার শিক্ষাকর্মী, আমার সহকর্মী ও কলেজের অধ্যক্ষ ড. শ্রীকান্ত সামন্তের অকুণ্ঠ সহযোগিতা সবসময় পেয়েছি। একইভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতা আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান গবেষণার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে শ্রীকৃষ্ণ কুমার সরকার ও অঙ্কন রায়। আমি এই ক্ষুদ্র পরিসরে এদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের এই পর্বে আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই। এটি হল কয়েকটি বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আমি *আকাদেমি বানান অভিধান* (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা) অনুসরণ করেছি। বানান বৈচিত্র্য পরিহার করার জন্য 'আদমশুমারি', 'তপশিলি জাতি', 'সারণী' ইত্যাদি বানানগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য বানানের ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি যা আছে তার দায়ভার সম্পূর্ণ আমার।

যূথিকা বর্মা

সূচিপত্র

মুখবন্ধ *পৃ.* i

সংকেতাবলি *পৃ.* *vi*

সারণীসূচি *পৃ.* *viii*

পারিভাষিক শব্দাবলি *পৃ.* *x*

প্রথম আধ্যায়: ভূমিকা পৃপৃ.1-19

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঔপনিবেশিক বাংলার তপশিলি জাতিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, পৃপৃ.20-56

তৃতীয় অধ্যায়:ঔপনিবেশিক বাংলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন, পৃপৃ.57-108

চতুর্থ অধ্যায় : জাতি থেকে জাতীয় রাজনীতি ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন, পৃপৃ.109-175

পঞ্চম অধ্যায়: স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরবঙ্গ , আঞ্চলিকতা ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন: ১৯৪৭-১৯৮৮, পৃপৃ.176-236

ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার পৃপৃ.237-242

সংযোজনী পৃপৃ.243-280

গ্রন্থপঞ্জী পৃপৃ.281-300

সংকেতাবলি (Abbreviations)

AISCF= All India Scheduled Caste Federation/অল ইন্ডিয়া সিডিউল্ড কাস্ট ফেডেরেশন বা এ. আই. এস. সি. এফ.।

BKRKM = Bharatiya Koch Rajbangshi Kshatriya Mahasabha বা ভারতীয় কোচ রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভা।

BKRP= Bharatiya Kamta Rajya Parishad বা 'ভারতীয় কামতা রাজ্য পরিষদ'।

BLA=Bengal Legislative Assembly বা বাংলার বিধানসভা।

CPI=Communist Party of India/কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা সি.পি.আই.।

CPI (M)= Communist Party of India (Marxist)/ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) বা সি. পি. আই. (এম)।

FB= Forward Bloc বা ফরওয়ার্ড ব্লক।

ISCP= Independent Scheduled Caste Party বা ইন্ডেপেন্ডেন্ট শিডিউল্ড কাস্ট পার্টি।

KP= Krisak Praja Party বা কৃষকপ্রজা পার্টি।

KPP= Kamtapur Peoples' Party/ কামতাপুর পিপলস পার্টি বা কে.পি.পি.।

KRI= Koch-Rajbangshi International বা কোচ-রাজবংশী ইন্টারন্যাশানাল।

LF= Left Front বা বামফ্রন্ট।

MFB= Marxist Forward Bloc বা এম.এফ. বি.।

ML=All India Muslim League/অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ বা মুসলিম লীগ।

MLA=Member of Legislative Assembly বা বিধায়ক।

MLC= Memebr of Legislative Council বা বিধান পরিষদের সদস্য।

MOBC= Most Other Backward Class।

PSP= প্রজা সোসালিস্ট পার্টি বা পি.এস. পি.।

PULF=Peoples' United Left Front।.

RSP= Revolutionary Socialist Party বা আর. এস. পি. ।

SC= Scheduled Caste/শিডিউল্ড কাস্ট বা তপশিলি জাতি।

SSP= Somyukta Socialist Party বা এস.এস.পি.।

ST= Scheduled Tribe/শিডিউল্ড ট্রাইব বা তপশিলি উপজাতি।

SUCI= Socialist Unity Centre of India বা এস.ইউ. সি. আই.।

UF=United Front বা যুক্তফ্রন্ট।

UKD=Uttar Khanda Dal বা উত্তরখন্ড দল।

ULF=United Leftist Front.

UTJAS= Uttarbanga Tapasili Jati O Adibashi Songathan উত্তরবঙ্গ তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সংগঠন বা উতজাস ।

WPI= Workers Party of India বা ডবলু. পি. আই.।

সারণীসূচি

সারণী: ২.১: ১৯৩৬ এর আইন অনুযায়ী বাংলার তপশিলি জাতি। পৃ.30

সারণী: ২.২:বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির তালিকা , ২০০১। পৃ.32

সারণী: ২.৩: ১৮৮১ র আদমশুমারি অনুযায়ী পূর্ববাংলার কয়েকটি সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি সম্প্রদায়ের জনবিন্যাস। পৃ.34

সারণী: ২.৪: ১৮৮১ র জনগণনানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি সম্প্রদায়ের জনবিন্যাস। পৃ.36

সারণী: ২.৫: ঔপনিবেশিক বাংলার তপশিলি জনগোষ্ঠীর জনবিন্যাস (কোচবিহার ও ত্রিপুরা বাদে)। পৃ.37

সারনী: ২.৬: বাংলার কয়েকটি তপশিলি জাতির পেশাভিত্তিক অবস্থান। পৃ.40

সারণী: ২.৭: বাংলার তপশিলি জাতিগুলির শিক্ষাগত শ্রেণীবিন্যাস, ১৯২১। পৃ.46

সারণী: ৩.১: রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির মহামিলন ক্ষেত্রসমুহের বিবরণ। পৃ.80

সারণী: ৩.২: বিংশ শতকের প্রথম দশকে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত রাজবংশীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা। পৃ.89

সারণী: ৩.৩: ক্ষত্রিয় আন্দোলনকালে রাজবংশীদের স্থাপিত কতিপয় বিদ্যালয়ের বিবরণ। পৃ.92

সারণী: ৪.১: ১৯২৩র বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উত্তরবঙ্গের প্রার্থীদের তালিকা। পৃ.121

সারণী: ৪.২: চতুর্থ আইন পরিষদের (**১৯২৯-১৯৩৬**) সময় উপনির্বাচনে জয়ী Depressed Class প্রার্থীদের তালিকা। **পৃ. 124**

সারণী: ৪.৩: **১৯৩৭** সালের নির্বাচনে বাংলার বিধান সভার আসনগুলির বিবরণ। **পৃ.126**

সারণী: ৪.৪: **১৯৩৭** খ্রিষ্টাব্দের বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। **পৃ.128**

সারণী: ৪.৫: দেশীয় মদ ও দেশীয় ড্রাগের দোকানের পরিসংখ্যান। **পৃ.137**

সারণী:৫.১: উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (আদমশুমারি অনুযায়ী)। **পৃ.184**

পারিভাষিক শব্দাবলি (Glossary)

অন্ত্যজ(Outcaste)= সামাজিক মর্যাদাহীন ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্ণীয় জাতি যাদের অস্পৃশ্য, অধম সংকর , অসৎশূদ্র, ইত্যাদি নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

আদমশুমারি = জনগননা বা Census.

আড়ৎদার = Commission Agent, যারা মাছ, সব্জী, ইত্যাদির ব্যবসায় মধ্যবর্তী শ্রেণী/দালাল হিসাবে উপার্জন করেন।

গিরি = উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির কৃষিজমির মালিক বা সম্পন্ন স্বাধীন কৃষক যারা ভাগচাষি বা কৃষিক শ্রমিকদের সাহায্যে জমি চাষ করেন|

জাতি-রাজনীতি= জাতি(Caste)কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মকান্ড।

জাতীয় রাজনীতি = ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও আন্দোলন।

জেলিয়া কৈবর্ত্য=বাংলার একটি তপশিলি জাতি।

জোতদার= কৃষিজমির মালিক বা সম্পন্ন স্বাধীন কৃষক।

ডিপ্রেসড কাস্ট/ডিপ্রেসেড ক্লাস/ Depressed Caste/ Depressed Class= ঔপনিবেশিক ভারতে সরকার চিহ্নিত নিম্নবর্ণীয় জাতি যারা পরবর্তীকালে যা তপশিলি জাতি নামে চিহ্নিত হয়েছে।

তপশিলি জাতি= ১৯৩৬ এর The Government of India (Scheduled Caste) Order 1936 অনুযায়ী গৃহীত ও পরবর্তীকালে সংশোধিত বিভিন্ন আইন ও অধিনিয়ম

অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কতগুলো জাতি যাদেরকে তপশিলি জাতি (তফশিলি জাতি/ তফসিলি জাতি) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নৃগোষ্ঠীভিত্তিক বর্গীকরণ= Racial Classification

নিকাড়ি= Commission Agent, যারা মাছের ব্যবসায় মধ্যবর্তী শ্রেণী/দালাল হিসাবে উপার্জন করেন।

নমঃশূদ্র= বাংলার একটি তপশিলি জাতি।

পৌন্ড্র=বাংলার একটি তপশিলি জাতি।

বিধানসভা = Legislative Assembly.

বিধান পরিষদ=Legislative Council.

বিধায়ক= Member of Legislative Assembly

ভাটিয়া = পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু বা অভিবাসী যাদেরকে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় রাজবংশীগন 'ভাটিয়া' বলে চিহ্নিত করেন।

মালো বা ঝালোমালো = বাংলার একটি তপশিলি জাতি।

রাজবংশী=বাংলার একটি তপশিলি জাতি।

শুঁড়ি=বাংলার একটি তপশিলি জাতি।

'সংস্ক্রিয়া'= সংস্কার প্রকৃয়া, তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়দের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের থেকে সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করার প্রকৃয়া, Sanskritization Process.

হালুয়া= কৃষক, কর্ষনকারি, যে হাল চালায়, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক।

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

বহুবিধ জাতির (Caste) সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় সমাজ ও আধুনিক ভারতীয় রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'জাতি-রাজনীতি' (Caste Politics)। ঔপনিবেশিক আমলের বঙ্গ প্রদেশ ও স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। ঔপনিবেশক আমলের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ বিংশ শতকের গোড়া থেকে 'জাতীয় রাজনীতির' (National Politics) পাশাপাশি 'জাতি' (Caste) ও 'অঞ্চল' (Region) ভিত্তিক রাজনীতির ধারা এখানে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ফলে 'জাতি-ভিত্তিক রাজনীতি' থেকে 'জাতীয় রাজনীতির' মধ্যে প্রবেশ বা জাতীয় রাজনীতি থেকে জাতি, আঞ্চলিকতা বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে অভিগমন ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা - পরবর্তী বাংলাসহ ভারতের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জাতি-রাজনীতির (Caste Politics) গণ্ডী অতিক্রম করে জাতীয় রাজনীতির মধ্যে জাতির (Caste) সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করতে যারা প্রয়াসী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮-১৯৮৮)।

ঔপনিবেশিক বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতি ও পরবর্তীকালে জাতীয় রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের প্রবেশ ঘটেছিল মূলত জাতি-রাজনীতি কে কেন্দ্র করে। এই জাতি-রাজনীতির প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ ও বিংশশতকের গোড়ায় বাংলার বিভিন্ন নিম্নবর্ণীয় জাতিসমূহের (যারা পরবর্তীকালে 'তপ শিলি জাতি' বা ' Scheduled

Caste’ হিসাবে পরিচিত হয়েছেন) ‘আত্মচেতনাবোধ’ (Self Respect), ‘সম্মানজনক জাতি পরিচিতি নির্মান’, সমাজ সংস্কার ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের আন্দোলনের দ্বারা । ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব বিশেষকরে পাশ্চাত্যশিক্ষার বিস্তার, সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণ ও ১৮৭০ এর দশক থেকে আদম শুমারির পরিচালনা বাংলার নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির মধ্যে যে আত্মচেতনার সূচনা করেছিল তার প্রগতি ও পরিণতি রূপে বাংলায় কতগুলি জাতিভিত্তিক সামাজিক সংগঠন বা জাতিসভার জন্ম হয়েছিল। বিংশশতকের গোড়ায় নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির শিক্ষিত ও বিত্তশালী অংশ আত্মোন্নতি , সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও তাদের সমাজের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছিল। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন (*The Government of India Act, 1919*) গৃহীত হওয়ার পর প্রাদেশিক আইন পরিষদের (Legislative Council) নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সামাজিক আন্দোলনের এই নেতৃবর্গ তাদের জাতিসভাগুলিকে রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন।

ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন নিম্নবর্ণীয় জাতি বিশেষকরে নমঃশূদ্র (চণ্ডাল), পৌণ্ড্র (পোদ), মালো (ঝালোমালো বা মল্ল ক্ষত্রিয়), ভুঁইমালি, ইত্যাদির মতো উত্তরবঙ্গের রাজবংশীগণ পঞ্চানন বর্মার (১৮৭২-১৯৩৫) নেতৃত্বে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুরে ‘রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি’ নামে রাজবংশীদের একটি শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন তৈরী করেন। এই সমিতি নানাবিধ সামাজিক সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী দের ‘ক্ষত্রিয় পরিচিতি ’ নির্মানে জোর দিয়েছিল। পাশাপাশি শিক্ষাবিস্তার, সরকা রি চাকরিতে অংশগ্রহণ ও উন্নত বৃত্তি গ্রহণ করার

মাধ্যমে রাজবংশীদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছিল এই সমিতি। **১৯১৯** খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের (Bengal Legislative Assembly) প্রথম নির্বাচনে (**১৯২১**) রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির সামাজিক প্রভাবকে ব্যবহার করে পঞ্চানন বর্মা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে (**১৯২২, ১৯২৬, ১৯২৯**) রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি তার জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিল। ক্ষত্রিয় সমিতির এই 'নির্বাচন রাজনীতির' (Electoral Politics) সূত্র ধরেই পঞ্চানন বর্মার সুযোগ্য শিষ্য উপেন্দ্রনাথ বর্মন বাংলায় জাতি-রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হন। **১৯৩৫** খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চানন বর্মার মৃত্যু ও **১৯৩৫** এর *ভারত শাসন আইন (The Government of India Act, 1935*) গৃহীত হওয়ার পর রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি র মূল নেতারূপে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের আবির্ভাব ঘটে।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার বিধানসভায় (Legislative Assembly) 'জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি নির্বাচন ক্ষেত্র' (Jalpaiguri-Siliguri L egislative Constituency) থেকে নির্বাচিত হন উপেন্দ্রনাথ। **১৯৩৮** খ্রিস্টাব্দে বিধানসভার পনের জন Scheduled Caste (SC) বা তপশিলি জাতির সদস্যদের নিয়ে তিনি Independent Scheduled Caste Party (ISCP) গঠন করেন। **১৯৪১** থেকে **১৯৪৩** পর্যন্ত ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার সদস্য হয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন উপেন্দ্রনাথ বর্মন। হ ক সরকারের পতনের পর স্যার নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে নতুন সরকারের জন্ম হলেও (**১৯৪৩-৪৫**) উপেন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন (**১৯৩৯-৪৫**) ভারত তথা বাংলার রাজনীতির উত্তাল সময়ে উপেন্দ্রনাথ 'জাতি-

রাজনীতির’ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। নাজিমুদ্দিন সরকারের পতনের পর (১৯৪৫) বাংলার তপ শিলি জাতি গুলির একটা বড় অংশ জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে শুরু করে। অন্যদিকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে তপ শিলিদের একটা অংশ All India Scheduled Caste Federation (AISCF)এ যোগ দেয়। স্বাভাবিকভাবেই সর্বভারতীয় সংগঠনগুলোর সামনে বাংলার জাতিভিত্তিক সংগঠনগুলো ম্লান হয়ে পড়ে। বাংলার অন্যান্য জাতিগুলির মতো জাতীয়দলগুলোতে যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতিতে অন্তর্বিরোধের সূচনা হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে এই সমিতির নেতৃবর্গের একটা বড় অংশ জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন। এবং কেবলমাত্র একজন (নগেন্দ্রনাথ রায়) রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির প্রার্থীরূপে সফলতা পেয়েছিলেন। ১৯৪৬ এর নির্বাচনে AISCF ও জাতিভিত্তিক সংগঠনগুলোর চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও তপ শিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের সফলতা জাতি-রাজনীতির ভবিষ্যতকে সংকটাপন্ন করে তোলে। ১৯৪৬ এর নির্বাচনের পর জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বর্মন তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলেন। শেষপর্যন্ত ১৯৪৭ এর গোড়ায় কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে গণপরিষদের (Constituent Assembly) সদস্য নি র্বাচিত হন তিনি। ফলে উপেন্দ্রনাথ ‘জাতি-রাজনীতির সংকীর্ণ বৃত্ত’ পরিত্যাগ করে ‘জাতীয় রাজনীতির বৃহত্তর পরিসরে’ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত Provisional Parliament এর সদস্য, ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত লোকসভার নির্বাচিত সদস্য, ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের সদস্য, ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত বিধান পরিষদের

ডেপুটি চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। একইসঙ্গে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও প্রতিনিধিত্ব (Commonwealth Parliamentary Association, London, 1948, International Rice Commission, Rengun, 1950) করেন তিনি। তাছাড়া রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথ বর্মনের মত বাংলা তথা ভারতের এমন একটি চরিত্র নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক গবেষণার দাবিদার হতে পারে বিশেষ করে যিনি ঔপনিবেশিক আমল ও স্বাধীন ভারত উভয়েরই রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন বাংলা, ভারত ও বিশ্ব সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথের মনোভাব তার বহু রচনার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। ফলে তার রচনাসমূহের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণও একান্তভাবে জরুরি। তাছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী উত্তরবঙ্গে , জাতি ও ভাষা ভিত্তিক আঞ্চলিকতার বিকাশ ও সেবিষয়ে উপেন্দ্রনাথের জাতীয় রাজনীতির অবস্থান নিয়েও ঐতিহাসিক গবেষণা একান্তভাবে প্রয়োজন। এই সমস্ত কারণে উপেন্দ্রনাথ বর্মন ও তৎকালীন উত্তরবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতি অর্থাৎ ১৮৯৮ থেকে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় ব্যপ্তি নিয়ে বর্তমান গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১.পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন (Survey of Literature)

ঔপনিবেশিক ভারতের ‘জাতি রাজনীতি’র প্রেক্ষাপট ও ‘জাতীয় রাজনীতির’ সঙ্গে জাতি-রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে ইতিপূর্বে বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নৃপেন্দ্র

কুমার দত্তর *Origin and Growth of Caste in India* (Vol.1, 1931, Vol.2, 1965),[১] হিতেশরঞ্জন সান্যালের *Social Mobility in Bengal* (1981),[২] জয়া চ্যাটার্জ্জীর *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition 1932-47*(1994),[৩] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *Caste, Politics and the Raj* (1872-1937) (1990),[8] *Caste, Protest and Identity in Colonial Bengal: The Namasudras of Bengal 1872-1947* (1997),[৫] *Changing Border, Shifting Loyalties: Religion, Caste and the Partition in 1947* (1998),[৬] ও *Caste, Culture and Hegemony* (2004);[৭] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত *'জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ ' (১৯৯৮),*[৮] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দা শগুপ্ত ও উইলিয়াম ভ্যান স্যান্ডাল সম্পাদিত '*Bengal: Communities, Development and State*' (1994),[৯] রূপকুমার বর্মনের *The Partition of India and Its Impact on the Scheduled Castes of Bengal* (2012),[১০] *From Pods to Poundra: A Study on the Poundra Kshatriya Movement for Social Justice 1891-1956* (2014),[১১] *Changing Identities of the Scheduled Castes in Colonial and Post-Colonial Bengal* (2015),[১২] ও *Yes! The Scheduled Castes Can Write* : *Reflections on the Creative and Assertive Writings of the Scheduled Castes of Colonial Bengal* (2016);[১৩] ইত্যাদি গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বিভিন্ন নিম্নবর্ণীয় জাতির 'জাতি আন্দোল নের' ইতিহাস আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন সম্পর্কে এই গবেষণাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ থাকলেও

জাতীয় রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে কোনধরনের আলোকপাত এখানে লক্ষ করা যায় না।

রাজবংশী জাতি আন্দোলন ও উত্তরবঙ্গের আধুনিক ইতিহাস নিয়ে ইদানিংকালে গবেষণার ঝোঁক লক্ষ করা যায়। রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন নিয়ে স্বরাজ বসুর গবেষণা *Dynamics of a Caste Movement: The Rajbanshis of North Bengal , 1910-1947* (2003)[১৪] ও প্রবন্ধ *Colonial State and Indigenous Society: The Creation of the Rajbanshi Identity of Bengal* (1994);[১৫] মূলত ঔপনিবেশিক আমলের রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের উপর আলোকপাত করেছে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে জাতীয় রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের ভূমিকা ও উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখানে স্থান পায়নি। একইভাবে রূপকুমার বর্মনের প্রবন্ধ *"জাতি পরিচিতি গঠন, উত্তরণ ও এলিট নেতৃত্ব : ঔপনিবেশিক বাংলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি সমীক্ষা"* (২০০৪)[১৬] রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন সম্পর্কে নতুন ধারণার প্রবর্তন করলেও উপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে নেই।

তবে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের 'রাজনৈতিক গুরু' ও ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনী (১৮৭২-১৯৩৫) নিয়ে বহু মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে ক্ষেত্রনাথ সিংহের *"রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার জীবনী"* (সন ১৩৪৬)[১৭]; শিবেন্দ্র নারায়ন মণ্ডলের *"রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"* (১৯৭২);[১৮] উপেন্দ্রনাথ বর্মনের *"ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত"* (১৩৭৯ সন); [১৯] রঞ্জিত কুমার মণ্ডলের *Ray Saheb Panchanan: Life and Times* (2002);[২০] ইত্যাদি, পঞ্চানন বর্মার জীবনীর উপর বিশেষভাবে আলোকপাত

করেছে সেখানে ক্ষত্রিয় আন্দোলন ও জাতি রাজনীতিসহ জাতি রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথের প্রবেশ নিয়ে বিভিন্ন বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই রচনাগুলির শিরোনাম থেকে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে পঞ্চানন বর্মার মৃত্যুর পরবর্তী বিষয় এখানে আলোচিত হয়নি।

রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন তথা উত্তরবঙ্গে আঞ্চলিক রাজনীতির একটা বড় অংশ জড়িয়ে আছে রাজবংশী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও পরিচিতির ওপর। এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে নানাবিধ মতামতযুক্ত অনেকগুলো গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। রাজবংশী জাতির উৎপত্তি, পরিচিতি ও পরিচিতির বিবর্তন নিয়ে সুনীতি কুমার চ্যাটার্জ্জীর *Kirata-Jana-Kriti: The Indo-Mongoloids: Their contribution to the History and Culture of India (1951)*;[২১] চারু চন্দ্র সান্যালের *The Rajbanshis of North Bengal* (1965),[২২] প্রণব কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত *Kamata Cooch Bihar in Historical Perspective*(*2000*);[২৩] D.Nath এর *History of Koch Kingdom*(1988);[২৪] নির্মল দাশের *"উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ"(১৯৮৪)*;[২৫] রূপ কুমার বর্মনের *From Tribalism to State: Reflection on the emergence of the Koch Kingdom* (2007);[২৬] অম্বিকাচরণ সরকারের *"কোচ রাজবংশী জাতির ইতিহাস আরু সংস্কৃতি"* (১৯৭২);[২৭] দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকতের *"রাজবংশী ভাষা সা হিত্যর পরিচয়"* (অসমীয়া, ২০০০);[২৮] সুখবিলাস বর্মার প্রবন্ধ *"রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়"* (২০০২);[২৯] ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু জাতি -রাজনীতি ও 'জাতীয় রাজনীতিতে ' উপেন্দ্রনাথ বর্মনের অবস্থান এই রচনাগুলিতে স্থান পায়নি।

স্বাধীনোত্তর কালে বর্তমান উত্তরবঙ্গে নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনগুলিতে রাজবংশী সম্প্রদায় সহ অন্যান্য জাতির অংশ গ্রহণ নিয়ে তাই কিছু কিছু গবেষণা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে নির্মল চৌধুরীর '*ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজবংশী সম্প্রদায়* (১৯৮৫);[৩০] ধীরেন্দ্র নাথ দাসের '*Regional Movements: Ethnicity and Politics*(2005)';[৩১] I. Sarkar এর প্রবন্ধ '*The Kamtapuri Movement: Towards a Separate State*(2006)';[৩২] রূপকুমার বর্মনের '*Contested Regionalism: A New Look on the History, Cultural Change and Regionalism of North Bengal and Lower Assam* (2007)';[৩৩] সুখবিলাস বর্মা (সম্পাদিত): '*Sociopolitical Movement in North Bengal* (2007)',[৩৪] শৈলেন দেবনাথ (সম্পাদিত): *Social and Political Tensions in north Bengal since 1947* (2007);[৩৫] ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উল্লিখিত এই গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলিতে উপেন্দ্রনাথের কথা বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হলেও তার রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখানে পাওয়া যায় না।

সাম্প্রতিককালে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও তার সঙ্গে জাতির সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার একটি নতুন ধারা তৈরী হয়েছে। এই ধারার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা উল্লেখ করতে পারি পার্থ চ্যাটার্জ্জীর *The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism* (1997)[৩৬] এর কথা। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে (Caste and Politics in West Bengal) পার্থ চ্যাটার্জ্জী মূলত ঔপনিবেশিক বাংলার জাতিব্যবস্থা ও রাজনীতির

সম্পর্কের সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে তপ শিলি জাতির রাজনৈতিক অবস্থানের অতিসংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা তুলে ধরেছেন। এখানে সম্প্রদায় ভিত্তিক (অর্থাৎ রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাউরি, বাগদি, পৌণ্ড্র, ইত্যাদি) কোন আলোচনা নেই।

তবে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আনন্দগোপাল ঘোষ খানিকটা আলোকপাত করেছেন তার প্রবন্ধ *“উপেন্দ্রনাথ বর্মন ও তৎকালীন উত্তরবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতি”*(২০০২)[৩৭] তে। একইসঙ্গে নিম্নবর্ণীয় সমাজের নেতা হিসাবে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের কার্যাবলী স্থান পেয়েছে সঞ্জয় পাশোয়ান ও পরামানসি জয়দেব (সম্পাদিত): *Encyclopedia of Dalits in India, Vo-4 Leader(2004*)[৩৮]এ। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত রূপকুমার বর্মনের প্রবন্ধ *Yes! The Scheduled Castes Can Write*(2016)[৩৯] উপেন্দ্রনাথ বর্মনের আত্মজীবনী *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতির(১৩৯২)* [৪০] উপর অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করেছে। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলিতে বা সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী উত্তরবঙ্গের ‘জাতি রাজনীতি ’ ও ভারতের ‘জাতীয় রাজনীতিতে’ উপেন্দ্রনাথ বর্মনের কার্যাবলিকে তুলে ধরতে পারেনি।

পূর্ববর্তী অংশে বর্ণিত গবেষণার সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে উপেন্দ্রনাথ বর্মন ও তার সমকালীন বাংলা বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও পর্যন্ত রচিত হয়নি। ফলে ঔপনিবেশিক আমলের বাংলার বিভিন্ন নিম্নবর্ণীয় জাতির ‘জাতি পরিচিতি নির্মান’ আন্দোলনের জাতি-রাজনীতিতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি নতুনভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ‘জাতি রাজনীতি’ থেকে ‘জাতীয় রাজনীতিতে’ প্রবেশ করে উপেন্দ্রনাথ বর্মন কিভাবে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনকে নতুনভাবে চালিত করেছেন সে ব্যাপারেও

আলোকপাত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রাজবংশী জাতি আন্দোলন কিভাবে উত্তরবঙ্গে আঞ্চলিকতার রাজনীতিতে রূপান্তরিত হল বা উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের জাতি, আঞ্চলিকতা ও জাতীয় রাজনীতির অন্তর্বিরোধ এর প্রতি আলোকপাত করাও একান্তভাবে জরুরি। তাই বর্তমান গবেষণাটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে।

১.২.গবেষণার উপাদান ও পদ্ধতি (Sources and Methodology)

বর্তমান গবেষণাকে পূর্ণরূপ দান করার জন্য আমরা মৌলিক উপাদান, সহযোগী উপাদান ও মৌখিক উপাদান ব্যবহার করেছি। উপেন্দ্রনাথ বর্মনের আত্মচরিত ও সমকালীন সমাজ নিয়ে তার রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ; Bengal Legislative Council (1920-1969), Bengal Legislative Assembly (1937-1946), West Bengal Legislative Assembly, ইত্যাদির কার্যবিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন; ভারতের লোকস ভার নির্বাচন ও তার বিবরণ; জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গঠিত উত্তরবঙ্গসহ বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংবিধান ও বার্ষিক প্রতিবেদন, রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী, আদম শুমারির প্রতিবেদন(১৮৭২-১৯৮১),ইত্যাদি; বর্তমান গবেষণায় মৌলিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত অসংখ্য প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ বর্তমান গবেষণায় গুরুত্ব সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন, উপেন্দ্রনাথ বর্মন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র,

ভারতের জাতপাতের ইতিহাস, জাতি চেতনা ও জাতি রাজনীতি নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন সহযোগী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আমরা বর্তমান গবেষণার সহযোগী উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছি।

বর্তমান গবেষণার মূল উপাদানগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় লেখ্যাগার, West Bengal Secretariat Library, জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (কলকাতা), কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা) ও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কোচবিহার) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কলকাতা, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন সম্পর্কীয় তথ্য ও উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। তথ্যকে অবিকৃত রেখে ও তাত্ত্বিক প্রকরণের সাহায্যে যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটিকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.৩.গবেষণার মূল প্রশ্ন ও অধ্যায় বিভাজন (Key Questions and Chapter Division)

বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল 'বিংশ শতকের প্রথমভাগে বাংলার বিভিন্ন নিম্নবর্ণীয় জাতির আত্ম চেতনার জাতি-রাজনীতিতে রূপান্তর' ও জাতি রাজনীতির জাতীয় ও আঞ্চলিকতার রাজনীতিতে রূপান্তরকে তুলে ধরা। এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আমাদের মূল লক্ষ্য হল ---

(১) উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জাতি আন্দোলন কীভাবে জাতি -রাজনীতির সূচনা করেছিল তার উপর আলোকপাত করা; (২) ঔপনিবেশিক বাংলার জাতি -রাজনীতি কীভাবে উপেন্দ্রনাথ বর্মনকে জাতি রাজনীতিতে যুক্ত করেছিল তাকে তুলে ধরা; (৩) ভারতের স্বাধীনতা ও বাংলা ব্যবচ্ছেদের প্রাক্কালে জাতি-রাজনীতির দুর্বলতা কীভাবে উপেন্দ্রনাথ বর্মনকে জাতীয় রাজনীতিতে

যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার বিশ্লেষণ করা; ও (৪) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে আঞ্চলিকতার বিকাশ ও আঞ্চলিকতা ও জাতীয় রাজনীতির অন্তর্বিরোধকে উপেন্দ্রনাথ কীভাবে দেখেছিলেন তার মূল্যায়ন করা।

উল্লিখিত মূল প্রশ্নগুলিকে (Key Questions) আমরা মোট ছয়টি অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। ভূমিকা স্বরূপ প্রথম অধ্যায়ে আমরা বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন নিম্নবর্ণীয় জাতির আর্থ - সামাজিক অবস্থানের বিচার বিশ্লেষণ। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা তুলে ধরেছি যে কীভাবে রাজবংশীসহ বাংলার নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির মধ্যে আত্মচেতনার বিকাশ শুরু হয়েছিল। এখানে আমরা রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের বিকাশ ও তার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের সম্পর্কও তুলে ধরেছি। রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের জাতি রাজনীতিতে রূপান্তরিত হওয়াকে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি। এখানে আমরা এটাও আলোচনা করেছি যে জাতি রাজনীতির অসাড়তা ক্রম শ রাজবংশীসহ অন্যান্য তপ শিলিদের কংগ্রেসের ‘জাতীয় রাজনীতি ’ ও কমিউনিষ্টদের ‘শ্রেণী রাজনীতির ’ মধ্যে টেনে নিয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ বর্মনও জাতি -রাজনীতির গণ্ডী অতিক্রম করে জাতীয় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ক্রম শ জাতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছিলেন।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের আর্থসামাজিক ও সংস্কৃতির অবক্ষয়, পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার নীতি, উদ্বাস্তুদের আগমন ও সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মনে আঞ্চলিকতার রাজনীতির জন্ম দেয়। এই আঞ্চলিকতার

বিকাশ ও জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। গবেষণার মূল বক্তব্য তথা উপসংহার তুলে ধরা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাদানের অনুলিপি ও প্রতিলিপি তুলে ধরা হয়েছে সংযোজনী অংশে। গবেষণায় ব্যবহৃত উপাদান ও সহযোগী উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমরা গ্রন্থপঞ্জীতে তুলে ধরেছি।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Nripendra Kumar Dutt: *Origin and Growth of Caste in India* (Volume I & Volume II Combined), (Calcutta, Firma KLM Mukopadhyay, Pvt. Ltd, 1986).

২. Hitesranjan Sanyal: *Social Mobility in Bengal* ,(Calcutta, Papyrus, 1981).

৩. Joya Chatterjee: *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition 1932-47*, (Cambridge University Press, 1994).

৪. Sekhar Bandyopadhyay*: Caste, Politics and the Raj* (1872-1937), (Calcutta, KP Bagchi & Co., 1990).

৫. Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Protest and Identity in Colonial Bengal: The Namasudras of Bengal 1872-1947* , (Richmond, Surrey, Curzon Press, 1997).

৬. Sekhar Bandyopadhyay: *Changing Border, Shifting Loyalties: Religion, Caste and the Partition in 1947* , Working Paper No.2, (The Asian Studies Institute , Victoria University of Wellington, 1998).

৭. Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Culture and Hegemony* , (New Delhi, Sage Publications, 2004).

৮. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (স): *জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ,* (দিল্লী, আইসিবিএস, ১৯৯৮)।

৯. Sekhar Bandyopadhyay, Abhijit Dasgupta, William Van Schendel (eds): *Bengal: Communities, Development and State* , (New Delhi, Manohar, 1994).

১০. Rup Kumar Barman: *The Partition of India and Its Impact on the Scheduled Castes of Bengal* , (New Delhi, Abhijeet Publications, 2012).

১১. Rup Kumar Barman: 'From Pods to Poundra: A Study on the Poundra Kshatriya Movement for Social Justice 1891-1956', *Voice of Dalit, Vol.7, No.1 (January-June, 2014)*, পৃ.-পৃ. ১২১-১৩৭।

১২. Rup Kumar Barman: 'Changing Identities of the Scheduled Castes in Colonial and Post-Colonial Bengal', in Sanjay K. Roy and Rajatsubhra

Mukhopadhyay (eds): *Ethnicity in the East and North-East India* , (New Delhi, Gyan Publishing House, 2015), পৃ.-পৃ.৯৫-১১৪।

১৩. Rup Kumar Barman: 'Yes! The Scheduled Castes Can Write: Reflections on the Creative and Assertive Writings of the Scheduled Castes of Colonial Bengal,' *Contemporary Voice of Dalit, Vol.8, No. 1 (May, 2016),* পৃ.-পৃ.৪৭-৬১।

১৪. Swaraj Basu*: Dynamics of a Caste Movement : The Rajbanshis of North Bengal: 1910-1947 ,* (New Delhi, Manohar, 2003).

১৫. Swaraj Basu: 'Colonial State and Indigenous Society: The Creation of the Rajbanshi Identity of Bengal', in Sekhar Bandyopadhyay, Abhijit Dasgupta, William Van Schendel (eds): *Bengal: Communities, Development and State* , (New Delhi, Manohar, 1994), পৃ.-পৃ.৪৩-৬৪।

১৬. রূপকুমার বর্মন : 'জাতি পরিচিতি গঠন, উত্তরণ ও এলিট নেতৃত্ব : ঔপনিবেশিক বাংলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি সমীক্ষা', *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৮,* (কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪), পৃ.-পৃ. ২৮৩-২৯১।

১৭. ক্ষেত্রনাথ সিংহ: *রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার জীবনী,* (রঙ্গপুর, নিত্যানন্দ বর্মা, ১৯৪০)।

১৮. শিবেন্দ্র নারায়ন মণ্ডল: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* (গৌরীপুর, ইন্ডিয়া প্রেস, ১৯৭২)।

১৯. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত,* (জলপাইগুড়ি, ১৩৭৯ সন), চতুর্থ সংস্করণ, (জলপাইগুড়ি, শিবেন্দ্রনাথ রায়, ১৪০৮)।

২০. Ranjit Kumar Mandal : *Ray Saheb Panchanan: Life and Times,* (New Delhi, All India Forum for Development of the Rajbanshis, 2002).

২১. Suniti Kumar Chatterjee: *Kirata- Jana- Kriti: The Indo-Mongoloids, Their contribution to the History and Culture of India* , (Calcutta, The Asiatic Society, 1951).

২২. Charu Chandra Sanyal: *The Rajbanshis of North Bengal,* (Calcutta, The Asiatic Society, 1965).

২৩. Pranab Kumar Bhattacharyya (ed): *Kamata Cooch Bihar in Historical Perspective,* (Kolkata, Ratna Publication, 2000).

২৪. D.Nath: *History of Koch Kingdom,* (Delhi, Mittal Publications, 1988).

২৫. নির্মল দাশ: *উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ,* (কলকাতা, ওরিএন্টাল বুক কো:, ১৯৮৪)।

২৬. Rup Kumar Barman : *From Tribalism to State: Reflection on the emergence of the Koch Kingdom,* (Delhi, Abhijeet Publications, 2007).

২৭. অম্বিকাচরণ সরকার: *কোচ রাজবংশী জাতির ইতিহাস আরু সংস্কৃতি* (অসমীয়া), (বঙ্গাইগাও, ১৯৭২)।

২৮.দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকত: *রাজবংশী ভাষা সাহিত্যর পরিচয়* (অসমীয়া), (গোলকগঞ্জ, সেন্টার ফর এথনিক স্টাডিস অ্যান্ড রিসার্চ, ২০০০)।

২৯. সুখবিলাস বর্মা: 'রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয় ', ইছামুদ্দিন সরকার (স): *ঐতিহ্য ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ* , (ডিব্রুগড়, এন এল পাবলিশার্স, ২০০২), পৃ. পৃ. ১৫৫-১৮১।

৩০. নির্মল চৌধুরী: *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজবংশী সম্প্রদায়,* (জলপাইগুড়ি, নির্মল চৌধুরী, ১৯৮৫)।

৩১. Dhirendra Nath Das: *Regional Movements: Ethnicity and Politics,* (Delhi, Abhijeet Publications, 2005).

৩২. I. Sarkar: 'The Kamtapuri Movement: Towards a Separate State', in G.C Rath (ed): *Tribal Development in India* , (New Delhi, Sage, 2006), পৃ.-পৃ. ১৫৩-১৬৫।

৩৩. Rup Kumar Barman: *Contested Regionalism: A New Look on the History, Cultural Change and Regionalism of North Bengal and Lower Assam,* (Delhi, Abhijeet Publications, 2007).

৩৪. Sukhbilas Barma (ed): *Sociopolitical Movement*s *in North Bengal* (A Sub-Himalayan Tract)*, 2 Vols.,* (New Delhi, Global Vision Publishing House, 2007).

৩৫. Sailen Debnath (ed): *Social and Political Tensions in North Bengal since 1947,* (Siliguri, N.L. Publishers, 2007).

৩৬. Partha Chatterjee: *The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism,* (Delhi, Oxford University Press, 1997).

৩৭. আনন্দগোপাল ঘোষ: 'উপেন্দ্রনাথ বর্মন ও তৎকালীন উত্তরবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতি', ইছামুদ্দিন সরকার (স): *ঐতিহ্য ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ,* (ডিব্রুগড়, এন এল পাবলিশার্স, ২০০২), পৃ.পৃ. ৪৬০-৪৭৮.

৩৮. Sanjay Paswan and Paramashi Jaideva (ed s): *Encyclopaedia of Dalits in India: Human Rights: New Dimensions in Dalit Problems, Vol .4, Leader*, (Delhi, Kalpaz Publications, 2004).

৩৯. Rup Kumar Barman: 'Yes! The Scheduled Castes Can Write', *(Contemporary Voice of Dalit, 8(I), 2016*, পৃ.-পৃ. ৪৭-৬২।

৪০. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি* , (জলপাইগুড়ি, বিজয় চন্দ্র বর্মন, ১৩৯২)।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঔপনিবেশিক বাংলার তপশিলি জাতিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত

জাতি ব্যবস্থা (Caste system)ও জাতপাত (Casteism) বর্তমান ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির অপরিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতের সংবিধান সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের সমান (equal) হিসাবে বর্ণনা করেও সমাজের দুর্বল অংশের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছে। জাতি (Caste), শ্রেণী (Class)ও লিঙ্গ (Gender)ভিত্তিক এই দুর্বল অংশকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে তাদের বিশেষ সুযোগ প্রদানের এই ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনকালের শেষ পর্যায়ে। ঔপনিবেশিক আমলে আদমশুমারি (জনগণনা বা Census) প্রবর্তনের সময় থেকে বাংলা প্রদেশসহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলি 'দুর্বল শ্রেণী' বা 'জাতি' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে চলেছে। আর্থিকভাবে দুর্বল ও সামাজিকভাবে 'ব্রাত্য' এই জাতিগুলি (১৯৩০ এর দশক থেকে 'তপশিলি জাতি' হিসাবে চিহ্নিত)[১] ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ শতকের গোড়ায় সামাজিক সম্মান অর্জনের জন্য সমাজসংস্কারের ডাক দিয়েছিল। আধুনিক শিক্ষা ও উচ্চবর্ণীয়দের সামাজিক রীতিনীতি ও আদব কায়দা গ্রহণকরে সমাজে নিজস্ব আত্মমর্যাদা (Self Respect) প্রতিষ্ঠাই ছিল এদের সামাজিক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন কেন সৃষ্টি হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য বর্তমান অধ্যায়ে বাংলার প্রধান নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির 'জাতি চেতনা' (Caste Consciousness) ও

সম্মানজনক জাতি পরিচিতি নির্মানের প্রেক্ষাপট হিসাবে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

২.১. জাতিব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ

জাতি-চেতনার সূচনা হিসাবে সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক শাসনকালে আদমশুমারির প্রচলন অর্থাৎ ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দকে চিহ্নিত করা হয়। কারণ এই সময় থেকেই ভারতীয় জনসমাজের শ্রেণীকরণের (Stratification) প্রধান সূচক হিসাবে 'জাতি' বা Caste প্রাধান্য পেতে শুরু করে। দ্বিজ, অন্ত্যজ বা মধ্যম বর্ণ নির্বিশেষে প্রথাগত বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়গুলোকে 'জাতি (Caste)' হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস শুরু হয় এই সময় থেকেই। ঔপনিবেশিক সরকারের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলার উচ্চবর্ণীয়/উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের জাতি বিষয়ে মতামত ও পর্যবেক্ষণ 'জাতি ব্যবস্থায়' কোন নির্দিষ্ট জাতির সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে নতুন নতুন ব্যাখ্যার জন্ম দেয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, ইত্যাদি, উচ্চবর্ণীয় জাতিগুলির বিভিন্ন শাখার সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর্যবেক্ষণকে মেনে নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিল তৎকালীন (১৮৮১) আদম শুমারি পরিচালকগণ।[২] উচ্চবর্ণীয়দের মত বাংলার তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলিও সরকারি দলিল ও প্রতিবেদনে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে ১৮৮০র দশক থেকে। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসক পণ্ডিত গণ (Colonial Administrative Scholars) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। আদমশুমারি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ আধিকারিক H. Beverley ও W.W Hunter

বাংলার নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির শ্রেণী বিভাজনে কয়েকটি নির্দিষ্ট সূচক (Parameter) গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে তপ শিলি জাতি (Scheduled Caste) ও তপ শিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) হিসাবে পরিচিত সম্প্রদায়গুলিকে তারা Lower Caste, Semi Hinduised Caste, Hinduised Caste, Aboriginal Caste; ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেছিলেন।[৩] ঊনবিংশ শতকের আদম শুমারিতে (১৮৮১ ও ১৮৯১) Caste এর পাশাপাশি নৃগোষ্ঠীভিত্তিক বর্গীকরণ (Racial Classification) কেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[৪] এই ধরণের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পরিভাষা বিংশ শতকের প্রথমভাগে ভারতীয় উপমহাদেশের নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির ক্ষেত্রে আরো ও কয়েকটি নতুন পারিভাষিক শব্দের জন্ম দেয় যেমন—'Depressed Caste' বা 'Depressed Class'। এই নামকরণ একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের *ভারত শাসন আইন (The Government of India Act,1935*) গৃহীত হওয়ার পর ১৯৩৬ এর *The Government of India (Scheduled Caste) Order* এর মাধ্যমে। এখানে Depressed Class বা Depressed Caste-এর পরিবর্তে Scheduled Caste বা (SC) তপশিলি জাতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়।[৫]

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের সংবিধান কার্যকরী হওয়ার প র *The Constitution (Scheduled Tribe) Order 1950*[৬] এর দ্বারা তপ শিলি জাতি গুলিকে 'তপশিলি জাতি' ও 'তপশিলি উপজাতি' হিসেবে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে ঔপনিবেশিক আমলে Hinduised Caste, Depressed Caste, Depressed Class হিসাবে বর্ণিত সম্প্রদায়গুলির কয়েকটি, তপ শিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) ও অবশিষ্টগুলি তপ শিলি জাতি

(Scheduled Caste) হিসাবে স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থায় স্থান পেয়েছে। সুতরাং লক্ষ করা যাচ্ছে যে বাংলার নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলি র নামকরণের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা কে আরেকটু সমৃদ্ধ করার জন্য ভারতে জাতি -ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি।

ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'জাতি'(Caste)র অস্তিত্ব স্থায়ী সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। কিন্তু 'Caste' (যা জাতির প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়)শব্দটি ভারতীয় নয়। এই শব্দটি র উৎপত্তি হয়েছে পর্তুগীজ শব্দ *Casta* থেকে যার আক্ষরিক অর্থ হল Pure Bread।[৭] ভারতে Caste এর সমার্থক হিসাবে অনেকগুলি শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। Caste এর ধারণাকে প্রকাশ করতে 'বর্ণ' শব্দটি ভার তের সমাজব্যবস্থার পেশাগত শ্রেণী বিভাজনের (Professional Classification) দ্যোতক হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বর্ণ ছাড়া Caste র সমার্থক হিসাবে আরেকটি ভারতীয় শব্দ 'জাতি' (বা তার সমগোত্রীয় শব্দ যেমন বিরাদরি, জাত, ইত্যাদি) শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহার করে থাকেন ভারতীয় লেখকগোষ্ঠী, শাসকগোষ্ঠী, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী বা রাজনীতি বিদ, সাংবাদিক ও সমাজবিদ্যার গবেষকগণ যা মূলত একটি Endogamous Social Groupকে বুঝিয়ে থাকে। তাই পর্তুগীজ Casta বা ইংরেজী Casteর বিকল্প হিসাবে 'বর্ণ' বা 'জাতি' শব্দগুলি ভার তীয় উপমহাদেশে সরকারি শাসনব্যবস্থা বা সমাজবিজ্ঞানী মহলে বৈধতা অর্জন করেছে। অন্যভাবে বলা যায় যে Casteশব্দটির জন্ম পাশ্চাত্যে হলেও ভারতীয় সমাজের আলোচনায় এর ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল Caste র বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত 'বর্ণ' বা 'জাতি' ভারতে

কিভাবে উৎপত্তি বা বিকাশ লাভ করেছে? এ ব্যপারে পরবর্তী অংশে এবার একটু আলোকপাত করছি।

ভারতে জাতিব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে ভারতে আর্যদের (যুদ্ধ ও কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত গোপালক উপজাতি) আগমনের (খ্রিস্টপূর্ব ২য় থেকে প্রথম সহস্রাব্দ) সময় থেকে ভারতে বর্ণব্যবস্থার বিকাশ শুরু হয়েছিল। ভারতে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং ভারতের আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী সমূহের(*Pre-Aryans or indigenous*) পারস্পরিক সংঘাত ও সম্পর্ক একটি জটিল বর্ণ বা জাতি ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার গবেষকগণ কয়েকটি তাত্ত্বিক ধারণার মাধ্যমে এই জটিল ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশের রহস্যভেদের চেষ্টা করেছেন। এগুলি হল –(i) ধর্মীয়-অতিন্দ্রিয়বাদী তত্ত্ব, (ii) জীববৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, ও (iii) সামাজিক-ঐতিহাসিক তত্ত্ব, ইত্যাদি।

ধর্মীয় তত্ত্ব (Religious Theory) থেকে ভারতে চতুঃবর্ণের উৎপত্তির একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় । 'বর্ণ' শব্দ টির প্র থম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্ বেদের পুরুষোক্ত অংশে। এখানে বলা হয়েছে যে চতুঃবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মা বা 'প্রকৃতি পুরুষে'র (সৃষ্টিকর্তা) বিভিন্ন দেহাংশ থেকে। এই অংশের বর্ণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্ম হয়েছে যথাক্রমে প্রকৃতি পুরুষের মাথা, বাহু, ঊরু ও পা থেকে। 'ধর্মীয় তত্ত্ব' অনুসারে ব্রাহ্মণ বর্ণ হল মানব মনের নির্দেশক। ক্ষত্রিয় বর্ণ হল যুদ্ধ বা প্রতিরক্ষার প্রতীক। অন্যদিকে বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ হল যথাক্রমে কৃষিকর্ম ও অন্যের পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত

মানুষের সমন্বয়।[৮] ঋগ্বেদে বর্ণিত আদি বর্ণব্যবস্থার(Prestine Caste System) উৎপত্তির এই যুক্তিকে মোটামুটিভাবে খ্রিস্ট পূর্ব ১৬০০-১২০০ অব্দের মধ্যে সৃষ্ট বলে ধরা যেতে পারে।

বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেমন *সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও সূত্র সাহিত্যে* আদি বর্ণব্যবস্থার উৎপত্তির আলাদা কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে *ভগবদ্গীতা* ও *স্মৃতিশাস্ত্রে* বর্ণ-ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশের ভিন্ন ধরণের যুক্তি দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্গীতা অনুসারে বলা যায় যে চতুঃবর্ণ 'গুণ' (quality)ও 'কর্ম' বা পেশা (Profession)র উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে । এই সাহিত্যিক উপাদানটিতে কুরু ক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে প্রশ্নোত্তরের ছলে উক্তি করেছেন *যে- "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ "* অর্থাৎ 'গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি '।[৯] অন্যদিকে *মানবধর্মশাস্ত্র (*বা *মনুস্মৃতি*) সহ প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে রচিত কয়েকটি ধর্মীয় সাহিত্যে ও কর্ম বা পেশাকে আধার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই শিক্ষক ও পুরোহিতদের ব্রাহ্মণ হিসাবে, যোদ্ধা ও রাজাদের ক্ষত্রিয় হিসাবে ও ব্যবসায়ীদের বৈশ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে 'ভৃত্য' বা সাধারণ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু 'পেশাভিত্তিক আদি বর্ণ বিভাজন ' দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরিবর্তে পরবর্তী বৈদিকযুগ থেকে (খ্রিঃ পূঃ ১০০০-৬০০ অব্দ) নির্দিষ্ট বর্ণে জন্মই বর্ণ বা জাতির পরিচায়ক হয়ে ওঠে ছে। স্বাভাবিকভাবেই মনুস্মৃতিতে বর্ণব্যবস্থায় পুরোহিতদের সর্বোচ্চস্থানসহ কয়েকটি বিশেষ অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ব্রাহ্মণগণ বেদশিক্ষা দান, বেদ পাঠ, নিজের ও অন্যদের জন্য যাগযজ্ঞ করা, দান প্রদান ও গ্রহণ করার মাধ্যমে

জীবিকানির্বাহ করবেন। অন্যদিকে শূদ্রদের বলা হয়েছে ব্রাহ্মণদের সেবা করার কথা।ক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে মনুস্মৃতি বারবার বলেছে যে তারা যেন সঠিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখেন। তবে জাতি ব্যবস্থায় জাতির ভিন্নতার জন্য মনুস্মৃতি যে ব্যবস্থার কথা বলেছে সেটা হল জাতিভেদে ভিন্ন ধরণের শাস্তি বা কর প্রদান।[১০] তাই মনুস্মৃতিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের কঠোর শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে । যদিও আদিমধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত মনুস্মৃতির মতামত বা সিদ্ধান্তগুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু এগুলির দ্বারা প্রতিটি বর্ণে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা Sub-Caste তৈরী হয়েছে তার বর্ণনা পাওয়া যায় না।[১১]

জাতিব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশের দ্বিতীয় তত্বটি (Biological Theory) জীববৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন জাতির বা ব্যক্তির গঠনগত ও চরিত্রগত গুণাবলীর দ্বারা তার সামাজিক অবস্থান নির্ণিত হয়ে থাকে। এখানে বলা হয়েছে যে মানবসমাজে মূলত তিনধরণের গুণাব লি লক্ষ্য করা যায় - সত্ত্ব, রজঃ, ও ত মঃ। সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয় বুদ্ধিমত্তা, সত্যবাদিতা ও অন্যান্য ইতিবাচক গুণাব লির দ্বারা। রজোগুণের আধার হল গর্ব, অহংকার, দুঃসাহসিকতা ও কামোজ অভিলাষ । অন্যদিকে তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চিহ্নিত হন তাদের বদভ্যাস, স্থূলবুদ্ধি, নির্বুদ্ধিতা, সৃজনশীলতার অভাব ও অন্যান্য নেতিবাচক গুণাব লির দ্বারা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মনে করা হয় যে মানুষের জীববৈজ্ঞানিক গুণাব লি তার পেশা নির্বাচনের সময়েও প্রখরভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে শিক্ষাদান বা পৌরহিত্য করার কাজগুলো গ্রহণ করেন ব্রাহ্মণগণ যাদের সত্ত্বগুণের অধিকারী বলা হয়েছে । একই ভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ (যাদের মধ্যে র জোগুণের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়) তারা তাদের গুণানুসারে নিজস্ব

পেশাকে বেছে নেন । অন্যদিকে শূদ্রগণ সামগ্রিকভাবে তামসিক হওয়ায় তাদের পেশাগুলো হয় নিম্নমানের বা অপরিচ্ছন্ন বা ঘৃন্য।[১২] আপাতদৃষ্টিতে জীববৈজ্ঞানিক তত্বটির আংশিক গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও জাতি ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ এর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোন একটি নির্দিষ্ট জাতির সব মানুষকে একটি নির্দিষ্ট গুণের সমাহার হিসাবে বর্ণনা করাও অযৌক্তিক।

বর্ণ বা জাতিব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতামতটি হল ভারতীয় সভ্যতার সামাজিক-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (Socioeconomic analysis)। এর দ্বারা বর্ণ, জাতি এমনকি অবর্ণ (অস্পৃশ্য, পঞ্চম বর্ণ) সম্প্রদায়গুলোর উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনার প্রয়াস করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ অনুসারে ভারতে বর্ণব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটে আর্যদের আগমনের সময় অর্থাৎ আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে। আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতে মূলত অনার্য জাতিসমুহ বিশেষ করে নিগ্রিটো, মোঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ; ইত্যাদি নৃগোষ্ঠীর (Racial community)অস্তিত্ব ছিল যারা বর্ণব্যবস্থার দ্বারা বিভাজিত সমাজে বসবাস করতেন না। কিন্তু আর্যগণ স্থানীয় (আদি ভারতীয়, আদিম জাতি বা উপজাতি- indigenous/ aboriginals/ tribals) সমাজের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করে আর্যসংস্কৃতির জয়পতাকা উড়ানোর পাশাপাশি আর্যরা মূল ত তিনটি সামাজিকবর্গে বিভক্ত হয়ে যান - রাজন্য, ব্রাহ্মণ, কৃষক ও কারিগর শ্রেণী। প্রথম অংশ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হিসাবে 'রাজন্য' হিসাবে পরিচিত হয় যা ক্রম শ ক্ষত্রিয়বর্ণের আকার লাভ করে। দ্বিতীয় ভাগটি যাগযজ্ঞসহ বৈদিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকায় ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কৃষিজীবী ,

কারিগর বা অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা 'বৈশ্য বর্ণ ' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। অন্যদিকে আর্যদের দ্বারা পরাজিত কৃষ্ণবর্ণের সম্প্রদায়গুলো শূদ্র বর্ণে স্থান পায়। পেশার গুণগত মানের ভিত্তিতে অনেকেই আবার 'অবর্ণতে' বা 'অস্পৃশ্যতে' পরিণত হন।[১৩]

বৈদিক যুগের শুরুতে জাতিব্যবস্থা ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এমনকি শূদ্রদের বেদপাঠ বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগ (১০০০-৬০০ খ্রিঃ পূঃ) থেকে জাতিব্যবস্থা আর্য সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে। একই সঙ্গে নিম্নবর্ণীয় মানুষসহ নারীর উপর নানা ধরণের বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া শুরু হয় *স্মৃতি, সংহিতা* ও *উপনিষদ* রচনার সময় থেকে।[১৪] বিধিনিষেধের মাত্রা ক্রমশ কঠোর হতে শুরু করায় এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদ প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ফলে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মত প্রতিবাদী ধর্মগুলোর বিকাশ শুরু হয় যেগুলি জাতিব্যবস্থার যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তকগণ উভয়েই ছিলেন ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত। এই ধর্মগুলোতে জাতিব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ জাতির উচ্চস্থান (বর্ণগত উৎকর্ষ) ও শূদ্রদের নিকৃষ্ট সামাজিক অবস্থানকে অস্বীকার করে সকলকেই সমান স্থান দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।[১৫] কিন্তু মধ্যএশিয়া থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আগমন , তাদের ভারতীয় জনসমুদ্রে মিশে যাওয়া ও তাদের শাসক শক্তি হিসাবে উত্থান খ্রিস্টিয় বর্ষপঞ্জীর সূচনাকাল থেকে ভারতের চিরাচরিত জাতিব্যবস্থায় নতুন পরিবর্তন আনতে শুরু করে।[১৬]

আদিমধ্যযুগে (Early medieval period) ভারতের জাতিব্যবস্থায় নতুন নতুন জাতি বিশেষ করে 'সংকর' বা 'মিশ্র জাতির' বিকাশ ও জাতিব্যবস্থায় তাদের অবস্থান ভারতের চিরাচরিত জাতিব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধি করে। নতুন নতুন পেশা বা বৃত্তির বিকাশ ও আন্ত :জাতি বিবাহ (Inter-caste marriage) মিশ্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল যারা জাতিব্যবস্থায় স্থান পেয়েছিলেন তাদের কর্মের গুণগত মান অনুসারে। আদিমধ্যযুগের ভারতের সামাজিক কাঠামো জানার জন্য দুটো পুরাণ যেমন- *বৃহৎধর্ম পুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* –নতুন মিশ্র জাতিগুলিকে যথাক্রমে 'উত্তম সংকর', 'মধ্যম সংকর', ও 'অধম সংকর' এবং 'সৎ শূদ্র' ও 'অসৎ শূদ্র' হিসাবে বর্ণনা করেছে। [১৭] মধ্য ও প্রাক্ -আধুনিক যুগে ভারতের জাতিব্যবস্থায় মিশ্রজাতি ও নতুন নতুন Sub-Caste এর বিকাশ ঘটতে থাকে। যদিও তথাকথিত নিম্ন বর্ণীয় হিন্দুজাতিগুলির মধ্য থেকে অনেকেই ইসলাম, খ্রিস্টান, শিখ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলি গ্রহণ করেছেন কিন্তু জাতিব্যবস্থার চিরাচরিত গঠন থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেননি। ঔপনিবেশিক শাসনকালে অন্যান্য ধর্মে ধর্মান্তরিত জাতিগুলোকে শাসনব্যবস্থার সুবিধে অনুযায়ী শ্রেণীকরণ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

২.২. ঔপনিবেশিক বাংলার তপশিলি জাতিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাসহ ভারতের নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলি তপশিলি জাতির পরিচিতি পায় ১৯৩৬ এর *The Government of India* (*Scheduled Caste*) *Order (1936)* এর দ্বারা। এই আইন বাংলায় মোট ৭৬ টি নিম্নবর্ণীয় জাতিকে তপ শিলি জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে। নিম্নবর্ণিত সারণীগুলি (সারণী ২.১ ও সারণী ২.২) থেকে আমরা এক টা সাধারণ

ধারণা পেতে পারি। এখানে লক্ষ করা যাচ্ছে যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যারা তপ শিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) সেগুলি বাদে বাকিগুলি তপশিলি জাতির তালিকায় স্থান পেয়েছে।

সারণী: ২.১: ১৯৩৬ এর আইন অনুযায়ী বাংলার তপশিলি জাতির তালিকা।

ক্র. স.	জাতি	ক্র. স.	জাতি	ক্র. স.	জাতি
১	আগারিয়া	২৬	হালালখোর	৫১	মাহালি
২	বাগদি	২৭	হাড়ি	৫২	মাল
৩	বাহেলিয়া	২৮	হো	৫৩	মাল্লা
৪	বাইটি	২৯	জালিয়া কৈবর্ত্য	৫৪	মালপাহাড়িয়া
৫	বাউরি	৩০	ঝালো মালো বা মালো	৫৫	মেচ
৬	বেদিয়া	৩১	কাদাড়	৫৬	মেথর
৭	বেলদার	৩২	কান	৫৭	মুচি
৮	বেরুয়া	৩৩	কাঁন্ধ	৫৮	মুণ্ডা
৯	ভাটি	৩৪	কান্দরা	৫৯	মুশাহার
১০	ভূইমাঁলি	৩৫	কাওড়া	৬০	নাগেশিয়া
১১	ভূইঁয়া	৩৬	কাপুড়িয়া	৬১	নমঃশূদ্র
১২	ভূমিজ	৩৭	কারেঙ্গা	৬২	নট
১৩	বিন্দ	৩৮	কাস্থা	৬৩	নুনিয়া
১৪	ঝিন্ধিয়া	৩৯	কাউর	৬৪	ওরাঁও
১৫	চামার	৪০	খড়িয়া	৬৫	পলিয়া
১৬	ধেনুয়ার	৪১	খটিক	৬৬	পান
১৭	ধোবা	৪২	কোচ	৬৭	পাশি
১৮	দোসাধ	৪৩	কোনাই	৬৮	পাটনি
১৯	ডোম	৪৪	কোনোওয়ার	৬৯	পোদ
২০	দোয়াই	৪৫	কোরা	৭০	রাভা

২১	গারো	৪৬	কোটাল	৭১	রাজবংশী
২২	ঘাসি	৪৭	লালবেগি	৭২	রাজোয়ার
২৩	গোনরি	৪৮	লোধা	৭৩	সাঁওতাল
২৪	হাড়ি	৪৯	লোহার	৭৪	শুঁড়ি
২৫	হাজং	৫০	মাহাড়	৭৫	তিয়র
				৭৬	তুড়ি

তথ্যসুত্র:*The Government of India (Scheduled Caste) Order, 1936.*

ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা যায় যে বাংলার তপ শিলি জাতিগুলি এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল অতিপ্রাচীনকাল থেকেই। মূলত অনার্যজাতি থেকে উদ্ভূত তপশিলি জাতির কয়েকটির উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। *বৃহৎধর্ম* বা *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* ছাড়াও মধ্যযুগীয় বাংলা ও কামরূপী সাহিত্যে বিশেষ করে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শংকরদেব (১৫৪৯-১৫৬৮) এর রচনাবলী ও তার শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা রচিত সাহিত্যে উত্তরবাংলা ও নিম্নআসামের নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাহিত্যগুলি থেকে এই জাতিগুলির সংখ্যা সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

কিন্তু প্রথম আদমশুমারির (১৮৭১-৭২) সময় থেকে এদের সংখ্যা ও জনবিন্যা সের একটা ধারণা পাওয়া যায়। আদমশুমারিগুলি বিশ্লেষণ ক রে বলা যায় যে রাজবং শী, নমঃশূদ্র, বাগদি, পৌণ্ড্র (পোদ), বাউরি, মুচি এই কয়েকটি জাতি ছিল বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট তপ শিলি জাতি। অন্যদিকে ধোবা, ডোম, হাড়ি, জেলিয়া কৈবর্ত্য, মালো, লোহার, মাল, শুঁড়ি, তিয়র ; প্রভৃতি ছিল ঔপনিবেশিক বাংলার মাঝারি মাপের তপ শিলি জাতি। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতি গুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ছিল- ভূঁইমালি, কারেঙ্গা, কেয়ট, মাল্লা, রাজওয়ার, কাদার, বাহেলিয়া, বিন্দ, ভোক্তা, দোয়াই, ঘাসি, গোনড়ি; ইত্যাদি।

সারণী২.২:বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির তালিকা , ২০০১।

ক্র. স.	জাতি	ক্র. স.	জাতি	ক্র. স.	জাতি	ক্র. স.	জাতি	ক্র. স.	জাতি
১	বাগদি,দুলে	১৩	দাবগার	২৫	কাদার	৩৭	কোনোও য়ার	৪৯	পালিয়া
২	বাহেলিয়া	১৪	দামাই (নেপালি)	২৬	কামি (নেপালি)	৩৮	কোটাল	৫০	পান (স্বয়াসি)
৩	বাইটি	১৫	ধোবা (ধোবি)	২৭	কাঁদরা	৩৯	কুরারিয়ার	৫১	পাসি
৪	বাটনার	১৬	দোয়াই	২৮	কঞ্জর	৪০	লালবেগি	৫২	পাটনি
৫	বাউরি	১৭	ডোম (ধাঙ্গর)	২৯	কাওড়া	৪১	লোহার	৫৩	পোদ (পৌণ্ড্র)
৬	বেলদার	১৮	দোসাদ (দুসাদ, ধারি, ধাবরি)	৩০	করেঙ্গা	৪২	মাল	৫৪	রাজবং শী
৭	ভোগতা	১৯	ঘাসি	৩১	কাউর	৪৩	মাহার	৫৫	রাজওয়া র
৮	ভুঁইমালি	২০	গোনড়ি	৩২	কেওট	৪৪	মাল্লা	৫৬	সার্কী (নেপা লি)
৯	ভুঁইয়া	২১	হালালখোর	৩৩	খৈরা	৪৫	মুসাহার	৫৭	শূঁড়ি (সাহা বাদে)
১০	বিন্দ	২২	হাড়ি (মেতর, মেথর, ভাঙ্গি,	৩৪	খটিক	৪৬	নমঃশুদ্র	৫৮	তিয়র

			বাল্মীকি)						
১১	চামার(চর্মকার, মোচি,মুচি, রবিদাস,ঋষি, রুইদাস)	২৩	জেলিয়া কৈবর্ত্য	৩৫	কোচ	৪৭	নট	৫৯	তুরি
১২	চৌপাল	২৪	ঝালো মালো (মালো)	৩৬	কোনাই	৪৮	নুনিয়া	৬০	চাই

তথ্যসূত্র: Government of West Bengal: *Short Note on Scheduled Castes of West Bengal*, (Kolkata, Cultural Research Institute, 2005).

তপশিলি জাতিগুলির সংখ্যা পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হল যে তারা কেবলমাত্র ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তপশিলি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে যার ফলে তপশিলি হিসাবে এদের সংখ্যা ১৯৪১ সালের পূর্বে নির্ণয় করা হয়নি। তবে ১৮৭২ থেকে আদম শুমারিতে জাতিভিত্তিক সংখ্যা নির্ণয়ের রেওয়াজ ছিল । যার ফলে পরবর্তীকালে তপশিলি জাতি হিসাবে চিহ্নিত সম্প্রদায়গুলির সংখ্যা নির্ণয়ে সুবিধে হয়েছে। ১৮৮১ ও পরবর্তীকালের আদমশুমারিগুলিতে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে সংখ্যাগরিষ্ট তপশিলি জাতিগুলির একটা আঞ্চলিক কেন্দ্রিকরণ ছিল। অর্থাৎ নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌণ্ড্র, বাগদি, বাউরি, প্রভৃতি জাতিগুলিকে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বেশি পরিমানে লক্ষ করা যায়। ১৯৩১ ও ১৯৪১ সালের আদম শুমারিতে দেখা যায় যে রাজবংশী ও কোচগণ মূলত উত্তরবঙ্গে (রাজশাহী বিভাগ ও কোচবিহার রাজ্য) অধিকসংখ্যায় বসবাস করতেন। নমঃশূদ্ররা মূলত পূর্ববাংলার ঢাকা বিভাগের জেলাগুলিতে বেশি পরিমানে বসবাস করতেন। একইভাবে পৌণ্ড্রদের আধিক্য লক্ষ করা যায় দক্ষিণবঙ্গ অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি

বিভাগের জেলাগুলিতে। অন্যদিকে বাগদি ও বাউরিদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করা যায় বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলিতে। ছোট তপ শিলি জাতির কয়েকটি বিশেষ করে ভূঁইমালি, জেলিয়া কৈবর্ত্য, পাটনি, মালো, প্রভৃতি ; পূর্ব বাংলায় বে শি পরিমানে বসবাস করতেন । একইভাবে বেলদার, বাহেলিয়া, ভোক্তা, পান, তিয়র , ইত্যাদি মূলত পশ্চিম বাংলার জেলাগুলিতেই বে শি পরিমানে বসবাস করতেন। নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি জাতির আঞ্চলিক কেন্দ্রিকরন সেই জাতির জাতি পরিচিতি নির্মান আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। অন্যদিকে সংখ্যায় ছোট জাতি যারা সারা বাংলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বসবাস করতেন তাদের পক্ষে জাতি আন্দোলনের সফলতা অর্জন করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই বাধার সম্মুখীন হতে হতো।

সারণী ২ .৩: **১৮৮১**র আদমশুমা রি অনুযায়ী পূর্ব বাংলার কয়েকটি সংখ্যাগরিষ্ঠ তপ শিলি সম্প্রদায়ের জনবিন্যাস।

জেলা/বিভাগ	**চণ্ডাল**	**জেলিয়া**	**কৈবর্ত্য**	**পোদ**	**শুঁড়ি**	**ধোবি**
বর্ধমান	১৬৮৮৭	৫৩৭৪	৩১৫৯২	৪২	১০০৫	২০
বাঁকুড়া	১৩২৬	৩৩১০	২৫২৫০	১৯৬	২২৪	৪৪১২
বীরভূম	২০৯৯	৪০৫৯	৯১২৯	৩০	৪৮৬১	৩২১০
মেদিনীপুর	২৭৮২৬	২০১৭৯	৭৫৩৪৩৫	১৩৬৬০	২৫২৩	৪১৬০৩
হুগলী	১১৮৪৫	১০৩৬৯	১৪২৫২৬	১৯৫৮	৫	৭৯৮৮
হাওড়া	৯২৮২	৬৪৬৭	১৫৫৬৫৩	১৪১৩৮	৯৫	৯৩২৪
বর্ধমান বিভাগে সমগ্র জনসংখ্যা	**৬৯২৬৫**	**৪৯৭৫৮**	**১১৭৫৮৫**	**৩০০২৪**	**৮৭১৩**	**৬৬৫৬৪**
২৪ পরগণা	২১২৭৭	১১৪২৪	১৪৫৯৬	২১৭১৮৭	১৭৫৭	১৩৯৭৩
কলকাতা	৮৩০	৩০২১	১৬৭৮০	১৩৯	------	৪০৭০
নদীয়া	৪৩৭৮০	১৯০৫২	১২৬০৬৩	৪৫১৮	১৫৩৩৫	১০৪৯৫
যশোহর	১৬০৭৫৫	৩২৭৭৫	৩২৫০৫	৩৫৫১	৪৭৫৮	৬২০৫
খুলনা	১৪৮৮০২	২০৯৬৪	২৫৮৯৫	৬৬৭৯০	২০১২	২২৭৬
মুর্শিদাবাদ	১৭৯৭২	২৮৬৭	১০০৩৫৫	১৪৭	১৭৫৮২	৭০৪৮

সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগের জনসংখ্যা	**৩৯৪৮৭৪**	**৯১১৬৩**	**৪৬৪৫৭৬**	**২৯৪৩৩২**	**৪১৪৪৪**	**৪৮৭১১**
দিনাজপুর	৭১৮০	১৩৫৬০	৩৭৭৮৫	৬৮	৪০৭৯২৩	২০০২
রাজশাহী	২৯৭৯২	১৩৭৭৪	৬৩১৩৪	৩৯	১০৪৫৯	১৬৯৭
রংপুর	৩৬৭৯৫	৮৩৮৭	৩০৬১২	৮	৪৩২৪৯৮	৮৯৮
বগুড়া	৯৮৯২	৫২২০	১৫৫৬৬	৫০	১৯০৫৫	৫৫২
পাবনা	৩৫৩১৯	৩৯২৭৯	২৩৩০৬	------	৪৮৭৫	২২২৫
দার্জিলিং	৩০৮	১৩	২১৯	-------	৩০৮০১	৩৩০
জলপাইগুড়ি	১৮৭৫	৩৮৭০	৫৮৩৮	-------	২০৮৩৩২	৯৯০
সমগ্র রাজশাহী (জলপাইগুড়ি)বিভাগের জনসংখ্যা	**১৩৯১৮১**	**৮৪১০৩**	**১৭৬৪৬০**	**১৬৫**	**১১১৩৯৩৩**	**৮৬৮৪**
ঢাকা	২০২৫১০	৩৯২৭৪	৪০৪২২	------	১৩৪৯৮	১১০২৮
ফরিদপুর	২৪৪৯২৩	২৮৬০৭	২৪০১০	১	১৮৮৬	৯৮২৭
বাখরগঞ্জ	২৬০৭৭১	১৩২৯৮	১৮০৮০	-------	৯২৪	২১৬২৮
ময়মনসিংহ	১৪৮৩৮০	৩২০১১	৯৪২১৭	১৩	৩১৯৯৭	১৭৪১৯
সমগ্র ঢাকা বিভাগের জনসংখ্যা	**৮৫৬৫৮৪**	**১১৩১৯০**	**১৭৬৭২৯**	**১৪**	**৪৮৩০৫**	**৫৯৯০২**
চট্টগ্রাম	২৪১৮	১৫৩১২	৪৫৪২	------	১৮০	১১৪৪৬
নোয়াখালি	১৮৬৪৪	৮৬০২	১৬১৫১	------	২১০	১৫১১৫১
ত্রিপুরা	৮৩০২৩	১২৫১৬	৫০২৯০	৩৩	২৪৯৫	১৬৫৫৫
চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল	১১	১১	৭	-----	৪১	৩৮
সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগের জনসংখ্যা	**১০৪০৯৬**	**৩৬৪৪১**	**৭০৯৯০**	**৩৩**	**২৯২৬**	**৪৩১৯০**
সমগ্র বাংলার জনসংখ্যা	**১৫৬৪০০০**	**৩৭৪৬৫৫**	**২০০৬৩৪০**	**১৯৭৮৮**	**১২১৫৩২১**	**২২৭০৪৮**

তথ্যসূত্র: ১৮৮১ সালের জনগণনা।

সারণী ২.৪: **১৮৮১**এর জনগণনানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সংখ্যাগরিষ্ঠ তপ শিলি সম্প্রদায়ের জনবিন্যাস।

জেলা/বিভাগ	**বাগদি**	**বাউরি**	**চামার**	**ডোম**	**হাড়ি**
বর্ধমান	১৪৮৭৮৮	৮২২৫৪	৪৯২২৯	৩৯০৩০	২২১২১
বাঁকুড়া	৪৭১৪৬	১১৭৫৪৮	৪৪৯৫	১৭৫৮১	৬২৫১
বীরভূম	৪২০৩২	২৭২৫৮	৩০৯৭৫	৩৫৩১৬	২৩২৮৬
মেদিনীপুর	৭৪৪৯৭	১২৭৪৬	১৩৩৮৭	১৬৫৪৯	২৫৫৭৩
হুগলী	১৩৪১১৫	১৮৬১	২১৮৬৯	১০৮২৫	১৩০৩০
হাওড়া	৫৪৯৪৩	৪	৫৮১৫	৩২০৯	২১৫০
বর্ধমান বিভাগে সমগ্র জনসংখ্যা	৫০১৫২৫	২৪১৬৭১	১৩০৭৭০	১২২৫১০	৯২৪১১
২৪ পরগণা	৭৮৬৫৪	৫১৯	৩৬৫৮৬	৩০১৫	৩৪৪১
	৮৯২৬	১	১২৯১১	১৬৪২	৩১৯
কলকাতা	৫৪০৭	৪	৮৫৯০	১৭০৫	৬৫৭
নদীয়া	৪২৯৪৬	২০১৮	৬১০৫৮	৩৩৩৫	৬৪১৫
যশোহর	৭৮৫৯	৭১৭	৩৭৩৮২	১০৪৪	৪৮৭
খুলনা	৪৪৩৭	১	২৬১৫৪	৪৯	৪০৭
মুর্শিদাবাদ	৩০৫৬৮	৪৪১১	২২৫৫০	৭৫০৫	৭৭৫৩
সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগের জনসংখ্যা	**১১৭৮৯৭**	**৭৬৭১**	**২০৫২৩১**	**১৮২৯৫**	**১৯৪৭৯**
দিনাজপুর	১৫৩৬	১০৯৯	৪০৪৩	২১৩৮	৩১৯৩৪
রাজশাহী	২০০২	১৬২	৫৭০৯	৫০৪	৪০৪৫
রংপুর	২৪২	১৪৬	৩৬৬০	১৮০৬	৫৬৫৮
বগুড়া	১৪৭৬	৬৫	১৯০৯	৩৩১	৬৯৯৯
পাবনা	২৩২৫	২৬৫	৫৭৯২	১৩৪০	২২১৬
দার্জিলিং	৪৬	১	৭৭৮	১৬২	১২৩৭

জলপাইগুড়ি	২৪৫২৭	৩০	২১৬৩	৯৩৫	৬৬২৫
সমগ্র রাজশাহী (জলপাইগুড়ি)বিভাগের জনসংখ্যা	**৩২১৫৪**	**১৭৫৮**	**২৪০৫৪**	**৭২১৬**	**৫৮৭১৪**
ঢাকা	২৪৪২	৮০৮	২৪৯৮৮	৫৩৮	১০৭৬
ফরিদপুর	২২৩২	৩০০	৪৭৩৫	২৯৩	৯৮১
বাখরগঞ্জ	৮৬৪	৮৭	২৫৮০	৮৫২	৬৮
ময়মনসিংহ	২৭৮১	৭৬	১১২৮৯	১২১০	১৮৫৫
সমগ্র ঢাকা বিভাগের জনসংখ্যা	৮৩১৯	১২৭১	৪৩৫৯২	২৮৯৩	৩৯৮০
চট্টগ্রাম	৩০৬	৩৮	১০৯২	৯১১৭	৪৯৭২
নোয়াখালি	৩৯		৫৭১	৩৮০	১৪৮
ত্রিপুরা	৬৬	৯	৪৩৫৩	৮০৪	১২৬৮
সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগের জনসংখ্যা	৪১১	৪৭	৬০১৫	১০৩০১	৬৩৮৮
সমগ্র বাংলার জনসংখ্যা	৭২০৩০২	২৫২৪১৮	৪০৯৬৬২	১৬১২১৫	১৮০৯৭২

তথ্যসূত্র: ১৮৮১ এর জনগণনা

সারণী ২.৫ : ঔপনিবেশিক বাংলার তপ শিলি জনগোষ্ঠীর জনবিন্যাস (কোচবিহার ও ত্রিপুরা বাদে)।

ক্রমিক সংখ্যা	জাতির নাম	১৯৩১	১৯৪১
১	বাগদি	৯৮৭৩৩৩	৬৬২৪৮৩
২	বাহেলিয়া	৪৪৪৯	১৮০৮
৩	বাইটি	৮৮৭৩	৬৫৪১
৮	বাউরি	৩৩০৯৯৩	৩৩১৪৫৭

৫	বেদিয়া	৭৩৬৩	৬২২৯
৬	বেলদার	৩১৩৯	৫২৫৮
৭	ভুঁইমালি	৮৯৮০২	৬১৬১৫
৮	ভুঁইয়া	৩৩৬১৪	৪০২৫৮
৯	বিন্দ	১৯১৬০	১৫০৫৭
১০	চামার	১৪৮৬৬১	১২৭১৮৩
১১	ধোবি	২২৮৬৬৬	১৮৭৪৯৫
১২	দোয়াই	১০৭৩	৩৭৪২
১৩	ডোম	১৩৮৯২৬	১১৮৮০০
১৪	দোসাদ	৩৫৯২৮	২৩০৩৩
১৫	ঘাসি	৫২২২	৫৩২৬
১৬	গোনরি	৫১৫৯	২১৪৬
১৭	হাড়ি	১৩১৮৫২	৯২৭২৯
১৮	জেলিয়া কৈবর্ত্য	৩৪৯৮৫৯	২৭৭৮৬১
১৯	ঝালো মালো বা মালো	১৯৭৭৮৯	১৬৩০৬৭
২০	কাদার	১০৭৮	১৬১৩
২১	কাঁদরা	৪৬৭০	১১৬৪৩
২২	কাওরা	১৭০৮৬৭	৯২৯২৬
২৩	করেঙ্গা	৯৮৫৫	৮৪০৩
২৪	খটিক	১১৫৭	১২৬৮
২৫	কোচ	৮০০০২	৪২৮০৬
২৬	কোনাই	৪১০৫৮	৪১৪৮৬
২৭	কোনওয়ার	১৩৩	১৯৭৭
২৮	কোরা	৪৬৬১৭	৩৯২৪০
২৯	কোটাল	৭৬৫১	৬৫৯৭
৩০	লালবেগি	৪৯৫৬	১৬৫৯
৩১	লোহার	৪৯৯৬৮	৬৭৪৪০

৩২	মাহার	১৭৯১	৬৯১৭
৩৩	মাল	১১১৪০৯	১১৪৩৫৯
৩৪	মাল্লা	২৫৯০৩	১৮৬০৪
৩৫	মেথর	২২৯১১	২৩৫৯৯
৩৬	মুচি	৪১১৮২১	৩২১৬০০
৩৭	মুসাহার	১১৫৮৫	১০৮০৯
৩৮	নমঃশূদ্র	২০৮৬২১৩	২১৫০৭৬০
৩৯	পালিয়া	৪৩১৬৩	সংখ্যা পাওয়া যায়নি
৪০	পান	৭৯১	১৭৩৫
৪১	পাসি	১৮৬২৮	১২৯৯০
৪২	পাটনি	৩৯২৯০	১১৬৮৬
৪৩	পোদ	৬৬৭৭৩১	৫৬৪৯৯৩
৪৪	রাজওয়ার	২১৩১৫	৩২৩৩৮
৪৫	রাজবংশী	১৪৮৭৪৬৯	সংখ্যা পাওয়া যায়নি
৪৬	শুঁড়ি	৭৬৭৭৯	৬৫৬৫৪
৪৭	তিয়র	৯৬৩৭৫	৪১৪০৩
৪৮	তুরি	১৭৩৬২	১৫৭৮৪

তথ্যসূত্র: ১৯৩১ ও ১৯৪১ এর জনগণনা।

২.৩. ঔপনিবেশিক বাংলার তপশিলি জাতিগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থান

সংখ্যার তারতম্যের মতোই ঔপনিবেশিক আমলের বাংলার তপশিলি জাতিগুলির পেশাগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। পেশাগত বৈচি ত্র্যতার জন্য শ্রেণীগত অবস্থানেও বৈপ্য রীত্য লক্ষ করা যায় এদের মধ্যে। যেহেতু তপশিলি জাতিগুলি মূলত তাদের নিম্নমানের পেশার জন্য সমাজে অসম্মানিত হতেন তাই তাদের পেশাগুলি অর্থনৈতিক শ্রেনীতে উচ্চস্থান দখল করতে পারেনি। এবার এপ্রসঙ্গে

একটু আলোকপাত করা যাক। কৃষিজীবি হিসাবে আমরা মূলত রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র,   ভূঁইয়া, পালিয়া, প্রভৃতির কথা বলতে পারি যারা সংখ্যাগত ভাবে বেশি ছিল। পাশাপাশি বাগদি, ভুঁইমালি, বাহেলিয়া, বাউড়ি, বেলদার, ভোক্তা, প্রভৃতি জাতিগুলি মূলত কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এদের অবস্থান ছিল মূলত কৃষিশ্রমিক হিসাবে। অন্যদিকে জেলিয়া, কৈবর্ত্য, মালো, কা ন্দ্রা, বিন্দ্, ইত্যাদি, জাতিগুলি ছিল মূলত মৎ স্যজীবি। চর্মকার হিসাবে আমরা পাই   মুচি ও দাবগারদের। তন্তুবায় হিসাবে আমরা পাই পান ও চৌপালদের । অন্যদিকে জামাকাপড় কেঁচে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল ধোপাদের প্রথাগত পেশা। ডোম ও বাটনার গণ মূলত যুক্ত ছিলেন বাঁশের জিনিসপত্র তৈরি করার কাজে। হালালখোর, হাঁড়ি, মেথর ও লালবেগিদের, প্রথাগত কাজ হল ঝাঁড়ু দেওয়া ও নোংড়া আবর্জনা পরিস্কার করা। দেশি মদ তৈরি ক রা ও বিক্রি করা ছিল শুঁড়িদের প্রধান পেশা। তবে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে কোন একটি জাতির সব মানুষই জাতিগত পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেননা। এদের অনেকেই নিজ জাতির বাইরের পেশা গ্রহণ করেছিলেন। তবে বে শিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা যুক্ত ছিলেন উৎপাদনের প্রাথমিক ক্ষেত্রের সঙ্গে।

সারনী ২.৬: বাংলার কয়েকটি তপশিলি জাতির পেশাভিত্তিক অবস্থান ।

ক্রমিক সংখ্যা	**জাতি**	**প্রথাগত পেশা/সামাজিক অবস্থান**
১	বাগদি, দুলে	কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, পালকি বাহক, মাছ ধরার উপকরণ প্রস্তুতকারকএবং অন্যান্য কায়িক শ্রমযুক্ত কাজ।
২	বাউরি	কৃষিকাজ, বাঁধ নির্মাণকারি, কৃষি শ্রমিক।
৩	ভুঁইয়া	কৃষিকাজ, কৃষি শ্রমিক।
৪	চর্মকার/মুচি	চর্মপ্রস্তুতকারক, জুতো প্রস্তুত, বাদ্য যন্ত্রের চামরা সরবরাহকারী।

৫	ধোবা	বস্ত্রধাবক ।
৬	ডোম/ ধাঙ্গর	ঝুড়ি প্রস্তুতকারক।
৭	হাড়ি, মেথর	ঝাড়ুদার।
৮	জেলিয়া কৈবর্ত্য	মৎস্যজীবী, মাছ বিক্রেতা ও মাছ ধরার উপকরণ নির্মাতা।
৯	মালো	মৎস্যজীবী।
১০	কাওরা	কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, পাল্কী বাহক।
১১	লোহার	লৌহদ্রব্য প্রস্তুতকারী।
১২	মাল	সাপধরা, কৃষিজীবী ।
১৩	নম:শূদ্র	কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী।
১৪	পালিয়া	কৃষিজীবী।
১৫	পোদ/পৌণ্ড্র	কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী।
১৬	রাজবংশী	কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, মাছ বিক্রেতা।
১৭	শুড়িঁ	দেশী মদ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা।
১৮	তিয়র	মৎস্যজীবী।

তথ্যসূত্র: H.H Risley: *The Tribes and Castes of Bengal* , 2vols. (Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1891)।

বাংলার তপশিলি জাতিগুলির পেশাগত অবস্থান থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে তাদের কাজের ধরণ উদ্বৃত্ত উপার্জনের পক্ষে যথেষ্ট গুণসম্পন্ন ছিল না। হাতে গোনা কয়েকজন বৃহৎ ভূস্বামী বা জোতদার/তালুকদার/জমিদারদের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে কৃষিমজুর বা ছোটকৃষক বা রায়ত হিসাবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে H.H. Risley ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন যে---

"In Western Bengal we find large number of them working as landless day Labourer, paid in cash or kind, or as nomadic cultivators, tilling other men's land on bhag-jot system (sharecropping), under which they were remunerated by a definite share of the produce sometime one half, sometimes less, as many be arranged with their land lord. I can recall instance of a Bagdi holding a Zamindari, or oven a superior tenure such as Patni or mukarary of an importance."[১৮]

একইভাবে বাউরিদের কথা বলতে গিয়ে Risley লিখেছেন যে---

"Few Bauris are rayats with occupancy rights but the majority probably be put down as under rayats or landless day labourer."[১৯]

পাশাপাশি ভুঁইয়া, কাওড়া, পালিয়া, বিন্দ, ইত্যাদি জাতিগুলির কৃষিজীবী অংশ মালিকানাহীন কৃষিশ্রমিক হিসাবেই দিন কাটাতেন।

তবে কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির অবস্থা খানিকটা ভিন্ন ছিল। এদের মধ্যে ভূমিহীন ভাগচাষী ও ভূমির মালিক বা জোতদার উভয়েরই অস্তিত্ব ল ক্ষ করা যায়। এখানে জমিদাররা সরাসরি সরকারের সঙ্গে ভূমি বন্দোবস্ত করতেন । জোতদার শ্রেণী ছিলেন জমিদার ও চুকানীদারদের মধ্যবর্তী অংশ। চুকানীদাররা আবার জমি তদারকির কাজ ক রাতেন দর-চুকানীদারদের দিয়ে। দরচুকানীদার নিজে বা কৃষক পরিবার (হালুয়া) কে দিয়ে তার জমি

চাষ করাতেন। হালুয়া ও ভাগচাষীদের দিয়ে যারা জমি চাষ করাতেন তাদের বলা হতো গিরি । উত্তরবঙ্গের রংপুর, কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার জমিদার, জোতদার, চুকানীদার, দরচুকানীদার, গিরি ও হালুয়া সবক্ষেত্রেই রাজবংশীদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পূর্ব ও মধ্য দক্ষিণবঙ্গের নমঃশূদ্র ও দক্ষিণবঙ্গের উপকুলবর্তী অঞ্চলের পৌণ্ড্রদের মধ্যে জমিদার থেকে শুরু করে একেবারে নিম্নস্তরে অবস্থানরত ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। এর প্রধান কারণ ছিল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একই জাতির দীর্ঘকাল ধরে মোট জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগুরু হিসাবে বসবাস এবং একই পেশার মধ্যে যুক্ত থাকার প্রবণতা।

মাঝারি মাপের কয়েকটি তপশিলি জাতি যেমন- গোন্‌রি, মালো, জেলিয়া কৈবর্ত্য, তিয়র, বিন্দ, পাটনি, মাল্লা (যারা নিজেদের মূল ত মৎস্যজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল) ইত্যাদির মধ্যেও শ্রেণীগত অবস্থানে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রাক্ ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক আমলে মৎস্যাধারগুলিতে মৎস্যজীবী জাতিগুলির মালিকানা ছিল না। এগুলির প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন জমিদারগণ। ফলে মৎস্যজীবীগণ মূলত ইজারা নিয়ে বা বাৎসরিক খাজনাদানের বিনিময়ে মৎস্যাধারগুলিতে মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করতেন। তবে বড় বড় নদী ও সমূদ্র উপকূল তাদের কাছে নিষ্কর ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে মৎস্যজীবীদের মধ্যে মূলত তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর মৎস্যজীবীগণ ছিলেন জাল, নৌকো ও অন্যান্য মূলধনী সামগ্রির মালিক। তারা তাদের অধীনস্ত ভাগীদার মৎস্যজীবীদের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করে মাছ ধরার প্রকৃয়া চালু রাখতেন । মোট উৎপাদনের বৃহদাংশ জাল ও নৌকা মালিকের প্রাপ্য ছিল। স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ভাবে তারা উচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করতেন। একই ভাবে আড়ৎদার

ও নিকাড়ি (Commission Agent)রাও প্রথম শ্রেণীর মৎস্যজীবী ছিলেন যারা মাছ ধরার সরঞ্জামসহ অর্থ দিয়ে সহায়তা করতেন 'ভাগী-মৎস্যজীবীদের' অন্যদিকে ঋণগ্রহীতাগণ অনেক কমদামে নিকাড়ি বা আড়ৎদারদের কাছে তাদের ধরা মাছ বিক্রি করতে বাধ্য থাকতেন। শুট্‌কিমাছসহ কাঁচামাছের বাজারদরের প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন এরাই। মালো, জেলিয়া কৈবর্ত্য ও তিয়র আড়ৎদার ও নিকাড়িদের অর্থনৈতিক অবস্থা উচ্চশ্রেণীর মতোই ছিল।

বাংলার সমস্ত প্রথাগত মৎস্যজীবী যাদের নিজস্ব জাল নৌকার অভাব ছিল বা থাকলেও তার দ্বারা অধিক পরিমানে মাছ ধরে উচ্চ আয়ের সম্ভাবনা ছিল না তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মৎস্যজীবী হিসাবে অর্থনৈতিক শ্রেণীতে রাখা যায়। এরা নিজেদের ধরা মাছ বাজারে সরাসরি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এরা আড়ৎদার ও মালিক উভয়ের দ্বারাই প্রতারিত হতেন। তৃতীয় শ্রেণীর মৎস্যজীবীদের মধ্যে আমরা উল্লেখ করতে পারি ভাগী মৎস্যশিকারী, সাধারণ পাইকার ও মহিলা মৎস্যজীবী যারা বাজারে মাছ কাটার কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতেন।

তপশিলি জাতিগুলির মধ্যে যারা ঝাড়ুদার হিসাবে ও শৌচালয় এবং নালা -নর্দমা পরিষ্কার করার কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতেন (যেমন হালালখোর, হাঁড়ী, মেথর, লালবেগি , ইত্যাদি) তাদের অর্থনৈতিকভাবে উদ্বৃত্ত উপার্জনের সুযোগ ছিল খুবই কম। পাশাপাশি বাঁশের কাজ ও ঘর ছাউনি দেওয়ার কাজ (ডোম), লোহার জিনিষপত্র তৈরী (লোহার), সাধারণ তাঁতি (পান, চৌপাল) বন থেকে মধু সংগ্রহ (খটিক), জুতো সারাই (মুচি), জামাকাপড় কাঁচার (ধোবা) কাজ

করে তপশিলি জাতিগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব ছিল না। তবে মুচি, ধোবা ও শুঁড়ি (দেশীমদ তৈরী ও বিক্রি) দের উদ্যোগপতি হওয়ার ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সুযোগ ছিল।

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার তপশিলি জাতিগুলি মূলত প্রাথমিক পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারাই ছিলেন বাজারে ফল, সব্জী, খাদ্য ও মাছের প্রধান যোগানদাতা । সার্বিকভাবে এদের পেশা আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক ছিল না। তবে জোতদার, জমিদার ও তালুকদার, আড়ৎদার, নিকাড়ি ও জাল-নৌকার বৃহৎ মহাজন ও শুঁড়িদের উচ্চশ্রেণীতে অবস্থান তাদের নিজস্ব জাতিচেতনা ও সম্মানজনক জাতি নির্মানের আন্দোলনের ব্যয়ভার নির্বাহের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

এপ্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখনীয় বিষয় হল ঔপনিবেশিকতাবাদের কয়েকটি পরাশক্তি (Positive Factors) বাংলা তথা ভারতের নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নির্মানে সহায়ক হয়েছিল। প্রথম ত খ্রিস্টান মিশনারীসহ সরকারি প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যশিক্ষার বিকাশ ও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনের ফলে অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন পরিবারগুলোর ছেলেদের মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগ তৈরী করেছিল । উত্তরবাংলার রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চ ল ও কোচবিহার দে শীয় রাজ্যে উচ্চবিদ্যালয় [জেনকিন্স স্কুল (কোচবিহার), মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল (মাথাভাঙ্গা), এন. এন. এম . হাইস্কুল (তুফানগঞ্জ) ও মহাবিদ্যালয় (ভিক্টোরিয়া কলেজ বর্তমানে ABN Seal College] স্থাপিত হওয়ায় রাজবংশীগণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন (যদিও নিম্নবর্ণীয় রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মহারাজাদের কোন উদ্দেশ্য ছিল না)।[২০]প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কোচবিহার ও

রংপুরে শিক্ষিত রাজবংশীদের মধ্য থেকেই 'রাজবংশী সমাজ সংস্কার আন্দোলন ' বা 'জাতি-রাজনীতির' প্রাণপুরুষদের জন্ম হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীপঞ্চানন বর্মা (১৮৬৫-১৯৩৫) ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮-১৯৮৮)। পাশাপাশি রংপুর থেকেও রাজবংশী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ লাভ ঘটতে থাকে বিংশ শতকের গোড়া থেকে।

অন্যদিকে একেবারে প্রান্ত দক্ষিণবঙ্গের পৌণ্ড্রদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ উপস্থিত হয় কলকাতাকেন্দ্রিক অসংখ্য বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ পাওয়ার ফলে। প্রথমদিকের শিক্ষিত পৌণ্ড্রদের মধ্যে আমরা শ্রীবেনীমাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর (১৮৬৩-১৯০৭), শ্রীরাইচরণ সর্দার ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে পারি যারা পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। [২১] একইভাবে বাংলার অন্যতম বৃহৎ তপশিলি জাতি নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার শুরু হয় ১৮৭০ এর দশক থেকে যার পরিণতি হিসাবে বিংশ শতকের গোড়ায় একটি বুদ্ধিদীপ্ত ও শক্তিশালী নমঃশূদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল। [২২] বাংলার অপেক্ষাকৃত মাঝারি তপ শিলি জাতিগুলিও শিক্ষালাভের ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। মালো, জেলিয়া কৈবর্ত্য বা শুঁড়িদের মধ্যে আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল পরিবারগুলোতে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের প্রবণতা ল ক্ষ করা যায়।[২৩] নিম্নলিখিত সারণীতে (সারণী ২.৭.) ১৯২১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী বাংলার প্রধান তপ শিলি জাতিগুলির শিক্ষার হার সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

সারণী ২.৭: বাংলার তপশিলি জাতিগুলির শিক্ষাগত শ্রেণীবিন্যাস, ১৯২১।

জাতি	মোট জনসংখ্যা	শিক্ষিত জনসংখ্যা	নিরক্ষর জনসংখ্যা
বাগদি	৮৮৬৮২১	১৮৯২০	৮৬৭৯০১

বাউরী	৩০৩০১৩	১৭৭৮	৩০১২৩৫
চামার	১৪৭৬৫৪	৪৫৯৬	১৪৩০৫৮
ধোবা	২২৭২৯৫	১৭৬৯১	২০৯৬০৪
ডোম	১৪৭৮৫৯	২৬৬২	১৪৫১৯৭
হাড়ি	১৪৩৫৯৩	২৬৯২	১৪০৯০১
কোচ	১৩১২৭২	৪২৯৩	১২৬৯৭৯
লোহার	৬৫০৯২	১৬৪০	৬৩৪৪৭
মাল	১১৭২৭১	২৬৫৭	১১৪৬১৪
মালো	২২১১৯২	৯৮২৯	২১১৩৬৩
মুচি	৪১৭২২৫	৮০০৬	৪০৯২১৯
পোদ (পৌণ্ড্র)	৫৭৫৯৯৪	৭০১০৯	৫০৫৮৮৫
রাজবংশী	১৬৬৩৯৪৮	৯৬১৪০	১৫৬৭৮০৮
ভুঁইমালি	৮১৭৯৬	৩৭২২	৭৮০৭৪
নমঃশূদ্র	২০০৪৯১১	১৫০৫৪৮	১৮৫৪৩৬৩
দোসাধ	৩৯৫২৯	১৭৯১	৩৭৭৩৮
জালিয়া কৈবর্ত্য	৩৮৩২২৫	২২৯৪৬	৩৬০২৭৯
কাওরা	১১০১৪১	৩৮০৩	১০৬৩৩৮
পাটনি	৪৩৭৮৪	২৭২৩	৪১০৬১
শুঁড়ি	৯২২৪৬	১৫৩৩৪	৭৬৯১২

তথ্যসূত্র: *Census of India 1921, Vol. V, (Bengal), Part II*, পৃ.২৪০।

এই সারণী অনুযায়ী বলা যায় যে বাংলার বৃহৎ তপ শিলি জাতির কয়েকটি যেমন রাজবংশী, নম:শূদ্র, পৌণ্ড্র ও মাঝারি মাপের কয়েকটি বিশেষ করে শুঁড়ি, মালো, ধোবা, জেলিয়া কৈবর্ত্য, পাটনি ইত্যাদির প্রাথমিক শিক্ষার হার বাগদি, বাউরি, ডোম, হাড়ি, লোহার, মাল, মুচি , প্রভৃতির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। বিংশ শতকের প্রথম দু-দশকের মধ্যে রাজবংশী, নম :শূদ্র,

পৌণ্ড্র, মালো, জেলিয়া কৈবর্ত্য প্রভৃতি জাতির মধ্যে জাতি আন্দোলনে নেতৃ ত্ব দেওয়ার মতো একটি ছোট কিন্তু শক্তিশালী আইনজীবী শ্রেণীর বিকাশ ঘটে যারা ১৯২০ থেকে বাংলার জাতি-রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তবে সার্বিকভাবে ঔপনিবেশিক বাংলার তপ শিলি জাতিগুলির শ্রেণীগত অবস্থান মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। আর্থিক দিক থেকে দূর্বল এই জাতিগুলির সামাজিক অবস্থান ছিল আরও করুন। বাংলার হিন্দুসমাজে তারা 'অন্ত্যজ' (Outcaste) হিসাবেই চিহ্নিত হতেন। কারণ তাদের পেশাগুলিকে কখনই সম্মানজনক বলে মনে করা হতো না। স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন ও আদিমধ্যযুগে রচিত সামাজিক আইনের পুস্তকগুলিতে (শাস্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ, ইত্যাদি) এদেরকে শূদ্র, অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। [২৪] মধ্যযুগের বাংলাতেও এই জাতি গুলির সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন ঘটেনি। মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন 'মঙ্গল' ও বৈষ্ণব সাহিত্যগুলিতে [২৫] এদের প্রান্তিক সামাজিক অবস্থানের কথা বার বার চিত্রিত হয়েছে। আধুনিকযুগের শুরুতেও বাংলার তপশিলি জাতিগুলির সামাজিক অবস্থান (প্রাচীন বা আদি মধ্যযুগের চেয়ে) কোনভাবেই উন্নত ছিল না। এই সামাজিক অবস্থানের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল বিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত। ঔপনিবেশিক আমলে এই জাতিগুলির সামাজিক অবস্থানের আভা স পাওয়া যেতে পারে ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক সহ নিম্নবর্ণীয় শিক্ষিত অংশের স্বকথিত বিবরণের দ্বারা।

ভারতীয় জাতিব্যবস্থায় কৃষিকাজ অসম্মানীয় না হলেও কৃষিজীবী তপ শিলি জাতিগুলির সামাজিক সম্মান ছিল না। কৃষিজীবী নমঃশূদ্রদের প্রতি 'চণ্ডাল' সম সামাজিক ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের একটা স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হয়েছিল। হাটে, মাঠে, শিক্ষাঙ্গনে,

ছাত্রাবাসে বা সেনা ছাউনিতে নমঃশুদ্রদের 'চণ্ডাল' হিসাবে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া তাদেরকে প্রান্তিক মানুষে পরিণত করেছিল। [২৬] একই ভাবে কৃষিজীবী রাজবংশীদের সামাজিক অবস্থার ব্যতিক্রমী চরিত্র ছিলনা। এমনকি পাশ্চাত্যশিক্ষা গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার উচ্চপদে আসীন হলেও রাজবংশীদের উন্নত জীবনযাপনকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা মানতে রাজী ছিলেন না। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মন (যাকে নিয়ে বর্তমান গবেষণা) তাঁর রচনায় তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা রাজবংশীদের প্রতি উচ্চবর্ণীয়দের দৃষ্টীভঙ্গির একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। প্রথম ঘটনাটি রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ পঞ্চানন বর্মার সঙ্গে যুক্ত। পঞ্চানন বর্মা ১৯১০সালে ভুলবশত: জনৈক মিত্র পদবীধারী সহকর্মীর টুপি পরে জর্জকোটে মামলা লড়তে যান। ভুল শুধরে নিয়ে সেই টুপি মি. মৈত্রকে ফেরত দিতে গেলে মি. মৈত্র ঘৃণাভরে বলেছিলেন----'I hate to use a toga used by a Rajbanshi'।[২৭] এর মর্মার্থ হল 'একজন রাজবংশী সে যতই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শি ক্ষিত উকিল হোক না কেন তার ব্যবহার করা জিনিস মিঃ মৈত্রর মত বৈদ্য, কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ জাতির কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য '। উপেন্দ্রনাথ বর্মন আরো এরকম দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলি ছাত্রাবাসে রাজবংশী ছাত্রদের সহ্য করতে হতো। প্রথমটি হল রংপুরের নর্মাল স্কুলের ছাত্রাবাসের ঘটনা যেখানে রাজবংশী ছাত্রদের 'অস্পৃশ্য' বলে মনে করত উচ্চবর্ণীয় ছাত্ররা।[২৮]

অনুরূপভাবে আরেকটি ঘটনার কথা উপেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে 'কিভাবে কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রাবাসে ১৯১৯ সালে তাকে জাতিভেদ প্রথার শিকার হতে হয়েছিল ।' ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে 'হোস্টেল

সুপারিন্টেনডেন্ট অধ্যাপক ফনীভূষন চ্যাটার্জী হটাৎ একদিন Notice বইতে নোটিশ দিলেন "The smaller dining hall is reserved for Brahmins, the bigger dining hall is for Kayasthas and Vaidyas, and the পরেটা hall is for others, for takin g their meals'।[২৯]অর্থাৎ জাতি অনুযায়ী খাবারের ঘর ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ তা মানতে অস্বীকার করেন ও কোচবিহার রাজ্যের State Superintendent এর হস্তক্ষেপে এই জাতিভেদ ব্যবস্থাকে ঐ কলেজের ছাত্রাবাস থেকে তুলে দেওয়া হয়।[৩০]

উপরে বর্ণিত এই ঘটনাব লিগুলি থেকে আমরা রাজবংশীদের নিম্নসামাজিক অবস্থানের একটা ধারণা পেতে পারি। বাংলার অন্যান্য নিম্ন বর্ণীয় জাতি যেমন পৌণ্ড্র, মালো, জেলিয়া কৈবর্ত্য, ইত্যাদি যারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মাছধরার কাজে যুক্ত ছিলেন তাদেরকেও উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সমাজ কোন দিনই সুনজরে দেখেনি। ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্যায়ে লিখিত প্রখ্যাত সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মনের (১৯১৪-৫১) রচনায় বাংলা মৎস্যজীবীদের জাতপাতের অভিজ্ঞতার একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ।[৩১]মালোদের মতো পৌণ্ড্রদেরকেও জাতপাতের অন্যায় সহ্য করতে হয়েছে বারবার। পৌণ্ড্রজাতির প্রথম আইনজীবী শ্রীরাইচরণ সর্দার তার আত্মচরিতে জাতপাতের বেশ কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হল। তার নিজের ভাষায়—

"ধামুয়ায় অবস্থানকালে একটি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য মনে করি। স্কুলের হেডপণ্ডিত ভূবনমোহন চক্রবর্তী মহাশয় ঐ গ্রামে গিরীশচন্দ্র পুততুণ্ড মহাশয়ের বাটিতে থাকিতেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রতিদিন প্রাতে ২ ঘণ্টা তাহার নিকট

পড়িতাম। ঐ পুততুণ্ড মহাশয়ের বহির্বাটিতে আমি ও রামকমল নামে একজন নরসুন্দর বালক আসন স্বরূপ একটি ছিন্ন মাদুর পাইয়াছিলাম। ৩রা ভাদ্র তারিখে ঘটনাক্রমে আমার ওই আসন তাহাদের বিধবা ভগিনীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ইহা দেখিবামাত্র তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি কটু ভাষায় তিরস্কার করিলেন। লজ্জায় অবনত মস্তকে আমি তাহা শুনিলাম...।"[৩২]

এই ঘটনা তৎকালীন সমাজের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটা উদাহরণ মাত্র। সমাজে আরো করুন অবস্থা ছিল শুঁড়ি, হাড়ি, ডোম, মেথর বা লালবেগীদের মতো তপশিলি জাতিগুলির।

২.৪. পর্যবেক্ষণ

আদমশুমারি প্রবর্তনের পূর্বে জাতপাতের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিম্নবর্ণীয়দের হাতে কোন সরকারি অস্ত্র ছিল না। ছিল না জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার মতো আধুনিক শিক্ষাও। ১৮৮০র দশক থেকে বাংলার নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির শিক্ষিত ও আত্মসম্মানে বিশ্বাসী অংশ অস্পৃশ্যতা ও নিম্ন সামাজিক অবস্থান জনিত হীনমন্যতা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিল দুটোপথ। প্রথমটি ছিল- উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের মতো সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করে যাগযজ্ঞের দ্বারা নিজেদের উচ্চ বর্ণীয় জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা (যাকে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক সংস্কৃত্যায়ণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন) । দ্বিতীয়টি হল নিজেদের জন্য একটি পরিবর্ত সামাজিক পরিচিতি ও সংস্কৃতির (alternative social identity and cultural practices) নির্মান। এই বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. ১৯৩৬ এর *The Government of India Scheduled Caste Order (1936)* অনুযায়ী 'তপশিলি জাতি ' নামের সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তা তৈরী হওয়ার পূ র্বে এরা Depressed Caste, Depressed Class, Semi-Hinduised Castes, Aboriginal Castes, ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়েছেন।

২. Nicholas B. Dirks : *Castes of Mind: Colonialism and Making of Modern India*, (New Delhi, Permanent Black, 2008), পৃ.২১০।

৩. H. Beverley: *Report on the Census of Bengal 1872*, (Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1872); W.W Hunter: *Statistical Account of Bengal, 20 Vols.*, (London, Trubner and Co., 1875-76), reprinted in India, (New Delhi, Concept Publishing Company, 1984).

৪. Racial Classificationকে যারা গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— J.A. Baines (Census Commissioner, 1891); James Wise (*Notes on the Races, Castes Trades of Eastern Bengal,* (London, Harrisons and Sons, 1883) এর গ্রন্থকার ; ও H.H. Risley (*The Tribes and Castes of Bengal, 2 Vols.* (Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1891) এর গ্রন্থকা র ও ICS)।

৫. *The Government of India (Scheduled Castes Order)* গৃহীত হয় ১৯৩৬ এ। এর পূর্বে বিশেষ করে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ এর মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকার অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়াস করেছিল।

৬. *The Constitution (Scheduled Tribe)Order 1950.* Published with the Ministry of Law Notification No S.R.O. 510, Dated 6th September 1950, *Gazette of India , Extraordinary , 1950 , Part II, Section 3, Page 597*। এই আদেশের দ্বারা তপশিলি উপজাতিগুলিকে তপশিলি জাতির তালিকা থেকে আলাদা করে পৃথক তালিকায় স্থান দেওয়া হয়।

৭. Rup Kumar Barman: *Partition of India and its Impact on the Scheduled Castes of Bengal*, (New Delhi, Abhijeet Publications, 2012), p. ৩৬।

৮. Ekta Singh: *Caste System in India: A Historical Perspective*, (Delhi, Kalpaz Publications, 2005), পৃ.পৃ. ২০-২৯, ৯৯-১০০।

৯. *শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা (বাংলা)*, (গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, ২০১২), *চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক নং- ১৩*, পৃ. ৫৯।

১০. Debi Chatterjee: *Ideas and Movements against Caste in India*, (Calcutta, Print O Graph Publishing, 1998), পৃ. ১২।

১১. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

১২.Ekta Singh: *প্রাগুক্ত*,পৃ.পৃ. ৩৩-৩৪।

১৩. *তদেব*, পৃপৃ. ৩৪-৩৬, ১০০।

১৪. Chino Rao Yagati: *Dalit Studies: A Bibliographical Handbook*, (New Delhi, Kanishka Publishers and Distributors, 2003), পৃ. ৩।

১৫.জৈন ধর্মের মূল প্রচারক মহাবীর (৫৪০ খ্রিঃ পূঃ-৪৬৮ খ্রিঃ পূঃ) ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ (৫৬৬ খ্রি পূঃ- ৪৮৬ খ্রিঃ পূঃ) হিংসাবর্জিত মানবতাবাদী ধর্ম প্রতিষ্ঠায় জোড় দিয়েছিলেন। জাতপাত অধ্যুষিত ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ায় এদেরকে প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়।

১৬. মধ্য এশিয়া থেকে উত্তরপশ্চিমের পথ ধরে ভারতে বারবার প্রবেশ করেছে বিভিন্ন জাতি-উপজাতি। ভারতে প্রবেশ করে যারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কুষাণ (খ্রিস্টিয় প্রথম শতক থেকে তৃতীয় শতক) ও ইন্দো-গ্রীকগণ।

১৭. পঞ্চানন তর্করত্ন (স) :*বৃহৎধর্ম পুরাণ*, ২য় সংস্করণ, (কলকাতা, বঙ্গবাসী ইলেট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৪), *তৃতীয় অংশ, অধ্যায়, ১৩।*

১৮.H.H. Risley: *প্রাগুক্ত* পৃ. ৪২।

১৯. *তদেব*, পৃ. ৭৮।

২০. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন----H.N. Choudhuri: *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement* , (Cooch Behar, The Cooch State Press, 1903).

২১. Rup Kumar Barman: From Pod to Poundra: A Study of the Poundra Kshatriya Movement for Social Justice, *Voice of Dalit, Vol. 7, (No I, 2014*), পৃ.পৃ. ১২১-১৩৭।

২২. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন---Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal 1872-1947* , (Richmond, Surrey, Curzon Press, 1997).

২৩. রূপ কুমার বর্মন : *বাংলার নিম্নবর্ণীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান* , *অন্তর্মুখ, পর্ব-৩, সংখ্যা -৩ (জানুয়ারী- মার্চ, ২০১৪),* পৃপৃ. ১০৬-১২১।।

২৪. বিস্তৃত বিবরণের দেখুন--পঞ্চানন তর্করত্ন (স) :*বৃহৎধর্ম পুরাণ,* ২য় সংস্করণ, (কলকাতা, বঙ্গবাসী ইলেট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৪),

২৫. এপ্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী: *গোসানী মঙ্গল,* নৃপেন্দ্রনাথ পাল (স): (কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী, ১৯৯২); উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু: *কথাগুরু চরিত*, হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া (স): ৪র্থ সংস্করণ, (গৌহাটি, দত্তবরুয়া পাবলিশিং কো: প্রা: লি:, ২০০২),| ইত্যাদি; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২৬. *Letter No. 340, dated 8th April, 1873 From W.S. Well Esq. Magistrate of Furredpore to The Commissioner of the Dacca Division;* ও *Letter No. 106. Dated 19th April 1873, From M.D. Bose (Superintendent of the Alipore Jail), to W.S. Wills. Esq, (Magistrate of Fureedepore).*

২৭. উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত* , চতুর্থ সংস্করণ , (জলপাইগুড়ি, শিবেন্দ্রনাথ রায়, ১৪০৮ সন), পৃ. ১৩।

২৮. *তদেব*।

২৯. উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি,* (জলপাইগুড়ি, বিজয় চন্দ্র ব্রহ্ম, ১৩৮২), পৃ. ৪৩।

৩০. *তদেব*।

৩১. অদ্বৈত মল্লবর্মন : *তিতাস একটি নদীর নাম* , অচিন্ত্য বিশ্বাস (স):*অদ্বৈত মল্লবর্মন রচনা সংগ্রহ* , (কোলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০০০)।

৩২. রাইচরন সর্দার: *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা*, সনৎকুমার নস্কর (স): *পৌণ্ড্রমনীষা,* (সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসংঘ, ২০১২), পৃ. ২৫৮।

তৃতীয় অধ্যায়
ঔপনিবেশিক বাংলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন

ঔপনিবেশিক শাসনকালের শেষ পর্যায়ে 'জাতি চেতনা' (Caste Consciousness)ও জাতি পরিচিতি নির্মানের সামাজিক আন্দোলন , বহুজাতি ও বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় সমাজে এক নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এবং তৎকালীন ভারতীয় সমাজের সামাজিক বৈষম্যের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে বাংলা তথা ব্রিটিশ ভারতের নি ম্নবর্ণীয় জাতিগুলি সম্মানজনক আত্মপরিচিতি নির্মানের যে আন্দোলন শুরু করেছিল তা বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিতে জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাশাপাশি জাতি-কেন্দ্রিক রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল। বর্তমান অধ্যায়ে জাতি চেতনার সূচনা, রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের বিকাশ ও এতে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের ভূমিকার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.১. ঔপনিবেশিক বাংলার নিম্নবর্নীয়দের জাতিচেতনা ও সমাজ আন্দোলনের সূত্রপাত

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমিকাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে বিশেষ করে ভারতে আদমশুমারির সূচনাকাল অর্থাৎ ১৮৭০ র দশক থেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দ্বারা বাংলা তথা ভারতে জাতিভিত্তিক সামাজিক শ্রেণীকরণের (Social Stratification) প্রক্রিয়া

উচ্চ-নীচ (দ্বিজঃ, অ -দ্বিজঃ, অন্ত্যজ) নির্বিশেষে এক নতুন জাতিভাবনার ধারা সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন জাতির 'পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ' সরকারি নথিপত্রে উচ্চ সামাজিক স্থান লাভের প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে ছিল।[১] আদম শুমারির দায়িত্বে থাকা দপ্তরগুলিতে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে নিজ নিজ জাতির উচ্চস্থান প্রতিষ্ঠার আশায় জাতিভিত্তিক সামাজিক সংগঠন ও নিজ নিজ জাতির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার কা জে এগিয়ে এসেছিলেন তারা। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাখরগঞ্জ অঞ্চলের চণ্ডালেরা নমঃশূদ্র নামধারণ করে এক সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। অনুরূপভাবে ১ ৮৯১ এ রংপুরে রাজবংশীদের মধ্যে 'ক্ষত্রিয়' পরিচিতি লাভের আন্দোলন শুরু হয়। বিংশ শতকের গোড়ায় 'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ' ও 'মল্ল ক্ষত্রিয় ' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পাশাপাশি ধোবা, ভুঁইমালি, শুঁড়ি ও জেলিয়া কৈবর্ত্যগণ 'বৈশ্য' পরিচিতি নির্মানের আন্দোলন শুরু করে ন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সামাজিক পরচিতি নির্মানের আন্দোলন আদম শুমারি প্রচলনের পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং এক্ষেত্রে তথাকথিত উচ্চবর্নীয় জাতিগুলির মধ্যে এর যথেষ্ট প্রভাব ও ছিল।[২] কিন্তু আদম শুমারি প্রচলনের পর উচ্চবর্ণের পাশাপাশি তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় জাতির মধ্যে এর দ্রুত বিকাশ ঘটে। পরবর্তী অংশে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৩.২. ঔপনিবেশিক বাংলায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় চেতনার প্রেক্ষাপট

ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথমভাগে বাংলার নিম্নবর্নীয় জাতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল ক্ষত্রিয় পরিচিতির আন্দোলন। এক্ষেত্রে রাজবংশী, পৌণ্ড্র,

মালো, বাগদি; ইত্যাদি জাতিগুলির সামাজিক আন্দোলন বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছিল। এই আন্দোলনগুলি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে বাংলার জাতি-রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাবও বিস্তার করেছিল।

কোন অ-ক্ষত্রিয় জাতির ক্ষত্রিয় পরিচিতি নির্মানের প্রচেষ্টা বা ক্ষত্রিয়জনোচিত আচার-আচরণ গ্রহণের প্রয়াস অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। উপজাতীয় স্তর বা তথাকথিত অনার্য জাতিগুলির রাজ্যগঠন ও রাজশক্তিকে বৈধতা দানের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের সহায়তায় ক্ষত্রিয় উপাধি ধারণ ও বিনিময়ে ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মত্তোর ও দেবোত্তর সম্পত্তি দানসহ পার্থিব পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জন প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উড়িষ্যার গঙ্গ রাজবংশ, মল্লভূমের মল্ল রাজবংশ, উত্তরপূর্ব ভারতের কোচ, ম্লেচ্ছ, শালস্তম্ভ, ত্রিপুরা, জয়ন্তিয়া, মেইতেই ও কাছারি রাজবংশের ইতিহাসে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে ল ক্ষ করা যায়।[৩] ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জনের এই ধরণের প্রয়াসগুলো মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রোনোদিত ছিল ও কেবলমাত্র শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাংলার ক্ষত্রিয় আন্দোলনগুলোর সূত্রপাত হয়েছিল সামাজিক মর্যাদা (Social dignity) বা সম্মানজনক সামাজিক পরিচিতি (Respectable Social Identity) নির্মানের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

ঔপনিবেশিক বংলায় এই ধরণের সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক সরকারের একটি সরকারি আদেশকে কেন্দ্র করে। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ এই আদেশটি জা রি করেছিলেন

রংপুরের তৎকালীন জেলা শাসক F.A. Skyne যেখানে জনগণনায় রাজবংশীদের ' কোচ' হিসাবে উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছিল।[৪] কিন্তু রংপুরসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামের রাজবংশীদের কাছে কোচ হিসাবে সরকারি পরিচিতি মোটেও সম্মানজনক ছিল না। তারা মনে করতেন যে উপজাতি স্তর থেকে উন্নীত কোচ জাতি কোচবিহারসহ আসামের বিভিন্ন রাজবংশের শাসকগোষ্ঠী হলেও তারা কিন্তু সামাজিক অবস্থানে রাজবংশীদের থেকে হীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকে ঔপনিবেশিক শাসক পণ্ডিতগণ (Colonial administrative scholars) ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মতো 'কোচ' ও রাজবংশীদের সামাজিক পরিচিতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার প্রচার করে পরিচিতির বিশৃঙ্খলা তৈরী করেছিলেন। প্রাক্ ঔপনিবেশিক আমলে (ষোড়শ শতকে) সৃষ্ট কোচ রাজ্যের ইতিহাসের শাসকগোষ্ঠি কোচগণ নিজেদের কখনই রাজবংশী বলে পরিচয় দেননি। কোচ রাজ্যের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানে বিশেষ করে বুরঞ্জি ও বংশাবলীগুলিতে (সূর্যঘড়ি দৈবজ্ঞের *'দরং রাজ বংশাবলী'*, রিপুঞ্জয় দাসের *'রাজ বংশাবলী'*, জয়নাথ ঘোষের *'রাজোপাখ্যান'*, ইত্যাদি) কোচদের 'শিববংশী' (শিব থেকে জাত) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫] তাছাড়া রামচরণ ঠাকুর লিখিত *গুরুচরিত(শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের লীলাচরিত)* নামের বৈষ্ণব গুরু শংকরদেবের (১৫৪৯-১৫৬৮) জীবনচরিতে কোচ শাসকগোষ্ঠী ও রাজবংশীদের পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] কিন্তু ঊনবিংশ শতকের গোড়াতে বুকানন হ্যামিল্টন রংপুর, দিনাজপুর ও আসামে তার পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণকালে (১৮০৭-১৮১৪) লিখেছিলেন যে the Koches were designated as Rajbanshis although Rajbanshis are not Koch।[৭] অর্থাৎ কোচগণ নিজেদের রাজবংশী হিসাবে

পরিচয় দিলেও সমস্ত রাজবংশী কিন্তু কোচ নন। বুকাননের এই মতামত কে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে আরো জটিল করে পরিবেশন করেন B.H. Hodgson.। Hodgson এর ভাষায় The Koches, the Meches and the Kacharis originated from the great Mongolian race and Koches or Rajbanshis are merely the most Hinduised form of the common stock।[৮] বুকানন ও হজসন এর বক্তব্যকে পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় যে তারা উভয়েই রাজবংশী ও কোচদের একই পরিচয়ে (রাজবংশী) পরিচয় প্রদানের সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছিলেন। ১৮৯১ এ F.A. Skyneএর নির্দেশ অর্থাৎ "রাজবংশী ও কো চ একই জাতির মানুষ" তার পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক পর্যবেক্ষকদের মতামতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

কিন্তু রংপুরের জেলাশাসকের আদেশকে সেখানকার চিন্তাশীল রাজবংশী শিক্ষিত শ্রেণী সর্বান্তকরণে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। তারা মনে করতেন যে 'উপজাতি স্তর থেকে উঠে আসা কোচগণ কোনভাবেই রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের সমতুল হতে পারে না।' এই ভাবাবেগকে আনুষ্ঠানিক রূপদিতে এগিয়ে এসেছিলেন রংপুর শহরবাসী শ্যামপুরের রাজবংশী জমিদার শ্রীহরমোহন রায় (খাজাঞ্চী)। তার সভাপতিত্বে গঠিত হয় "রংপুর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী সভা'।[৯] এই সভার প্রতিনিধিগণ ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯১) রংপুরের জেলাশাসক স্কাইন সাহেবের কাছে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়ে কোচ ও রাজবংশীদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করার দা বি জানান।[১০]জাতি পরিচিতি নির্মানের এই কাজে হরমোহন রায় পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছিলেন রাজচন্দ্র সরকার (গাইবান্ধা, রংপুর), শ্রীনবীনচন্দ্র সরকার (কালীগঞ্জ, রংপুর) , প্রভৃতি রাজবংশী শিক্ষিত সহযোদ্ধা দের। 'রংপুর ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী সভার' দা বিকে ব্রিটিশ

সরকারের প্রতিনিধি স্কাইন সাহেব সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। হিন্দু জাতিব্যবস্থায় রাজবংশীদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করার জন্য তিনি এবার দ্বারস্থ হলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের (জাতি ব্যবস্থায় কোনও ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয়ে যাদের মতামত সরকা রি ভাবে মেনে নেওয়া হতো)। রংপুরের বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত তথা রংপুর ধর্মসভার সভাপতি "মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়" F.A.Skyne কে তার শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে 'কোচ ও রাজবংশী জাতি আলাদা আলাদা জাতি ও সামাজিক মর্যাদায় রাজবংশীগণ অনেক উন্নত যারা হিন্দু জাতি ব্যবস্থায় 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' হিসাবে পরিগণিত হতে পারেন।' যাদবেশ্বর তর্করত্নের ভাষায়--

> "কোচ্ ও রাজবংশী দুইটি জাতি পৃথক জাতি। কোচ অতি নিকৃষ্ট জাতি। তাহার ব্যবসায়, আহার, ব্যবহার সমস্তই নিকৃষ্ট, রাজবংশী জাতির আচার ব্যবহার সমস্তই উৎকৃষ্ট। তাহাদের বিবাহাদি সংস্কার সমস্ত উচ্চ-জাতির ন্যায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনুসংহিতা লিখিত হইবার পূর্বে কতকগুলি ক্ষত্রিয় ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিয়াছিল। সেই সময় তাহাদের সংস্কার হয় নাই বলিয়া আচার ভ্রষ্ট ও পতিত হয়। ..... পৌণ্ড্র দেশে যাহারা বাস করিয়াছে তাহারও আচার ভ্রষ্ট ও পতিত। ...যে ক্ষত্রিয় জাতির উপনয়ন হয় নাই তাহারাই 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' বলিয়া শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। সুতরাং রাজবংশীকে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' লেখাই কর্তব্য।"[১১]

স্কাইন সাহেব যাদবেশ্বর তর্করত্নের মতামত শুধুমাত্র অভ্রান্ত বলেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি আদমশুমারিতে রাজবংশী জাতিকে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' হিসাবে গণ্য করার আদেশও দিয়েছিলেন

২৮শে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু যাদবেশ্বর তর্করত্ন, বা স্কাইনসাহেব কারোর মতামতই রংপুরের উচ্চবর্ণীয় হিন্দু জাতির শিক্ষিত অংশ মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। রাজবং শীদের 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতি' হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল বাধা আসে রংপুরের কয়েকজন অ-রাজবংশী জমিদার ও আইনব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে। এই বাধা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে রংপুরের জেলাশাসককে পুনরায় রংপুর ধর্মসভার দ্বারস্থ হতে হয়। এবার রংপুর ধর্মসভা নবদ্বী প ও কলকাতার স্বনামধন্য সংস্কৃত শাস্ত্র বিশারদ ৪০০ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপস্থিতিতে রাজবংশীদের জাতি নির্ণয়ের আলোচনায় ব্রতী হয়। ১৫ই মার্চ (১৮৯১) এই ধর্মসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে "রাজবংশী দের হিন্দু ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত করতে কারো আপত্তি নেই। তবে সেনসাসে এটা উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় যে তারা রাজবংশী শাখার অন্তর্গত ।"[১২] এই মতামতকে গ্রহণ করে F.A. Skyne সরকা রি নথিতে রাজবংশীদের 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ' হিসাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়াসী হন। ক্ষত্রিয় জাতি পরিচিতি নির্মানের এই অগ্রগতি রংপুরের রাজবংশীদের মনে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাজবংশী ব্রাত্যক্ষত্রিয় আন্দোলন তখনও পর্যন্ত অভিপ্ত সফলতা পায়নি। কারন F.A. Skyne এর আবেদনকে Census Superintendent গ্রহণ করেননি। ফলে ১৮৯১ সালের জনগণনাতে 'কোচ ও রাজবংশী'অভিন্ন জাতি হিসাবেই বর্ণিত হয়। ১৯০১ সালের গোড়ায় কোচবিহার ও রংপুরের রাজবংশী আইনজীবীগণ এ রপর রংপুরের জেলাশাসক P.C. Mitraর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু মিত্রসাহেব ১৯০১ এর ২রা ফেব্রুয়ারী রাজবংশী ব্যবহারজীবীদের আবেদনের প্রত্তুত্তরে জানান – On a recent reference to the

Superintendent of Census operation, he has ordered that the men are to be classed as Rajbansis and not Bratya Kshatriya. I therefore decline to reopen the matter।[১৩]মিত্র সাহেব রাজবংশীদের সামাজিক পরিচিতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে আমল না দিলেও রাজবংশী ব্রাত্যক্ষত্রিয় আন্দোলনের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তারা এবার স্বয়ং Census Superintendent এর কাছে আবেদন জানান। কিন্ত তিনি এব্যপারে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে তার পক্ষে নতুন কোন আদেশ জারি করা সম্ভব নয়। তবে এর পরেও রাজবংশী সমাজ আন্দোলনের নেতৃবর্গকে দমিয়ে রাখা যায় নি। ১৯০১ এর ১৯শে এপ্রিল বাংলার গভর্নর Sir George Woodburn এর কাছে তারা রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় পরিচয়ের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আবেদন জানান। সামাজিক পরিচিতির সরকারি স্বীকৃতি পেতে রাজবংশীদের এই অদম্য প্রয়াস ১৯০১ সালেও সফলতা পায়নি। ১৯০১ সালের জনগণনাতে রাজবংশী ও কোচগণ একই মর্যাদার অধিকারী বলে সরকারিভাবে প্রচারিত হয়।[১৪]

রংপুর, জলপাইগুড়ি ও তুফানগঞ্জে র (কোচবিহার রাজ্য) রাজবংশী আইন বিশে ষজ্ঞগণ ক্ষত্রিয় আন্দোলনের এই পরিণতিতে সম্পূর্ণভাবে হতাশ হয়ে পড়েননি। বরং ১৯০১ সালে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই অধ্যায়টি হল সরকারিক্ষেত্রের বাইরে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে রাজবংশীদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধের (Self-respect) সঞ্চার করা। এই আত্মসম্মানবোধের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছিলেন নিম্নআসামের রাজবংশী চিন্তাবিদ শ্রীহরকিশোর অধিকারী । শ্রীঅধিকারী ১৩১৫ সনে (১৯০৮) তার *'রাজবংশী কুলপ্রদীপ'* গ্রন্থে রাজবংশী সমাজের স্বকীয়তা প্রমানের চেষ্টা করেন।

তার মতে পৌরাণিক চরিত্র পরশুরামের ভয়ে পলায়িত ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর হিসাবে রাজবংশী জাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয়ে পরিণত হয়। [১৫] উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষ ৎ এর চতুর্থ অধিবেশনের কার্যবিবরণীর সূত্র ধরে শ্রীঅধিকারী আরও উল্লেখ করেছেন যে 'রত্নপীঠে (উত্তরবঙ্গে) বসবাসকারী ক্ষত্রিয়দের উত্তরাধিকারীগণই হলেন পরবর্তীকালের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি '।[১৬] সুতরাং তারা কোনভাবেই অস্পৃশ্য , অন্ত্য জ বা সামাজিক মর্যাদায় হীন কোন জাতি নন। হরকিশোর অধিকারীর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমানের প্রচেষ্টা রাজবংশীসহ উচ্চব র্ণীয় হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আসামে অবস্থিত কোচবিহার রাজবংশের দুটো শাখা (বিজনী ও সিদলী রাজপরিবার), নিম্নআসাম ও উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত রাজবংশী জনমানসে ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমান হিসাবে হরকিশোর অধিকারীর এই বইটি দারু ন সমাদৃত হয়। এমনকি এটি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় থাকাকালীন সিদলি রাজপরিবারের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাকিংকর বিদ্যাবাগীশ মন্তব্য করেন- "রাজবংশী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরকিশোর বাবুর রচিত '*কুলপ্রদীপ*' গ্রন্থ শ্রবনে অনেক স্থিরিকৃত হইল" ।[১৭] সিদলীর রাজা অভয় নারায়ন দেব, কুমার নিরঞ্জন নারায়ন দেব, শ্রীললিত নারায়ন দেব, শ্রীঅভয় নারায়ন কো ঙার, ও শ্রীকৃষ্ণ নারায়ন দেব প্রমুখ *কুলপ্রদীপের* পাণ্ডুলিপি শ্রবন করে (১৩১২ সালের ১২ই কার্ত্তিক) উৎসাহিত হয়ে পুলকিত চিত্তে রাজবংশী জাতির উন্নতি কল্পে আগ্রহ প্রকাশ করেন।[১৮] একই সঙ্গে বিজনী রাজপরিবারের মহারানী শ্রীঅধিকারী মহাশয়ের কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[১৯]

শ্রীঅধিকারীর পুস্তকটি রাজপৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও আসাম ও উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের প্র শংসা ও রাজবংশী জাতির উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীঅধিকারীর মতামতের সমর্থন

আদায় করেছিল। কামরূপের আল্লাবাড়ি সত্রের শ্রীঅনন্ত নারায়ণ স্মৃতিরত্ন গোস্বামী শ্রীঅধিকারীকে এক চিঠিতে (১৩১৪ এর ২২শে মাঘ) লিখেছেন.----

"তোমার সংগৃহীত রাজবংশী কুলপ্রদীপ বইখানি পাঠ করিয়া অতীব সুখী হইলাম। যতদূর সংগ্রহ করিতেছ, তাহা তোমাকে এক কা লি ক লমে লেখা যায় না। এই বিষয়ে তোমাকে ধন্য(বাদ) প্রদান করিলাম।"[২০]

একইভাবে উত্তর সালমারা (গোয়ালপাড়া)থেকে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দেবশর্মা শ্রীঅধিকারীকে লিখেছেন-

"রাজবংশী কুলপ্রদীপ নামক পুস্তক খানি পাইয়া অতীব সন্তোষ লাভ করিলাম। কিন্তু হায়! দিন দিন আপনি শোচনীয় দশায় উপনীত হইতেছেন জানিয়া বড়ই কষ্টানুভব করিলাম।....এহেন রুগ্নাব স্থায় যিনি স্বদেশের ও স্বসমাজের হিত চিন্তায় জীবন ব্রত পালনে নিরত, সেই ক্ষণজন্মা মহাত্মাকে যে কি বলিয়া প্রশংসা করিব, তাহা এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের বুদ্ধিতে আর কুলাইতেছে না।...... ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন জগতে আপনার কীর্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকর স্থায়ী হয়।"[২১]

ডোমজুড় (হাওড়া) থেকে অনুরূপভাবে শ্রীজগন্নাথ দেবশর্মা জ্যোতিভূষন শ্রীহরকিশোর অধিকারীর বক্তব্য সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছিলেন।[২২]

রাজবংশী কুলপ্রদীপ সবচেয়ে বেশী উদ্দিপনার সঞ্চার করেছিল আসাম ও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী শিক্ষিত সমাজে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত আসাম ও পূর্ববঙ্গ একই প্রদেশে সন্নিহিত থাকায় রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলির সঙ্গে নিম্ন আসামের জেলাগুলির নিবিড় শাসনতান্ত্রিক যোগাযোগ তৈরী হয়েছিল। [২৩] গোয়ালপাড়া ও রংপুর জেলা

প্রতিবেশী হওয়ায় ঐ অঞ্চলের রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিকে জোড়ালো করার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। শ্রীহরকিশোর অধিকারী মহাশয়কে পাঠানো কয়েকটি চিঠির আলোচনা করলে রাজবংশী সমাজে কুলপ্রদীপের প্রভাবকে বোঝা যেতে পারে। প্রতাপগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) থেকে১৩১৬ এর ১১ই আষাঢ় শ্রীদামোদর সরকার শ্রীহরকিশোর অধিকারীকে লিখেছেন-

> "মহাশয়! আপনার প্রনীত রাজবংশী কুলপ্রদীপ কয়েকখানি আনাইয়া আমরা পাঠ করিলাম এবং সুখী হইলাম। আপনি যে একটি নিদ্রিত সমাজকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে আপনাকে শতশত ধন্যবাদ দিতেছি।"[২৪]

প্রায় একই ভাষায় সেনপাড়া (রংপুর) থেকে (১৩১৬র ১১ই আষাঢ়) শ্রীমহেন্দ্র নারায়ন মোহন্ত লিখেছেন-

> "আপনার কৃত 'রাজবংশী কুলপ্রদীপ' নামক পুস্তকখানি পা ঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম।....এতদিন পরে আমাদের জাতি সম্বন্ধে যে একখানা পুস্তক বাহির হইল জানিয়া আমি যে কিরূপ আনন্দ সাগরে ভাসিতেছি, তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। আর আপনি যে এরূপ প্রমান সংগ্রহ করিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, যেন আপনি জাতি সম্বন্ধে আরোও প্রমানাদি সংগ্রহ করিয়া আমাদের ও ঈশ্বরের ধন্যবাদার্হ হন।"[২৫]

রংপুর থেকে প্রকাশিত রাজবংশী সমাজের মুখপাত্র 'বঙ্গজননী' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশশিমোহন অধিকারী শ্রীঅধিকারীর *রাজবংশী কুলপ্রদীপের* বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ১৩১৬ সালের ২০শে শ্রাবন হরকিশোরবাবুকে তিনি লেখেন-

"ধন্য আপনার গবেষণা। ধন্য আপনার অনুসন্ধিৎসু বৃত্তি এবং অধ্যাবসায়। আপনি রাজবংশী সমাজের বন্ধু, নেতা ও পূজনীয়।"[২৬]

রাজবংশী কুলপ্রদীপ গ্রন্থটির প্রকাশনার পর পরই এই ধরণের প্রশংসাসূচক অসংখ্য চিঠি হরকিশোর অধিকারীর কাছে পৌঁছেছিল। রংপুর, গোয়ালপাড়া, দিনাজপুর, মালদহ, প্রভৃতি স্থানের রাজবংশী স্কুল শিক্ষক, ছাত্র, উকিল ও সমাজ সম্বন্ধে আগ্রহী ব্যক্তিগণ হরকিশোর বাবুর এই পুস্তকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিলেন। ১৯০১ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রাজবংশী দের স্বজাতি সম্মেলন ও ব্রাত্যত্বমোচন মূলক আলোচনাসভা *রাজবংশী কুলপ্রদীপকে* প্রামান্য হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এখানে আমরা আরো কয়েকটি চিঠির মূল বক্তব্য তুলে ধরছি। শ্রীপঞ্চানন সরকার (উকিল, রংপুর, পরবর্তীকালে রায়বা হাদুর ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা), রংপুর থেকে শ্রীহরকিশোর অধিকারীকে লেখেন-

"আপনার রাজবংশী কুলপ্রদীপ পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আপনাকে শতশত সাধুবাদ দিয়াছি..... আপনার মত ৫/৭টি লোক উদ্যমশীলতা দেখাইলে রাজবংশী সমাজ সত্বরই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।.....আপনার রাজবংশী কুলপ্রদীপ সর্বত্র প্রচলন দরকার।"[২৭]

মালদহ জেলার সিংহাবাদ থেকে শ্রীপ্যারিলাল সরকার রাজবংশী সমাজ জাগরণে রাজবংশী কুলপ্রদীপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখেছেন-

"আপনার প্রণীত কুলপ্রদীপ পাঠে পরম প্রীত হইলাম। আমিও রাজবংশী , আমার স্বজাতির উন্নতির অভিপ্রায় ও অনুরাগ নিয়ত অন্তরে নিহিত । কিন্তু দৈন্যতাবশতঃ

তাহার কিছু করিতে পারি নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে জাতীয় সভা সংস্থাপন করিয়া বক্তৃতা দ্বারা কতক সভ্যকে পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু কোন মূদ্রিত পুস্তক না থাকায় অপরাপর জাতির নিকট মুখ বাড়াইয়া বলিবার কিছু ছিল না। এক্ষণে আপনার পুস্তক খানির সাহায্য প্রভূত উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।"[২৮]

প্রায় অনুরূপভাবে রাজবংশী সমাজ জাগরণে কুলপ্রদীপের ভূমিকার আভাষ পাওয়া যায় রংপুরের চিন্তাময়ী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস এর চিঠি থেকে। তিনি লিখেছেন-

আপনার রাজবংশী কুলপ্রদীপ পড়িয়া যারপর নাই উপকৃত হইয়াছি। স্বজাতি সম্বন্ধে আপনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থক হইয়াছে। আপনার রাজবংশী কুলপ্রদীপ আমাদের চিরকালের মনের অন্ধকার দূরীভূত করিয়াছে। ..বাস্তবিক আপনি রাজবংশী কুলপ্রদীপ আমাদের মতে তিন উপায়ে রাজবংশী জাতির কিছু উন্নতি সম্ভব; (১) জাতি কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা, (২) জাতীয় পত্রিকা প্রচার, (৩) বিভিন্ন জেলায় বিবাহ বন্ধন।[২৯]

দিনাজপুরের বড়বন্দরের শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের চিঠির বক্তব্য ও প্রায় সমগোত্রীয় –

"ভগবান অনুকম্পায় আপনার রাজবংশী কুলপ্রদীপ হইতে দীর্ঘদিনের সুপ্ত ক্ষত্রিয়কুল এতদিনে জাগিয়া উঠিয়াছে। রাজবংশী কূলপ্রদীপ ক্ষত্রিয় সমাজের গৌরবের স্থল। .... ধন্য আপনি ক্ষত্রিয়কুল উদ্ধারকারী মহাপুরুষ"।[৩০]

গোয়ালপাড়া জেলার ধলাগ্রামের ভগবত সমাজ রাজবংশী কুলপ্রদীপকে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় ভবানার অনুপ্রেরনাকারী হিসাবে বর্ণনা করেছিল।[৩১]

পূর্ববর্তী অংশে আলোচিত চিঠিগুলির মূল বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে রাজবংশী কুলপ্রদীপ পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজবংশীগণের ক্ষত্রিয় চেতনার পথ প্রদর্শকের মর্যাদা লাভ করেছিল। রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া ও গোয়ালপাড়ার রাজবংশীগণ স্থানীয়ভাবে রাজবংশী ক্ষত্রিয় ভাবনার যে প্রয়াস করেছিলেন সেগুলি ক্রমশ বৃহৎ আকার ধারণ করছিল। এক্ষেত্রে রংপুর হয়ে উঠছিল রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। হরকিশোর অধিকারীর মত রংপুরে ক্ষত্রিয় ভাবনায় অতিরিক্ত শক্তির যোগান দিয়েছিলেন (কালীগঞ্জ থানার বেজগ্রাম নিবাসী) শ্রীজগন্মোহন সিংহ পণ্ডিত। তার রচিত *"ক্ষত্রিয় রাজবংশী কুল কৌমুদী"* (আ ১৩১৯) রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাগরণের সহায়ক হয়েছিল। একই সঙ্গে দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত মনিরাম কাব্যভূষণের *"রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক" (১৩১৮)* ও *"পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলদীপনা" (১৩১৯)* রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার তাত্ত্বিক গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।[৩২]

রংপুর থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গজননী' সাপ্তাহিক পত্রিকা হয়ে উঠে ছিল রাজবংশী সমাজের মুখপত্র (সম্পাদক শশিমোহন চৌধুরী, প্রকাশকাল: ১৩১২ থেকে)। এরকম পরিস্থিতিতে রংপুরে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীপঞ্চানন সরকার। পেশায় উকিল পঞ্চানন সরকার উপলব্ধি করেন যে রাজবংশী সমাজের বৃহৎ সংগঠন ব্যতীত তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন কখনই শক্তিশালী আকার ধারণ করবে না। পঞ্চাননের সু যোগ্য নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গ ও আসামের রাজবংশীগণ রংপুরে রাজবংশীদের বৃহৎ সম্মেলনে মিলিত হন ১৯১০ সালের মে

মাসে (১৮-২০ বৈশাখ, ১৩১৭)। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রীপঞ্চানন সরকার শ্রীহরকিশোর অধিকারীকে লিখেছিলেন-

> ১৮ই বৈশাখ রংপুরে আমাদের স্বজাতি সম্মিলনি বসিবে। আপনার নিকট নিমন্ত্রন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। দয়া করিয়া উক্ত তারিখে উপস্থিত হইবেন। সঙ্গে কতগুলি রাজবংশী কুলপ্রদীপ আনিবেন। পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা আসিবেন। প্রচারের পক্ষে সুবিধা হইবে।[৩৩]

১৩১৭ র ঐ সম্মেলনে রাজবংশী কুলপ্রদীপ রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রামান্য পুস্তক হিসাবে বিবেচিত হয়।

৩.৩. সংগঠন ও সামাজিক আন্দোলন

১৯১০ থেকে রাজবংশীদের মধ্যে জাগরিত ‘ ক্ষত্রিয় ভাবনা’ নতুন মাত্রা পেতে শুরু করে বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। *“রাজবংশী কুলপ্রদীপ”* এর তাত্ত্বিক ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ১৯০১ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে আরো কয়েকটি কারণে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে সংগঠন তৈরীর প্রবণতা তৈরী হয়েছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে “ রাজবংশী” ও “কোচ” জাতিকে অভিন্ন হিসাবে বর্ণনা করায় রংপুরের রাজবংশীগণ প্রতিবাদ করে বিফল হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ বছরেই রংপুরের রাজবংশী শিক্ষিত সমাজ পেয়েছিল তার উপযুক্ত নেতাকে যার নাম শ্রীপঞ্চানন সরকার যিনি পরবর্তীকালে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা হিসাবে সমধিক পরিচিতি পেয়েছিলেন।

শ্রীপঞ্চানন সরকার ছিলেন রাজবংশী সমাজের প্রথম উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি (M.A. B.L.) যার জন্ম হয়েছিল কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা মহকুমার খলিসামারি গ্রামে। রাজন্য শাসিত কোচবিহার থেকে বিতাড়িত হয়ে পঞ্চানন রংপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন ।[৩৪]পঞ্চানন বর্মার সুযোগ্য শিষ্য ও জীবনীকার উপেন্দ্রনাথ বর্মনের ভাষায়--

'যুবকের কর্মশক্তি, উদ্যম, সংগঠন শৈলী, দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা লইয়া তিনি ক্ষাত্র আন্দোলনে যোগদান করেন। তাহাকে পাইয়া ক্ষাত্র আন্দোলনের পূর্বসুরীরা সাগ্রহে তাঁহাকে আন্দোলনের নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইলেন। উপযুক্ত নেতা পাইয়া বিপুল উদ্যম ও উৎসাহে আন্দোলন দানা বাধিয়া চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল।'[৩৫]

পঞ্চাননের রংপুরে আশ্রয় গ্রহণ করার পরই ঐ অঞ্চলের রাজবংশীগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় প্রমান করার কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন (১) ক্ষত্রিয়সুলভ সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ (২)ক্ষত্রিয়সুলভ উপাধি গ্রহণ ও (৩)ক্ষত্রিয়দের মতো উপবীত গ্রহণ, ইত্যাদি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মনের ভাষায় বলা যায়--

"ক্ষাত্র আন্দোলনের তৃতীয় পর্য্যায়ে সমগ্র সমাজে সাড়া পড়িল। ইতিপূর্বে সাধারণতঃ ত্রিংশ দিবসেই অশৌচ মোচন ব্যবস্থা ছিল তবে , বহুক্ষেত্রে দ্বাদশাহেও অশৌচান্ত ব্যবস্থা পালিত হইতেছিল। এক্ষণে দ্বাদশাহে অশৌচান্ত ব্যাপ্তি লাভ করিতে লাগিল বিশেষ করিয়া মাথাভাঙ্গা ও ডিমলা অঞ্চলে। ঝাড়সিংহেশ্বর নিবাসী শ্রীশ্রীকান্ত অধিকারী বৃষোৎসর্গ মাতৃশ্রাদ্ধ মহাসমারোহে দ্বাদশাহে সম্পন্ন করিলেন। 'দাস' পদবী বর্জন করিয়া সিংহ , রায়, বর্মন প্রভৃতি ক্ষাত্র পদবী গৃহীত হইতে

লাগিল। উপবীত গ্রহণ আন্দোলন প্রবল হইল এবং মেখলীগঞ্জ থানার শ্রীযশোরথ অধিকারী প্রমুখ অনেকেই উপবীত গ্রহণ ক রিলেন। কালীগঞ্জ ন ওদাবাস নিবাসী অশতীপর বৃদ্ধ শ্রীগগন চন্দ্র সিংহ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রমান ও ব্যবস্থা পত্র সংগ্রহ চলিতে লাগিল।"[৩৬]

রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের সামাজিক ভাবধারাকে আরোও শক্তিশালী করার জন্য পঞ্চান ন সরকার তার সহযোগী বিশেষত শ্রীভোলানাথ সরকার (কালীগঞ্জ, রংপুর), কামিনীকুমার সরকার (ডিমলা, রংপুর), নবীনচন্দ্র সরকার (গাইবান্ধা), গুরুপ্রসাদ সরকার (কালীগঞ্জ), শ্রীহরিমোহন সরকার (কুড়িগ্রাম), নারায়ন সরকার (কোচবিহার), উপেন্দ্রনাথ সরকার (কোচবিহার), মধুসূদন রায় (জলপাইগুড়ি), মনিরাম কাব্যভূষণ (জলপাইগুড়ি), শ্রীযুক্তগোবিন্দচন্দ্র পণ্ডিত (দিনাজপুর), যাদব চন্দ্র সরকার (বগুড়া), হরিসিংহ তালুকদার (ময়মনসিংহ), শ্রীচন্দ্রকিশোর সিংহ (নীলফামারী), শ্রীহরিকিশোর সরকার (শিমুলবাড়ি), শ্রীগোবিন্দ মোহন সরকার (কালীগঞ্জ), শ্রীপ্রসন্ন কুমার সরকার (কালীগঞ্জ) ; প্রমুখের সাহায্যে রং পুরে রাজবংশী মহাসম্মেলন করার মানসে ব্রতী হন।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৮-২০শে বৈশাখ রংপুরের (১৯১০ মে) নাট্যমন্দির প্রাঙ্গনে পঞ্চানন সরকারের নেতৃত্বে রাজবংশী দের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই রাজবংশীদের জাতি সভার নামকরণ করা হয় "ক্ষত্রিয় সমিতি' ।[৩৭] নামকরণের ক্ষেত্রে দুটো মতামত উপস্থাপিত হয়েছিল- "ক্ষত্রিয় সমিতি" ও "রাজ বংশ্য ক্ষত্রিয় সমিতি"। শেষ পর্যন্ত 'ক্ষত্রিয় সমিতি' নামটি গৃহীত হয়।[৩৮] এই সম্মেলনে ক্ষত্রিয় সমিতি মধুসূদন রায় ও গুরুপ্রসাদ

সরকারের সভাপতিত্বে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করে। এগুলি হল------ (১) সরকারের কাছে আর্জি জানান যে কোচ ও রাজবংশী দুইটি আলাদা জাতি;(২) রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন কু-রীতি ও কুসংস্কার দূর করে মঙ্গলজনক ও প্রানসঞ্চারী নিয়ম ও সংস্কার প্রবর্তন;(৩) শিক্ষা বিস্তার, ছাত্রাবাস স্থাপন, সংবাদপত্র প্রচলন; ও (৪) সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য ধনভাণ্ডার স্থাপন।

এই প্রস্তাবগুলির কোনটিই রাজবংশীদের সম্মান জনক জাতি-পরিচিতি নির্মানের বাইরে ছিল না। প্রথম প্রস্তাবটির দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা পরিচালিত আদম শুমারি সৃষ্ট পরিচিতি গ্রহণে রাজবংশীদের অনীহা প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের কাছে ‘রাজবং শী পরিচিতি’ কো চদের থেকে অনেক বেশী উন্নত। পরবর্তী প্রস্তাবগুলি ছিল মূল ত রাজবংশীদের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াস। তাই এই প্রস্তাবগুলির কোনটিই তথাকথিত ‘সংস্কার প্রক্রিয়ার’ বা ‘সংস্ক্রিয়ার’ (sanskritization process) সঙ্গে যুক্ত নয়। প্রথমটি হল সামাজিক প্রভেদের (Social difference)প্রশ্ন আর দ্বিতীয় অংশটি হল সামাজিক ঐক্য স্থাপনের (mobility for consolidation)প্রয়াস। এপ্রসঙ্গে আমরা ক্ষত্রিয় সমিতির প্রথম অধিবেশনে পঞ্চানন সরকারের দ্বারা প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ উল্লেখ করতে পারি। তার ভাষায়---

> “আমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন জন্য শিক্ষা আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমরা আমাদের ভালমন্দ সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পরের কথায় পরিচালিত হইয়া থাকি। শিক্ষার অভাবেই আমরা পরের তিরস্কারের ভাজন হইয়াছি। সুতরাং অপরে আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেছে, আমরা তাহার প্রতিরোধ করিতে সক্ষম

হইতেছি না। বিদ্যাশিক্ষা না করিলে সদ্ |গুণ লাভ করিতে ও সম্মান পাইতে সক্ষম হইব না। বিদ্যাশিক্ষার অভাবে অর্থোপার্জন ও অর্থরক্ষা আমাদের অসম্ভব হইবে।”[৪০]

পঞ্চানন বর্মা সহ অন্যান্য সমাজ সচেতন রাজবংশীগণ বিদ্যার্জনের প্রয়োজনীয়তাকে সমাজ আন্দোলনের অঙ্গনে নিয়ে আসেন। পঞ্চানন ক্ষত্রিয় সমিতির প্রথম অধিবেশনে বলেন----

“অর্থের আগম জন্য আমাদের বিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তব্য। কৃষি আমাদিগকে পালন করিতেছে, কৃষি আমরা ছাড়িব না। কিন্তু অন্য ব্যবসা দ্বারা ধনাগমের পন্থা সুগম করাও আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু শিক্ষার অভাবে আমরা ধনাগমের পথ দেখিতে পাইতেছি না। অথবা যদি কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছি, শিক্ষার অভাবে সামর্থ্যহীন আমরা ধনাগমের সেই পথ অবলম্বন করিতে পারিতেছি না।”[৪১]

শিক্ষালাভ করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে শিক্ষাকে ‘বাহন’ (Career) হিসাবে ব্যবহার করার জন্য রাজবংশীগণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারি চাকরি গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন শ্রীপঞ্চানন। এপ্রসঙ্গে পঞ্চানন বলেন—

“আমাদের মধ্যে শিক্ষিত লোক কম বটে; কিন্তু অভাব নাই। এফ. এ. পাশ করা, এণ্ট্রান্স পাশ করা অথবা তন্নিম্ন শিক্ষিত লোক অনেক আছে। কিন্তু প্রায় কেহই কোনরূপ উৎসাহ পাইতেছে না। .....শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সমাজ মুসলমান সমাজ অপেক্ষাও পশ্চাৎপদ। আমাদের প্রতি গভর্নমেন্টের অনুগ্রহ আকর্ষণ কর্তব্য। শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মুসলমানগণকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া

গভর্নমেণ্ট তাহাদিগের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ দেখাইতেছেন, আমাদের প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন জন্য গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন করা কর্ত্তব্য।”[৪২]

অর্থাৎ শিক্ষালাভের মাধ্যমে সরকারি চাকরি গ্রহণ করে রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রসঙ্গই তাদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়। সমাজ সংস্কারকে তারা সদর্থক পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চাননের মতে----

“সমাজ-সংস্কার অর্থ সমাজে যাহা মন্দ বা জীর্ণ হইয়াছে তাহা দূর করতঃ যাহা সমাজের উন্নতির উপযোগী, তদ্দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করা; সমাজে যে সকল অনিষ্টকর আচার বা নিয়ম প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা দূর করিয়া সমাজের হিতকর সাধু নিয়ম প্রবর্তন করতঃ সমাজের নতুন প্রাণ সঞ্চার ও সমাজের সৌষ্ঠব সাধন করা।”[৪১]

রাজবংশী সমাজের সদ্য জাগ্রত এই চেতনাবোধকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজবংশী নেতৃবর্গ তাদের সামাজিক পরিচিতিকে উদ্দীপকের মাত্রা দিয়েছিল। সম্মানজনক ক্ষত্রিয় পরিচিতির জন্য এবার তারা সরকারের মুখাপেক্ষী হলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সরকারের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে সরকারি সহযোগিতাকেই তারা ‘সম্মান অর্জনের’ রাস্তা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ঔপনিবেশিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের আশায় রংপুর, পূর্ণিয়া ও নিম্নআসামের রাজবংশীগণ তাদের ‘ক্ষত্রিয় জাতি’ হিসাবে স্বীকৃতি জানানোর আবেদন -নিবেদনের প্রয়াস পুনরায় জাগিয়ে তোলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ‘আবেদন-নিবেদন’ (Prayer and

Petition) এর নীতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী পর্যায়ের (১৮৮৫-১৯০৫) প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই নীতির দ্বারা ভারতীয় উচ্চবর্ণীয়/উচ্চবর্গীয় নেতৃবর্গ (সাবলটার্ন ঐতিহাসিকদের ভাষার Elite) ব্রিটিশ সরকারের কৃপাধন্য হয়ে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধে [৪৪] আদায়ে সচেষ্ট হয়। একইভাবে বাংলা ও উত্তরভারতের মুসলমানগণ মুস লিম লীগ (All India Muslim League) স্থাপন করে (১৯০৫) ব্রিটিশ সরকারের কৃপাধন্য হয়ে ১৯০৯ এ মর্লি-মিন্টো সংস্কার (Marley-Minto Reforms, 1909) এর দ্বারা পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর (Separate electorate) ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছি লেন। তাই উত্তরবাংলার সমাজ ও রাজনীতি সচেতন নিম্নবর্ণীয় জাতি হিসাবে রাজবংশীগণ তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিকে সরকারি ভাবে স্বীকার করে নিতে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পুনরায় বিনম্র আবেদন জানান।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম, পশ্চিমবাংলা ও কোচবিহার দেশীয় রাজ্য এই সবকটি প্রদেশই ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে সরকারিভাবে মেনে নেওয়া হয়। গোয়ালপাড়ার Deputy Commissioner রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসাবে নিবন্ধনের আদেশ দেন। ১৯১১র ১১ই জানুয়ারী অনুরূপ আদেশ জা রি করেন পূর্ণিয়ার জেলাশাসক । এমনকি কোচবিহার দেশীয় রাজ্যের Superintendent Mr. E.W Denith, রাজবংশী ও কোচদের আলাদাভাবে নিবন্ধিত করার আদেশ জারী করেন।[৪৫] ও সবশেষে O. Mally (Census Superintendent) লিখলেন-

The former request (of Kshatriya Status) was granted without hesitation as there is no doubt that at the present day irrespective of any question of

origin of the Rajbanshis and the Koch are separate caste. [৪৬] এই স্বীকৃতি রাজবংশীদের জাতি চেতনা ও সামাজিক আন্দোলনে অভূতপূর্ব সংবেদন সৃষ্টি করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববাংলার চণ্ডালগণ নমঃশূদ্র পরিচিতির সরকা রি স্বীকৃতি আদায় করেছিল। [৪৭]মালো, পৌণ্ড্র, প্রভৃতি জাতিগুলি ও ক্ষত্রিয় পরিচিতি আদায়ের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। [৪৮] ব্রিটিশ সরকার অতি গুরুত্বসহকারে এই আবেদনগুলিকে বিবেচনা করেছিল। প্রশ্ন হল ব্রিটিশ সরকার কেন 'রাজবংশী' ও নমঃশূদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিল? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল এই যে ১৯০৫ থেকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু অধ্যূষিত জাতীয় কংগ্রেসে ব্রিটিশ -বিরোধী চরমপন্থী মনোভাবের বিকাশ ব্রিটিশ সরকারকে মুসলমানসহ নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদেরকে সরকারের সমর্থক গোষ্ঠীতে পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'সামাজিক পরিচিতির' মতো এই সংবেদনশীল বিষয়ের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন নিম্নবর্ণীয়দেরকে সরকারমুখাপেক্ষী করতে অতিরিক্ত শক্তি যুগিয়েছিল।

তবে সরকারের কৃপাদৃষ্টি পেলেও উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের থেকে ক্ষত্রিয়ত্বের সমর্থন আদায় রাজবংশীদের পক্ষে সহজ ছিলনা। তাই সরকারের পর , রাজবংশীগণ তাদের দা বির সামাজিক বৈধতা অর্জনের জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন। পঞ্চানন বর্মা ও অন্যান্য রাজবংশী সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় তারা মিথিলা, কামরূপ, নবদ্বীপ ও কোচবিহারের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যানাথ শর্মা তর্কবাগীশসহ সংস্কৃত পণ্ডিতবর্গ [৪৯] নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন:

"পৌণ্ড্রদেশবাসী রাজবংশীগণ 'রাজবংশী' এই নামেই ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্ণীত এবং নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, রঙ্গপুর, কলিকাতা, কুচবিহার, বারাণসী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানবাসী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বহুতর প্রমাণ যুক্তি তর্ক অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া স্থিরীকৃত। আপস্তম্বোক্ত দ্বাদশবার্ষি কব্রতানুকল্প গোশতমূল্যদক্ষিণাসহ ৫৪০ কার্ষাপন দানরূপ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করণান্তর ইহাদের উপনয়ন সংস্কারে এবং বার দিন অশৌচ ব্যবহারে অধিকার হইবেই; এবং এখন ক্ষত্রিয়োচিত জীবিকার অভাবে বৈশ্যোচিত বৃত্তি কৃষিবৃত্তি অবলম্বনে তাহাদের জীবিকা নির্বাহে কোন দোষ নাই; ইহা বিদ্বানগণের পরামর্শ।"[৫০]

একইভাবে কামরূপ (বিশেষ করে নিম্ন আসাম) অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ অনুরূপ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছিলেন। এঁদের[৫১] মতে

"করতোয়া নদীর উভয় তীরবর্তী দেশবাসী রাজবংশী নামে প্রসিদ্ধ জাতি বিশেষের জনগণ কারণবশে সুচিরকাল পতিত সাবিত্রীক; ইহাদের ক্ষত্রিয় বংশ্যতাহেতু ইহারা আপস্তম্বোক্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতানুকল্প ধেনুমূল্য দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তৎপর উপনয়নাদি সংস্কারে অধিকারী হইতে পারে, ইহাই সুধীগণের পরামর্শ"[৫২]

কলকাতা ও আসামের পণ্ডিতগণের মতো মৈথিলী ব্রাহ্মণদের একটি দল রাজবংশীদের শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদনের মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জনের ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছিল।[৫৩]

এই ধরণের ব্যবস্থাপত্রগুলি নিয়ে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি তার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৩১৯ এর ১১ই জ্যৈষ্ঠ) শাস্ত্রীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসমক্ষে উপবীত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করে।[৫৪] তদনুযায়ী ১৩১৯ এর ২৭শে মাঘ (১৯১৩, ফেব্রুয়ারী) রাজবংশীদের ব্রাত্যত্যমোচনের দিন স্থিরিকৃত হয়। তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জের নিকট পেরলবাড়ি গ্রামে করতোয়া নদীর তীরবর্তী প্রান্তে রাজবংশীদের মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কামরূপীয় পণ্ডিত (অনন্তদেব গোস্বামী , বিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্ন , আদ্যান্ত ন্যায়পঞ্চানন, প্রমুখ), মৈথিলী পণ্ডিত(শ্রীমুক্তিনাথ শাস্ত্রীপঞ্চানন, শ্রীবিশ্বনাথ ঝাঁ, উমাচরণ ঝাঁ, বালমুকুন্দ ঝাঁ, প্রমুখ), ও নবদ্বীপের পণ্ডিত (কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ প্রেরিত রামগোপাল তর্কতীর্থ ও মোহন লাল গোস্বামী)বর্গের উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ ও আসামের রাজবংশীগণ উপবীত গ্রহন করার মাধ্যমে ব্রাত্যত্বমোচন করে নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৫]

সারণী ৩.১: রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির মহামিলন ক্ষেত্রসমুহের বিবরন।

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা/রাজ্য	প্রধান ক্ষেত্র
১	জলপাইগুড়ি	১.দেবীগঞ্জ মহামিলন ক্ষেত্র , ২.ভূটনীরঘাট (ফালাকাটা) , ৩.জটেশ্বর (ফালাকাটা), ৪.দেওগাঁও, ইত্যাদি।
২	দিনাজপুর	১.সুন্দরগঞ্জ, ২.বিবিগঞ্জ, ৩.কালুক্ষেত্র,৪. বীরগঞ্জ, ৫.ঠাকুরগাঁও ৬.মধুপুর, ৭.পার্বতীপুর, ইত্যাদি।
৩	রংপুর	১.তিস্তা , ২.ডিমলা , ৩.শিলঘুড়ি, ৪.কাকিনা, ৫.নাগেশ্বরী, ৬.সাদুল্যাপুর, ৭.তুষভাণ্ডার, ৮.কালীগঞ্জ, ইত্যাদি।
৪	কোচবিহার	১.ফুলবাড়ি, ২.মাথাভাঙ্গা, ৩.ভোগরামগুড়ি, ৪.গোসাঞ্জীরহাট, ৫.মেখলীগঞ্জ, ৬.ভেটাগুড়ি, ৭.গীতালদহ,৮.হলদীবাড়ি, ৯. তুফানগঞ্জ, ইত্যাদি।
৫	গোয়ালপাড়া	ভেলাকোবা।

তথ্যসুত্র: ক্ষত্রিয় সমিতি: *চতুর্থ সম্মীলনী কার্য্যবিবরণী (৭ই, ৮ই ও ৯ই আষাঢ়, ১৩২০) ও তৃতীয় বর্ষ বৃত্তবিবরণী* , (রংপুর, মনোহর বর্ম্মা, ১৩২০)।

রাজবংশীদের উপবীত গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হল। বাংলা ১৩১৯ এর চৈত্র মাস (১৯১২ এর ১৫ই এপ্রিল) পর্যন্ত উপবীত গ্রহণের জন্য ১৯২ টি স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ক্ষত্রিয় সমিতি। এগুলিতে মোট ২৫১টি মিলন ক্ষেত্রে মোট ১৮২১৫৪ জন রাজবংশী ব্রাত্যত্বমোচন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন।[৫৬] ক্ষত্রিয়ত্বের এই অনুষ্ঠানগুলি রাজবংশী সমাজকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করেছিল। ক্ষত্রিয় সমিতির নিজের ভাষায়--

> "মহামিলন ক্ষত্রিয়গণকে প্রানে প্রানে মিলাইয়া দিয়াছে; মনপ্রান এক করিয়া মহোৎসব ও মহানন্দ করিয়া তুলিয়াছে; স্বজাতীয় একতাসাধন করিয়া, সামাজিক গৌরবের সূচনা করিয়াছে। মিলন ক্ষেত্রগুলি সেই ভাবটি আরও প্রস্ফুটিত, উজ্জ্বল, দৃঢ়, সবল ও প্রবল প্রবাহ করিয়া তুলিয়াছে । ইষ্ট, কুটুম্ব, শত্রু, মিত্র, উদাসীন সকলে একত্র মিলিয়া উপবীত লইয়াছে।.....জাগরিত ক্ষত্রিয় তেজ আরও জাগিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে; সমাজের বিশুদ্ধি সাধন জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য সকলকে দৃঢ়সম্বন্ধ, দৃঢ়সংকল্প ও একপ্রাণ করিয়াছে।"[৫৭]

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় চেতনা রাজবংশীদের একটি একতাবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে। মিলন ক্ষেত্রে উপবীত গ্রহনের অনুষ্ঠানের ধারা পরবর্তী বৎসরগুলিতে একই ভাবে চলতে থাকে।

৩.৪.ক্ষত্রিয় আন্দোলন ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন

মিলন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই আমাদের গবেষণার প্রধান চরিত্র শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মনের (১৮৯৮-১৯৮৮) সঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সংযোগ ঘটে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার দেশীয়

রাজ্যের মাথাভাঙ্গা মহকুমার মাথাভাঙ্গা শহর সংলগ্ন গোপালপুর গ্রামের এক স্বচ্ছল রাজবংশী কৃষক পরিবারে জন্ম হয় উপেন্দ্রনাথ বর্মনের। বীরনারায়ণ বর্মন ও কামিনী সুন্দরী দেবীর পুত্র উপেন্দ্রনাথ বর্মন মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে পড়ার সময় রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসম্মেলনের খবর পান। ১৩১৯ সালে অনুষ্ঠিত ২৭শে মাঘের মিলন ক্ষেত্রের ধারা বজায় রেখে মাথাভাঙ্গার ভোগরামগুড়ি তালুকে ব্রাত্যত্বমোচন ও যজ্ঞোপবী ত ধারনের যে অনুষ্ঠান হয়েছিল (১৩১৯) তার সভাপতি ছিলেন উপেন্দ্রনাথের বাবা। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্রাবাস থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন উপেন্দ্রনাথ। তার ভাষায়--

> সন ১৩১৯ সাল। আমাদের বাড়ি হ'তে ২ মাইল দূরে সুটুঙ্গা নদীর উত্ত রা-বাগে (যেখানে নদী উত্তরবাহিনী হয়েছে) ভোগরামগুড়ি তালুকসহ পার্শ্ববর্তী তালুকের রাজবংশী সমাজ ব্রাত্যত্ব মোচন করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবে। আমি মাথাভাঙ্গা ইংরাজী স্কুলের ছাত্র। খবর পেয়ে সকাল বেলা সেখানে গেলাম। এই বিরাট অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করার জন্য এক সমিতি গঠিত হয়েছে। বাবা তার সভাপতি। ...... চারদিকে মুণ্ডিত মস্তক উপবীত গ্রহণ করছে......এইভাবে প্রায় ৪/৫ হাজার ব্যক্তি উপনয়ন গ্রহণ করল। সেই উল্লসিত পবিত্র দৃশ্য আজও যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে। ক্ষত্রিয় সমিতি সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রথম পরিচয়। এর নাম ভোগরামগুড়ি মিলন-ক্ষেত্র। সেখানেই জানিতে পারিলাম যে এই বৎসরই ২৭ শে মাঘ জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জে করতোয়া মহামিলন ক্ষেত্রে লক্ষাধিক রাজবংশী ক্ষত্রিয় উপবীত গ্রহণ করিয়াছে।[৫৮]

এই পর্যায়ের কয়েক বছর পর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলেন যখন পঞ্চানন বর্মার সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ তৈরী হয়। তার নিজের ভাষায়:

> "আমি কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে বি.এ . শ্রেণীতে পড়ি।... সংবাদ পেলাম যে রায়চেঙ্গা তালুকে এক বিরাট ক্ষত্রিয়সভায় পঞ্চানন বর্মা ভাষণ দিবেন। ..... আরো কয়েকজনের সাথে সভা দেখিতে গেলাম এবং এক বিরাট ব্যক্তির সহিত পরিচিত হলাম। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দিয়া আমাকে আদেশ দিলেন-- 'উপেন এলা তুঞি ক'। যন্ত্রচালিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া প্রায় আধঘণ্টা তাঁরই বক্তৃতার রেশ ধরে কিছু বলিয়া ক্ষান্ত হলাম। এই সর্বপ্রথম ঠাকুরের সাথে পরিচয় এবং সাধারণ সভাতেও প্রথম ভাষণ। তাই ঠাকুর পঞ্চাননই আমার প্রথম দীক্ষা দিলেন সেদিন ক্ষাত্রত্ব সম্বন্ধে ভাষণ দিবার।"[৫৯]

এরপর থেকে উপেন্দ্রনাথ ক্ষত্রিয় সমি তির কার্যাবলির সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন ও হয়ে উঠ ছিলেন পঞ্চানন বর্মার সুযোগ্য শিষ্য। এপ্রসঙ্গে ব্রাত্যত্বমোচন ব্যতীত ক্ষত্রিয় সমি তির আরও কয়েকটি কার্য্যাবলীর কথা আলোচনা করা যেতে পারে যেখানে উপেন্দ্রনাথ বর্মন সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

প্রথমটি হল রাজবংশী দের ক্ষত্রিয়ত্ব-চেতনার বাস্তব প্রয়োগ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হিসাবে ক্ষত্রিয়দের জাতিগত পেশা (যুদ্ধ) গ্রহণ। উত্তরবঙ্গ ও আসামের রাজবংশীদের কাছে এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল তাদের উপবীত গ্রহণের (১৯১৩) পরের বছর যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-

১৯১৮) শুরু হল। প্রথম দিকে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতে অতিরিক্ত সৈন্যের চাহিদা না থাকলেও যুদ্ধ যতই গভীর হয়েছে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সৈন্য যোগানের চাহিদা। পঞ্চানন বর্মা রাজবংশীদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানালেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) *বেঙ্গলী* পত্রিকায় লিখলেন (১৭.০৯.১৯১৬)—

> প্রথম মহাযুদ্ধে সে সুযোগ এসে গেল, যাঁদের প্রচেষ্টায় এই সুযোগ এসেছে তাদের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ সমিতির সম্পাদক ডাক্তার শরৎ কুমার মল্লিক, পঞ্চানন বর্মা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।[৬০]

পঞ্চানন বর্মার প্রচেষ্টা অবশেষে সফলতা অর্জন করল ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯১৭ র ৬ই এপ্রিল মোনাহন সাহেব (Commissioner of the Presidency Division) পঞ্চানন বর্মাকে লিখলেন-

> “A separate company composed Rajbansis (Kshatriyas) of the upper and middle classes might be formed if suitable candidates are available.” [৬১]

ক্ষত্রিয় সমিতি প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের এই আশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছিল। রাজবংশী যুবকদের ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজেদের প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে প্রমান করার আহ্বান জানিয়েছিল ক্ষত্রিয় সমিতি। ক্ষত্রিয় সমিতির ভাষায়---

"ক্ষত্রিয়গণের প্রতি প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইতে, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ভাবে ভরপুর হইতে, প্রকৃত ক্ষত্রিয়তেজে উদ্দীপ্ত হইতে, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের কাজে লাগিতে সৈন্যদলে ভর্তি......চিরহিতৈষী অনারেবল মিষ্টার এফ. জে. মোনাহন মহোদয়ের ....ডাক ক্ষত্রিয় সমাজ পাইতেছিল। সেই ডাক সমাজের সর্বত্র প্রচার করা হইল। সমাজে নতুন ভাব, নতুন তেজঃ , নতুন তেজোভাবের ক্রিয়া উন্মেষ পাইতে লাগিল।....... ক্ষত্রিয় যুবকগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়তেজে উদ্দীপিত হইয়া ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম .... যুদ্ধ বিষয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিল। স্বধর্ম সাধন করিতে....প্রবল প্রান লইয়া রাজার কাজে, দেশের কাজে যুদ্ধার্থ যাইতে আরাম্ভ করিল।"[৬২]

ক্ষত্রিয় সমিতির তত্ত্বাবধানে রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও ধুবরী (গোয়ালপাড়া) থেকে রাজবংশী যুবকগণ ব্রিটিশ -ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আরাম্ভ করল। রংপুর, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর থেকে ৪০০ ও আসাম থেকে ৮০০ রাজবংশী যুবক কয়েকদিনের মধ্যে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের নিয়মানুবর্তিতা ও সাহসিকতা ব্রিটিশ সামরিক প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। Captain O' Dolder (করাচীর কমাণ্ডিং অফিসার) এক চিঠিতে পঞ্চানন বর্মাকে লেখেন—

"I understand that men of this community have turned out better soldiers than most of the others and it would be as well to recruit as large number of them as possible. It will also help recruitment if all of the men of this community can be formed

into a separate company to be known as the Kshatriya Company."[৬৩]

প্রশংসাসূচক মন্তব্য রাজবংশীদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের প্রক্রিয়াকে আরো উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু ১৯১৮ র শেষদিকে বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাওয়ায় পৃথক ক্ষত্রিয় কোম্পানী আর সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পঞ্চানন বর্মাসহ অন্যান্য রাজবংশী সমাজ চিন্তকগণ রাজবংশীদের জন্য পৃথক রেজিমেণ্ট গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ১৯২০ সালে ধুবরীতে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয় সমিতির একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে 'ক্ষত্রিয় বাহিনীর' প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেন—

"ভগবৎকৃপায় সমাজে প্রকৃত ক্ষাত্রভাব জাগিতেছে। অন্তরস্থিত প্রকৃত ক্ষাত্রভাব চেতনা পাইতেছে। জাগরণ ফুটিয়া উঠিতেছে। গত ঘোর মহাযুদ্ধকালে নরেশের ডাকে ভবেশের ডাক অন্তরে বুঝিয়া ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম ভাবিয়া নিজ উৎসাহভরে যুদ্ধে চলিয়া গেল; যুদ্ধে রাজকার্য্য সাধনে প্রাণপাতকে ধন্যতার আস্পদ গনিল। .....ভগবৎকৃপায় উন্মেষপ্রাপ্ত ক্ষাত্রভাব রাজকার্য্য তৎপ রতা প্রভৃতি গুণের পরিবর্ধন ও পরিপোষণ জন্য সমাজের ও দেশের মঙ্গল জন্য ক্ষত্রিয়গণের নিজের একটি সৈন্যদল গঠন একান্ত আবশ্যকীয়। ক্ষত্রিয়গণের নিজের একটি সৈন্যদল গঠন করিতে পারিলে, উক্ত গু ণগুলির পরিবর্ধন ও পরিপোষণ তথা ক্ষত্রিয়গণের ক্ষাত্র প্রতিষ্ঠার উদ্ধারসাধন হইবে। তজ্জন্য একটি ক্ষাত্র সৈন্যদল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে।"[৬৪]

পৃথক 'ক্ষত্রিয় সৈন্যদল' গঠন সম্ভব না হলেও ১৯২২ সালে ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের 'Indian Territorial Force' এ রাজবংশীদের নিয়োগের সুযোগ উপস্থিত হয়। পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী যুবকদের এই সুযোগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের জাতিভিত্তিক সেনা সংগ্রহ ও রাজবংশী যুবকদের Indian Territorial Armyতে ভর্তিকরার এই পর্বে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল।

উপেন্দ্রনাথ বর্মন তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র। 'মেস বাড়িতে' অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে থাকতেন। পঞ্চানন বর্মার নির্দেশে আসাম ও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী যুবকদের Territorial Armyতে যোগ দেওয়ার তদারকির কাজ করতে শুরু করেন। তার নিজের ভাষায়—

> "আমি তখন 'ল' কলেজে পড়ি। রাজবংশী যুবকদের শিক্ষা শিবিরে ভর্তি করান সম্পর্কে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু Territorial Armyতে সেনা সংগ্রহ চলিতেছে।
>
> উত্তরবাংলা ও গোয়ালপাড়া হইতে ক্ষত্রিয় যুবকেরা কলিকাতা পৌঁছিলে ঠাকুরের (পঞ্চানন বর্মার) আদেশে ওদের একবেলা মেসে খাওয়াইয়া দুপুরে কমান্ড্যান্টের শিবিরে পৌঁছাইয়া নাম ভর্তি করাইতাম। কিছুদিন পরে ব্রিটিশ সরকার জাতিগত পরিচয়ে সৈন্য বিভাগের নাম করা বন্ধ করিয়া দিল। কাজেই রাজবংশী ক্ষত্রিয় ব্যাটালিয়ান হইয়া উঠিল না।"[৬৫]

পূর্বোক্ত বিবরণ থেকে আমাদের কাছে একথা স্পষ্টভাবে প্র তীয়মান যে উপবীত গ্রহণের সঙ্গে সেনাবাহিনীতে যোগদান রাজবংশী ক্ষত্রিয় আ ন্দোলনের সমান্তরাল পর্যায়ে পরিণত হয়েছিল। এর দ্বারা রাজবংশীগণ নিজেদের প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে প্রমান করার সুযোগ পেয়েছিলেন| অন্যদিকে একটি বিকল্প পেশা ও শিক্ষাবিস্তারের সহায়ক হয়েছিল। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেস ও মুস লিম লীগের যৌথ উ দ্যোগের (লক্ষ্ণৌ চুক্তি ১৯১৬) বিরো ধিতা করার বিরুদ্ধে রাজবংশীসহ অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির সহানুভূতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল।

৩.৫. ক্ষত্রিয়ত্বের বাইরে

উপবীত গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার বাইরে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সবচেয়ে ইতিবাচক ক্ষেত্রটি ছিল রাজবংশীদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ঘটানো। উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ও প্রতিবেশী মুসলমানদের মতো রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা র বীজ বপিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে। কোচবিহার দেশীয় রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় স্থাপিত উচ্চবিদ্যালয় ও কোচবিহার শহরের ভিক্টোরিয়া মহাবিদ্যালয় (১৮৮৮) এবং রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্থানের উচ্চবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রতি রাজবংশীদের আগ্রহ বাড়তে থাকে বিংশ শতকের সূচনা পর্বে। পঞ্চানন বর্মা (এম.এ .) সহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষিত রাজবংশীগণ (নীচে তালিকা দেওয়া হল) বিংশ শতকের গোড়া থেকেই রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধি আরো প্রখর হয় ক্ষত্রিয় সমিতি স্থাপনের পর।

সারণী ৩.২.: বিংশ শতকের প্রথম দশকে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত রাজবংশীদের একটি (সংক্ষিপ্ত) তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যক্তির নাম	শিক্ষাগত মান	কর্মস্থল
১	পঞ্চানন সরকার (বর্ম্মা)	এম. এ., বি.এল.	রংপুর
২	খড়্গানারায়ন সিংহ	বি.এল.	দিনহাটা
৩	মধুসূদন রায়	বি.এল.	জর্জকোর্ট, জলপাইগুড়ি
৪	মহিম চন্দ্র বর্মারায়	বি.এল.	নীলফামারী
৫	কালিকৃষ্ণ সিংহ	বি.এ.	স্কুল ডেপুটী ইন্সপেক্টর
৬	উপেন্দ্রনাথ বর্মা (সরকার)	বি.এ., বি.এল.	তুফানগঞ্জ

তথ্যসূত্র: *ক্ষত্রিয় সমিতির কার্য্যবিবরণী ,১৩১৭-১৩৩৪।*

শিক্ষার উন্নতির জন্য ক্ষত্রিয় সমিতি তার প্রতিটি অধিবেশনে গুরুত্ব আরোপ করেছিল। পঞ্চানন বর্মা উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজবংশীদের উচ্চশিক্ষার স্থানে ছাত্রাবাস থাকা অত্যন্ত জরুরী। কারণ যে যে স্থানে ছাত্রাবাস আছে সেগুলিতে রাজবংশী ছাত্ররা সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারত না। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিংশ শতকের প্রারম্ভে কোচবিহার ও রংপুরের ছাত্রাবাসগুলিতে রাজবংশী ছাত্রদের জাতপাতের অভিশাপ সহ্য করতে হতো। এখানে এরকম দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি। প্রথমটি হল রংপুরের। উপেন্দ্রনাথ বর্মন উল্লেখ করেছেন যে-

> "রংপুর নর্ম্মাল স্কুল বোর্ডিং এ কয়েকটি রাজবংশী ছাত্র থাকিত। একটি ছেলে একদিন রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া পাঁচককে জিজ্ঞাসা করিল রান্না হইয়াছে কিনা? অমনি ২/৩টি (উচ্চবর্ণীয়) ছেলে বলিয়া উঠিল যে এই ভাত তারা গ্রহণ করিবে না। অবশেষে গরুকে পাক করা ভাত খাওয়াইয়া নূতন ভাবে ভাত রান্না করিতে হয়। ছেলেরা আসিয়া উকিল পঞ্চাননকে সব জানাইল।"[৬৬]

অর্থাৎ রাজবংশী ছাত্ররা উচ্চবর্ণীয় ছাত্রদের দ্বারা সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হতো। এমনকি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসেও রাজবংশী ছাত্রদের জাতপাতের অপমান বয়ে বেড়াতে হতো। উপেন্দ্রনাথ বর্মন ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রাবাসের জাতপাতের অভিজ্ঞতার কথা তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।[৬৭]

ছাত্রাবাসের অভাব দূর করার জন্য পঞ্চানন রংপুরকে বেছে নেন। এ প্রসঙ্গে পঞ্চানন বর্মার সহযোগী রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা শ্রীক্ষেত্রনাথ সিংহ (১৮৯৩-১৯৪৩) উল্লেখ করেছেন যে---

> "বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হইলে ইংরেজী শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। গ্রামে থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। সমাজের লোক অধিকাংশই গরীব। অর্থাভাবে পুত্রকে শহরে পাঠাইয়া শিক্ষা দিতে অসমর্থ। যদিও বা দুই চারিজন অর্থশালী ব্যক্তি শহরের খরচ জোগাইতে সমর্থ কিন্তু শহরে ছাত্র থাকিবার কোন ব্যবস্থা নাই। কোন কোন স্কুলে বোর্ডিং আছে বটে কিন্তু সেখানে ক্ষত্রিয় ছাত্র সম্মানের সহিত থাকিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সর্বত্র ঘৃণা ও অবহেলা। পঞ্চানন বর্মা উচ্চ শিক্ষার এই একটি বিশেষ অসুবিধা দেখিয়া তাহা দূর করিবার নিমিত্ত একটি ক্ষত্রিয় ছাত্রাবাস স্থাপনের মনস্থ করেন।"[৬৮]

ছাত্রাবাস স্থাপনের জন্য পঞ্চানন বর্মার উদ্যোগকে সাদরে স্বাগত জানিয়েছিল ক্ষত্রিয় সমিতি। ক্ষত্রিয় সমিতির প্রথম অধিবেশনে তাই বলা হয়েছে---

"আমাদের ছেলে পিলের উচ্চশিক্ষার প্রধান অসুবিধা আমাদের স্বজা তীয় ছাত্রদিগের থাকিবার স্থলের অভাব। ছাত্রদের এই অভাব এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমাদের স্বজাতি গৌরব আমাদের স্বজাতির রত্নস্বরূপ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয় রংপুর জেলার উপর 'ক্ষাত্র ছাত্রনিবাস ' নামক একটি বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস প্রস্তুত করিবার জন্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি বহুশ্রম ও কষ্ট স্বীকার পূর্বক গভর্নমেণ্ট বাহাদুরের নিকট দরবার করিয়া সেই "ক্ষাত্র ছাত্রাবাস " নামক বোর্ডিং টী করার হুকুম বাহির করিয়াছেন। তজ্জন্য গভর্নমেণ্ট বাহাদুর ১৪০০০ টাকা ব্যয় নির্দিষ্ট করিয়া ৯০০০ টাকা গভর্নমেণ্ট বাহাদুর দিবার এবং অবশিষ্ট ৫০০০ টাকা আমাদের চাঁদা করিয়া দিবার হুকুম দিয়াছেন।"[৬৯]

১৯১১ সালে পঞ্চানন বর্মার উদ্দ্যোগে ছাত্রাবাস স্থাপনের জন্য মোট ৪৯০০ টাকা সংগৃহীত হয় এবং সরকার ৯৮০০ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯১৩ সালে ৩২জন রাজবংশী ছাত্র নিয়ে রংপুর শহরে ক্ষাত্র ছাত্রাবাস তার যাত্রা শুরু করে। [৭০] ছাত্রাবাস তদারকি করার জন্য ব্রক্ষনারায়ন বর্ম্মা নামের এক শিক্ষিত রাজবংশী যুবককে জেলা স্কুলের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করে ক্ষাত্র ছাত্রাবাসের Superintendent হিসাবে রাখা হয়।[৭১]

শিক্ষা বিস্তারে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি তথা রাজবংশী ক্ষত্রিয় চেতনার ধারাবাহিক বাস্তবায়ন রাজবংশী জাতির আত্মচেতনার সদর্থক বহিঃপ্রকাশে সহায়তা করেছিল। এমনকি তারা নিজেদের উদ্দ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপনও শুরু করেছি লেন।[৭২] তাছাড়া ক্ষত্রিয় সমিতি গরীব

রাজবংশী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেছিল।[৭৩] সুদূর বিলেতে (England) রাজবংশী ছাত্রদের পড়াশোনায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থাও করেছিল ক্ষত্রিয় সমিতি। ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় ও রাশি বিজ্ঞান (Statistics) পড়ার জন্য যোগেন্দ্র চন্দ্র বর্মা সমিতির সাহায্য পেয়েছি লেন।[৭৪] শিক্ষা বিষয়ে রাজবংশীদের আকাঙ্খা ১৯২০ র দশকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনকে সামাজিক 'সংস্ক্রিয়ার' উর্ধে উঠতে সাহায্য করেছিল। জো রদার করেছিল রাজবংশী ছাত্রদের উন্নয়নের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সাংগঠনিক মাত্রা পেয়েছিল ১৯২৪ সালে 'ক্ষাত্র ছাত্র সম্মেলনের' আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে।[৭৫]

সারণী: ৩.৩. ক্ষত্রিয় আন্দোলনকালে রাজবংশীদের স্থাপিত কতিপয় বিদ্যালয়ের বিবরণ।

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান	বিদ্যালয়/ছাত্রাবাস	স্থাপনের বর্ষ/ স্থাপয়িতার নাম।
১	নাওতারা, টেপা, ডিমলা, রংপুর।	এম.ই.স্কুল ছাত্রবাস	১৩১৯ (১৯১২) , মহিমচন্দ্র বর্মা।
২	চোরতাবাড়ি, সুন্দরপুর, রংপুর	এম.ই.স্কুল	১৩১৯, হরিমোহন বর্মা
৩	ফুলবাড়ি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার।	এম.ই.স্কুল	১৩১৯ পদ্মনাথ বর্মা ও কান্তনারায়ন সিংহ।
৪	বৈরাগীরহাট, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি।	এম.ই.স্কুল	শুকুরচাঁদ বর্মা ও শান্তনারায়ণ বর্মা।

তথ্যসূত্রঃ ক্ষত্রিয় সমিতির প্রতিবেদন থেকে গৃহিত

রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের দ্বিতীয় সদর্থক দিকটি হল রাজবংশী নারীর আত্মমর্যাদার বিকাশ। এখানে দুধর নের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রথম ত, নারী হরন, ধর্ষণ ও অত্যাচারের

বিরুদ্ধে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতিকে জেগে উঠতে উ দ্দীপিত করেছিল ক্ষত্রিয় সমিতি।রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের আরেকটি সদর্থক পর্যায় ছিল রাজবংশী নারীর উন্নয়ন। নারীর সম্ভ্রম রক্ষা ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ক্ষত্রিয় সমিতির তীক্ষ্ণ নজর ছিল। দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে নারীকে রক্ষা করার জন্য ক্ষত্রিয় সমিতি তার ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলনে 'নারী রক্ষা সেবক দল' গঠন করে। [৭৬] ১৯২০ এর দশকে উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় নারীহরণ ও ধর্ষনের ঘটনা রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের ভাবনাকে উদ্দীপিত করেছিল। এক্ষেত্রে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল—(১) রাজবংশী যুবকদের মানসিকতায় ক্ষত্রিয়চেতনাকে জাগিয়ে তুলে নারীকে রক্ষা করা , (২) রাজবংশী নারীকে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও অস্ত্র তুলে নেওয়ার মতো মানসিকতার বিকাশ (Self -defence) ও (৩) অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করে পালন ও সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া (Rehabilitation)।

প্রথম পদক্ষেপটির ক্ষেত্রে পঞ্চানন বর্মা ও অন্যান্য রাজবংশী ক্ষত্রিয়গণ বেছে নিয়েছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির বার্ষিক সম্মেলনকে। এখানে ঘৃতকুমারী, ভেণ্ডী বর্মনী, কান্দুরী বর্মনী ও রাধাময়ী বর্মনীর মতো কয়েকজন রাজবংশী নারীর ধর্ষণের ঘটনা রাজবংশীদে র বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। ঊনবিংশ বার্ষিক সম্মেলনে (১৩৩৫বঙ্গাব্দ/১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ) এ নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গে উঠে আসে ঘৃতকুমা রী নাম্নী এক ধর্ষিতা রাজবংশী নারীর কথা। ক্ষত্রিয় সমিতির সম্পাদকের ভাষায়—

"আজিকালি একটি মাত্র কথাই যেন আর সকল কথাকেই তল করিয়া ফেলিয়াছে। যখন কোনও খবরের কাগজ পড়ি, দেখিতে পাই, গুণ্ডাকর্তৃক নারীহরণের সংবাদ !

গুণ্ডাগুলি প্রায় সকলেই মুসলমান। কিন্তু গুণ্ডার জাতি বা ধর্ম্ম কি? যাহারা গুণ্ডা,.... তাহাদের কোন ধর্মই নাই। তাহারা মনুষত্বের বৈরী, মানুষের বৈরী।

দূরের কথা ছাড়িয়া দিয়া এই রংপুরের কথা বলি। একটি নারী হরণের কথা বলিলেই নারীহরণের নিষ্ঠুর অত্যাচারের তীব্রতার মাত্রা কত, তাহা বুঝিতে পারিবেন। কেবল জিলা রংপুর, থানা পীরগঞ্জ, কাটাদুয়ার গ্রাম নিবা সিনী ঘৃতকুমারী বৈষ্ণবীর কথা বলিব। ঘৃতকুমারীর স্বামী শব্দরাম বৈরাগী ও ভাতিজী বুচী কাটাদুয়ার গ্রামে বাস করিত। ইংরাজী ১৯২৩ বাং ১৩৩০ সালের ভাদ্র মাস। একদিন রাত্রিকালে সকলের নিদ্রার সময় ১০/১২ জন মুসলমান গুণ্ডা হটাৎ বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করে। গুণ্ডারা বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘৃতকুমারীকে নিয়া যায়। শব্দরাম বৈষ্ণবকে এমন মাইর গুণ্ডারা মারিল যে তাহার ফলে পাঁচদিনের মধ্যে সে মরিয়া গেল। .....গুণ্ডারা ঘৃতকুমারীকে উপর্যু পরি রিপুচরিতার্থ জন্য এত অত্যাচার করিল যে ঘৃতকুমারী শেষে চেতনা শূন্য হইয়া পড়িল ।..... তিন-চার মাস পড়ে ...কয়জন গুণ্ডার তিন চার বৎসর করিয়া ফাটক্| হইল।

কিন্তু শব্দরাম তাহার জীবন ফিরিয়া পাইল না। ঘৃতকুমারীও যে মান ও ধর্ম্ম হারাইল তাহা সে ফিরিয়া পাইল না। পুলিশও অত্যাচার হইতে কাহাকেও রক্ষা করিল না; বরঞ্চ দুষ্টকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিল।

সুতরাং সকলকে আত্মশক্তি অবলম্বন করিতে হইবে। আত্মশক্তি দ্বারা নারীর উপর অত্যাচার নিবারণ করিতে হইবে। নারীকেও দুষ্ট দমনে ও আত্মর ক্ষার্থে সমর্থা করিয়া তুলিতে হইবে।”[৭৭]

নারীকে এই দুরাবস্থার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পঞ্চানন লিখলেন “ডাংধারী মাও” নামের কবিতা গুচ্ছ। নারীর আত্মশক্তির স্ফুরণের জন্য নারীকে কল্পনা করলেন অস্ত্রধারিনী ও দুষ্টের দমনকারিনী হিসেবে। তিনি লিখলেন—

“চমকি উঠিল্ ডুকরন শুনি” ডাংধারী মোর মাও।
দিশা দুয়োর নাই, খালি কোল্লাহার, দ্যাখে সংসারের ভাও।।১।।
বাপ-ভাইয়ের ঘর, সোয়ামির কোলা, আর যেইটে নারী থাকে।
জোর করিয়া নুচ্চা গুণ্ডা, নিয়া যাইতেছে তাকে।।২।।
বেটা ছাওয়াগুলা জড়ো হঞা খালি, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করি চায়।
ডাংধরী মাও, কোর্দ্ধে হাকায়, গাইন ধরিয়া যায়।।৫।।”[৭৮]

অর্থাৎ পুরুষের যখন চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে তখন রাজবংশী নারী অস্ত্র হাতে দুর্বৃত্তদমনে এগিয়ে আসে। প্রসঙ্গ ত উল্লেখযোগ্য যে রাধাময়ী বর্ম্মনী নাম্নী একজন রাজবংশী নারী যেভাবে ফজর আলি নামের দস্যুকে শাস্তি দিয়েছিল তা ক্ষত্রিয় সমিতির আলোচ নায় প্রশংসার চোখে আলোচিত হয়েছে। তাকে প্রকৃত বীর নারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৭৯]

ক্ষত্রিয় সমিতি অপহৃতা নারীকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্যও কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উদ্ধারপ্রাপ্ত নারীর জন্য আশ্রয়ের

ব্যবস্থা।[৮০] পঞ্চানন বর্মা তার নারী বিষয়ক কর্মকান্ডের জন্য তৎকালীন ব ঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৩৩৭ সালে (১৯২৪) প্রবাসী পত্রিকায় সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন---

"সম্প্রতি আমাকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রংপুর শাখার বার্ষিক অধিবে শনে যাইতে হইয়াছিল। রংপুর পরিষদের নিজস্ব বাড়ি আছে।....... এই প্রতিষ্ঠানটির নিকটে শ্রীপঞ্চানন বর্মা মহাশয়ের পরিচালিত ক্ষত্রিয় ব্যাংক ও অন্য ক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠান আছে। স্বরাজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর আমি উহা দেখিতে যাই।

ইহার অন্যান্য কাজের মধ্যে নিগৃহীতা নারীদের উদ্ধার কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহা অপেক্ষা সন্তোষের বিষয় এই যে কয়েকটি ঘটনায় দুবৃত্তেরা অত্যাচারের উপক্রম করিতে যাইয়া কয়েকজন নারীর দ্বারা হত বা গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিল। বর্মা মহাশয়ের ক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠান, আদালতে এই বীরঙ্গনা অভিযুক্ত হইলে, তাহাদের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।"[৮১]

তাই বলা যায় যে নারীবিষয়ক সংস্কারে রাজবংশীগণ সমাজে তথাকথিত উচ্চবর্ণীয় সমাজ সংস্কারকদের অনুকরণের পরিবর্তে নারীর আত্মশক্তির বিকাশে নজর দিয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় প্রশংসা অর্জন করেছিল। সেটি হল রাজবংশী সমাজে "পণপ্রথা" (dowry system) প্রবেশ করতে না দেওয়া। ক্ষত্রিয় সমিতি তার পঞ্চম-ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে (১৩২১/১৯১৪) উচ্চবর্ণীয় সমাজে প্রচলিত পণপ্রথা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছে যে-

"আমাদের সমাজে বরপণ প্রথা ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু এই প্রথার সঞ্চারী ভাবটি বল্লালী সমাজ হইতে আমাদের সমাজের দিকে সঞ্চালিত হইবার উপক্রম দেখা যায়। বোধ হয় যেন, বল্লালী সমাজের বরপণ প্রথা রূপিনী বীভৎসকায়া দূষিত গন্ধা রাক্ষসীর গাত্র হইতে দুর্গন্ধ লইয়া ভাবপ্রবাহ আমাদের সমাজের দিকে আসিতে চাহিতেছে।

ভাই সামাজিকগণ.....একবার দেখভাই, কি ভীষণা রাক্ষসী ঐ বল্লালী সমাজে কি উল্লাসে তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে! ......ঐ দেখ কতই উল্লাসে কন্যাকর্তার হৃদয়ের রক্তভাণ্ডটি একতিলে চুষিয়া খাইতেছে!......ঐ শুন অশ্রুপূর্ণ রূদনমুখ কন্যাকর্তার কাতর মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদ। ঐ দেখ, কন্যার নিস্পীড়িত ভাই, ভগ্নী, মাতা, প্রভৃতি কুটুম্বগণ দীনমুখ, ছিন্নবাস......।"[৮২]

অর্থাৎ "পণপ্রথার" মত গর্হিত উচ্চবর্ণীয় সামাজিক প্রথা রাজবংশী সমাজে প্রবেশ করলে কি ধরণের সমস্যা তৈরী করতে পারে সে সম্পর্কে রাজবংশীদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।এই সাবধানবানীতে আরো স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে ক্ষত্রিয় সমিতির সপ্তম বার্ষিক সম্মেলনে (২২-২৩ শে জৈষ্ঠ্য, ১৩২৩ সাল/১৯১৬ ইং)। ক্ষত্রিয় সমিতির ভাষায়---

"বরপণপ্রথারূপা পাপপিশাচীর বিভৎস আক্রমণের আভাস পাওয়া যাইতেছে। বোধ হইতেছে, যেন এই বরপণ প্রথা......সমাজে ভীষণ কদাচারের, ভীষণ কলঙ্কের , ভীষণ অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে। ভাই সমাজ হিতৈষীগণ পূর্বাহ্নেই সাবধান হও;

....বরপণরূপা রাক্ষসীকে সমাজের ত্রিসীমানায়ও আসিতে দিও না। বল্লালী ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য সমাজের ন্যায় ক্ষত্রিয় সমাজকে ধ্বংসের মুখে যাইতে দিও না"।[৮৩]

স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে নারীর সম্মান রক্ষায় ও নারীকে পণপ্রথার হাত থেকে বাঁচাতে রাজবংশী সমাজে পণপ্রথা প্রবেশ করতে না দিতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন উচ্চবর্ণীয় সমাজের কুপ্রথাকে বর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তাই রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন কেবলমাত্র সংস্ক্রিয়ার (sanskritization)মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

ক্ষত্রিয় আন্দোলনের তৃতীয় সদর্থক দিকটি ছিল রাজবংশীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াস। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীগণ মূলত কৃষিজীবী। কৃষির বিকাশ, কৃষিকাজের আধুনিকীকরণ ও ঋণের ব্যবস্থা ক্ষত্রিয় সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এপ্রসঙ্গে ক্ষত্রিয় সমিতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল Cooperative Credit Society স্থাপনের উপর। ক্ষত্রিয় সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে (১৯১৩) গোয়ালপাড়া জিলার মহেন্দ্রনাথ বর্মা এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৮৪] পরবর্তী অধিবেশনেও Cooperative Credit Societyর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাধিকাচরণ বর্মা বলেন-

"আমাদের অনেকেই দরিদ্র। কেহ বা কোন মতে সংসার চালায়, হয়ত তিনি ঋণগ্রস্ত; সুদ অত্যন্ত অধিক; ঋণের জ্বালায় হৃদয় জর্জরিত। .....এই ঋণভার হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার উপায় চিন্তা আবশ্যক। গভর্নমেণ্ট প্রবর্তিত

‘Cooperative Credit Society ’ বা ঋণসমিতি এই ঋণভার নামাইবার প্রকৃষ্ট উপায়।”[৮৫]

এই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে পঞ্চানন বলেন---

“মহাজনের কবল হইতে দরিদ্র প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য.....সমশ্রেণীস্থ বা সমগ্রামস্থ দশ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া যথানিয়মে একটি ঋণসমিতি গঠন করিতে হইবে। তৎপর আবশ্যক পরিমান ঋন গভর্নমেণ্ট শতকারা বার্ষিক ৯% হারে জোটাইয়া দিবেন। ঋণ সমিতির মেম্বারগণ পৃথক ও মিলিতভাবে সমস্ত টাকার জন্য দায়ী। অথবা সকলে সকলের জন্য দায়ী। ঋণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে দরিদ্র সামাজিকগণ অল্পসুদে টাকা পাইবেন; এবং পরস্পর পরস্পরের জন্য চেষ্টা করিয়া কিরূপে কাজ করিতে হয়, তাহাও শিখিবেন”।[৮৬]

ঋণসমিতির স্থাপন ও আর্থিক উন্নয়নে তার ভূমিকা রাজবংশী কৃষিসমাজে কিছুটা স্বস্তি এনেছিল। তাছাড়া আধুনিক কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার ও আধুনিক কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির উপরও জোড় দিয়েছিল ক্ষত্রিয় সমিতি। [৮৭] আর্থিক উন্নয়নে ক্ষত্রিয় সমিতির ভূমিকা উন্নতরূপ ধারণ করেছিল ১৯২০ সালে রংপুরে ক্ষত্রিয় ব্যাংক স্থাপনের মধ্য দিয়ে। [৮৮] একটি ব্যাংক, অসংখ্য ঋণসমিতি ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতি ব্যবহার করার মধ্যদিয়ে ক্ষত্রিয় সমিতি রাজবংশী সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানসিকতা তৈরী করেছিল যা তাদের ক্ষত্রিয় ভাবনার উর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করেছিল।

৩.৬.পর্যবেক্ষণ

রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার   লক্ষ্যে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে এই আন্দোলন সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিল। এই সমস্ত পদক্ষেপের দ্বারা রাজবংশী সমাজ একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছিল।   আর এই ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সূত্র ধরেই রাজবংশীদের মধ্যে জাতি রাজনীতির সূচনা হয়েছিল যেখানে উপেন্দ্রনাথ বর্মন হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম রাজনীতিবিদ। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Nicholas B. Dirks: *Castes of Mind: Colonialism and Making of Modern India,* (New Delhi, Permanent Black, 2008), পৃ. ২০৭-২৭।

২. Hitesranjan Sanyal: *Social Mobility in Bengal,* (Calcutta, Papyrus, 1985), পৃ-পৃ, ৩৩-৬৪।

৩. Rup Kumar Barman: “State formation, Legitimacy and Cultural Change: A Study of the Koch Kingdom”, *The Nehu Journal, Vol. XII, No.1(January-June 2014)*, পৃ-পৃ. ১৭-৩৫.

৪. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত,* ৪র্থ সং, (জলপাইগুড়ি, শিবেন্দ্রনাথ রায়, ১৪০৮) পৃ. ৯।

৫. সূর্যখড়ি দৈবজ্ঞ: *দরং রাজবংশাবলী*, নবীন চন্দ্রশর্মা (স), (গুয়াহাটি, বানী প্রকাশ, ১৯৭৩); রিপুঞ্জয় দাস: *মহারাজ বংশাবলী*, নৃপেন্দ্রনাথ পাল (স), (কোচবিহার, ১৩৮৩) ; জয়নাথ মুন্সী: *রাজোপাখ্যান*, বিশ্বনাথদাস (স), (কলকাতা, মালা প্রকাশনী, ১৯৮৯)।

৬. রামচরণ ঠাকুর : *গুরুচরিত (শ্রীমন্তশংকরদেবের লীলাচরিত),* ১৮শ প্রকাশ, হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া(স), (গুয়াহাটি, দত্তবরুয়া পাবলিশিং কো : প্রা: লি:, ২০০১), শ্লোক, ৩৪৫৭, পৃ.৬৮৭

৭. Montgomery Martin: *History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, Vol. 3, Rangpur and Assam (1838),* reprint edition, (Delhi, Cosmo Publications, 1976), পৃ. ৫৪৫।

৮. B.H. Hodgson: *Essay on the Koch, Bodo and Tribes,* (Calcutta, Baptist Mission Press, 1847), পৃ. viii.

৯. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* পৃ.৯

১০. উপেন্দ্র নাথ বর্মন: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* ৪র্থ সংস্করণ, (জলপাইগুড়ি, বিজয় কুমার বর্মন, ১৪০১ সন), পৃ. ৫৫।

১১. *তদেব।*

১২. *তদেব।*

১৩. *তদেব,* পৃ. ৫৮

১৪. *তদেব।*

১৫. হরকিশোর অধিকারী : *রাজবংশী কুলপ্রদীপ,* প্রথম প্রকাশ, ১৩১৫ সন, শ্রীললিতনারায়ণ দেব(স), (গৌরীপুর, প্রান্তবাসী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৭৮), পৃ. ৩৬-৪৭।

১৬. *তদেব,* পৃ. ৪৮।

১৭. *তদেব,* পৃ. ৯৯।

১৮. *তদেব,* পৃ. ১০০।

১৯. *তদেব/*

২০. *তদেব।*

২১. *তদেব,* পৃ. ১০১।

২২. *তদেব,* পৃ. ১০৩।

২৩. বিংশ শতকের গোড়ায় বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন ছোট করার উদ্দ্যেশ্য নিয়ে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের যুক্তিতে বাংলা বিভাজনের পরিকল্পনা করা হয় । ১৯০৫ এর ১৯শে জুলাই তা সরকারি ভাবে ঘোষিত হয়। সৃষ্টি হয় 'পুর্ববঙ্গ ও আসাম' রাজ্যের। অন্যদিকে বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' আলাদা রাজ্যের স্বীকৃতি পায়। এই ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে জাতিয়তাবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পরে সর্বত্র। শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। তাই ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত রাজসাহী বিভাগের জেলাগুলি আসামের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

২৪. হরকিশোর অধিকারী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০৩।

২৫. *তদেব,* পৃ. ১০৪।

২৬. *তদেব,* পৃ. ১০৫।

২৭. *তদেব,* পৃ ১০৭-১০৮।

২৮. *তদেব/*

২৯. *তদেব,* পৃ. ১১৩।

৩০. *তদেব,* পৃ. ১১৬।

৩১. *তদেব,* পৃ. ১১৮।

৩২.উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* পৃ. ২।

৩৩. হরকিশোর অধিকারী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১৪।

৩৪. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* পৃ. ৮।

৩৫. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* পৃ. ৫৯।

৩৬. *তদেব,* পৃ.পৃ. ৫৯-৬০।

৩৭. ক্ষত্রিয় সমিতি: *ক্ষত্রিয় সমিতি কার্য্যবিবরণী, প্রথম বর্ষ,* (রঙপুর নাট্যমন্দির, ১৮ই বৈশাখ, ১৩১৯),পৃ-পৃ.১-২।

৩৮. *তদেব*।

৩৯. *তদেব*।

৪০. কুঞ্জবিহারী রায় (স) : *ক্ষত্রিয় সমিতি কার্য্যবিবরণী,* (জলপাইগুড়ি, পঞ্চানন স্মারক সমিতি, ১৩৮৯), পৃ-পৃ. ১৭-১৮।

৪১. *তদেব,* পৃ.১৮।

৪২. *তদেব,* পৃ. ১৯।

৪৩. *তদেব।*

৪৪. নরমপন্থী কংগ্রেসের প্রধান দাবিগুলি ছিল Indian Council এ ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি, Indian Civil Service এর বয়স বাড়ানো ও একই সঙ্গে ইংল্যান্ড ও ভারতে তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। এগুলির কোনটাই অতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।

৪৫. শিবেন্দ্র নারায়ন মণ্ডল : *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* , (গৌরীপুর, ইণ্ডিয়া প্রেস, ১৯৭২), পৃ. ২১।

৪৬. রূপ কুমার বর্মন : "জাতি পরিচিতি গঠন, উত্তরণ ও এলিট নেতৃত্ব", *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৮,* (কোলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রিভেট লিমিটেড, ২০০৪), পৃ. ২৮৭।

৪৭. Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namashudras of Bengal*, (Richmond, Surrey, Curzon Press, 1997),পৃ. ৮৪।

৪৮. Rup Kumar Barman: "From Pod to Poundra: A Study on the Poundra Kshatriya Movement for Social Justice 1891-1956", *Voice of Dalit, Vol 7 No. I (January- June 2014)*, পৃ-পৃ. ১২১-১৩৭।

৪৯. এই পন্ডিতগনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন---কামাখ্যানাথ শর্মা (সংস্কৃত কলেজ), গোবিন্দ চন্দ্র শর্মা (বড় বাজার, কলিকাতা), দক্ষিণাচরণ শর্মা (কলিকাতা, পণ্ডিতসভা সম্পাদক), দূর্গাচরণ শর্মা (পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ি), ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ (রাজবল্লভপাড়া, কলিকাতা), শ্রীপঞ্চানন দেবশর্মা (পটোলডাঙ্গা, কলিকাতা), অমৃতানন্দ শর্মা (কুমারটুলি, কলিকাতা)।

৫০. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* পৃ. ৬৯।

৫১. এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন----রাধানাথ দেবগোস্বামী (পকয়া সত্র), ভাগবতি দেবগোস্বামী (জাগরা সত্র), ব্রজনাথ দেব গোস্বামী, বাসুদেব শর্মা (জাগরা সত্র), চন্দ্রকান্ত বিদ্যালঙ্কার (কামরূপ), দূর্গানাথ শর্মা (ধর্ম্মপুর), গঙ্গারাম বিদ্যারত্ন (বড়ভীটা, প্রমুখ।

৫২. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* পৃ. ৭২।

৫৩. *তদেব,* পৃ. ৭২।

৫৪. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* পৃ. ১০।

৫৫. ক্ষত্রিয় সমিতি: *চতুর্থ সম্মীলনী ও কার্য্যবিবরণী ও তৃতীয় বর্ষ বৃত্তবিবরণী*, (রংপুর, মনোহর বর্ম্মা, ১৩২০), পৃ.৩৪; উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* পৃ-পৃ.৬৩-৬৪; উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* পৃ-পৃ.১৯-২১।

৫৬. ক্ষত্রিয় সমিতি: *চতুর্থ সম্মীলনী ও কার্য্যবিবরণী ও তৃতীয় বর্ষ বৃত্তবিবরণী* , (রংপুর, মনোহর বর্ম্মা, ১৩২০),পৃ. ৩৪।

৫৭. *তদেব*, পৃ. ৩৫।

৫৮. উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি*, (জলপাইগুড়ি, বিজয় চন্দ্র বর্মন, ১৩৯২), পৃ. ৪৭।

৫৯. *তদেব*, পৃ.পৃ. ৪৭-৪৮।

৬০. *তদেব*, পৃ.পৃ. ২৭১-২৭২।

৬১. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত*, পৃ. ২৯।

৬২. ক্ষত্রিয় সমিতি: *দশম সম্মিলনী (৩২শে জৈষ্ঠ্য ও ১লা আষাঢ় ও ২রা আষাঢ় , ১৩২৬) কার্য্যবিবরণী* , (রংপুর, শ্রীমনোহর বর্ম্মা, ১৯২০), পৃ.পৃ. ৭-৮।

৬৩. ক্ষত্রিয় সমিতি: *কার্য্য বিবরণী: দশম বার্ষিক অধিবেশন*, (রংপুর, ১৩২৬),পৃ. ১১; উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত*, পৃ. ৩২।

৬৪. ক্ষত্রিয় সমিতি: *একাদশ সম্মিলনী কার্য্যবিবরণী* , (রংপুর, শ্রীমনোহর বর্ম্মা, ১৩২৭), পৃ. ২১-২২।

৬৫. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত*, পৃ. ৪০।

৬৬. *তদেব*, পৃ. ১৩।

৬৭. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি*, পৃ.পৃ. ৪৩-৪৫।

৬৮. ক্ষেত্রনাথ সিংহ: *রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার জীবনী বা রঙ্গপুর ক্ষত্রিয় সমিতির ইতিহাস,* (রংপুর, নিত্যানন্দ বর্মা, ১৩৪৬), নৃপেন্দ্রনাথ পাল (স) :, (কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ.৫৬.

৬৯.ক্ষত্রিয় সমিতি: *কার্য্য বিবরণী: প্রথম বর্ষ ,* (রংপুর, ১৯১০), পৃ. ৩০।

৭০. ক্ষেত্রনাথ সিংহ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৭। ক্ষত্রিয় ছাত্রাবাসের আলোকচিত্র সংযোজনী অংশে দেওয়া হয়েছে (সংযোজনী ১ ও ২)।

৭১.*প্রাগুক্ত।*

৭২. ক্ষত্রিয় সমিতি: *চতুর্থ সম্মীলনী ও কার্য্যবিবরণী ও তৃতীয় বর্ষ বৃত্তবিবরণী* , (রংপুর, মনোহর বর্ম্মা, ১৩২০),পৃ. পৃ. ১১-১২।

৭৩. ক্ষত্রিয় সমিতি : *বার্ষিক সম্মিলনী (৪ঠা, ৫ই ও ৬ই আষাঢ়) ও ১৩২১ সালের বৃত্তবিবরন* (রংপুর, ১৩২২), পৃ. ৩৩।

৭৪. *তদেব,* পৃ. ৫২।

৭৫. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* পৃ. ৫৬।

৭৬. *তদেব,* পৃ. ৪২।

৭৭. ক্ষত্রিয় সমিতি: *ঊনবিংশ বার্ষিক সম্মিলন প্রতিবেদন,* (ভোটমারী হাইস্কুল প্রাঙ্গন, ১৫-১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৫), পৃ.পৃ. ৩২-৩৩।

৭৮. রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (স.) : *রায়সাহেব পঞ্চানন রচনাবলী,* (কোচবিহার, প্রতিমা কার্জী, ১৩৯৮),পৃ. ৩৫।

৭৯. ক্ষত্রিয় সমিতি: *ঊনবিংশ বার্ষিক সম্মিলন প্রতিবেদন,* (ভোটমারী হাইস্কুল প্রাঙ্গন, ১৫-১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৫), পৃ-পৃ. ৪১-৪৫।

৮০. *তদেব*।

৮১.*প্রবাসী, জৈষ্ঠ্য (১৩৩৭),* পৃ. ১১৪। রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (স.): *রায়সাহেব পঞ্চানন রচনাবলী,* (কোচবিহার, প্রতিমা কার্জী, ১৩৯৮), পৃ-পৃ ২৯-৩০ থেকে উদ্ধৃত।

৮২. ক্ষত্রিয় সমিতি: *কার্য্যবিবরণী, ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনী* , (৪ঠা, ৫ই ও ৬ই আষাঢ়, ১৩২২), পৃ. ৩৮।

৮৩. ক্ষত্রিয় সমিতি: *কার্য্যবিবরণী, সপ্তম বার্ষিক সম্মিলনী,* (রংপুর, ১৯১৬), পৃ. ৫৮-৫৯।

৮৪. ক্ষত্রিয় সমিতি: *চতুর্থ সম্মিলনী (সন ১৩২০) ও কার্য্যবিবরণী ও তৃতীয় বর্ষের বৃত্ত বিবরন* (রংপুর, মনোহর বর্মা , ১৩২০), পৃ. ১২।

৮৫. ক্ষত্রিয় সমিতি: *পঞ্চম বার্ষিক সম্মিলনী কার্য্যবিবরণী,* (রংপুর, ১৩২১), পৃ.১৭।

৮৬. *তদেব*, পৃ. ১৮।

৮৭. ক্ষত্রিয় সমিতি: *দশম সম্মিলনী কার্য্যবিবরণী,* (রংপুর, ১৩২৬) পৃ. ১৫।

৮৬. ক্ষেত্রনাথ সিংহ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯।

চতুর্থ অধ্যায়
জাতি থেকে জাতীয় রাজনীতি ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে ঔপ নিবিশক আমলে বাংলার তপ শিলি জাতির নেতৃবর্গ তাদের জাতি আন্দোলনের (Caste Movement) পরিসরে সমগ্র তপ শিলি সমাজকে জাতীয় আন্দোলনের বাইরে রেখেছি লেন।[১] কারণ এদের আত্মচেতনার সূত্রপাত হয়েছিল সামাজিক মর্যাদা অর্জনের সূত্র ধরে যা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সামাজিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯২০ ও ১৯৩০র দশকে তাদের সামাজিক চেতনা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের অস্ত্রে পরিণত হয়।[২] ১৯৩৬ এ গৃহীত *The Government of India (Scheduled Caste Order)* ও ১৯৩৫ এর *The Government of India Act 1935* অনুযায়ী বাংলার প্রাদেশিক আইনসভা (Bengal Legislative Assembly) ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের (Legislative Council) জন্য নির্বাচন -ব্যবস্থার সূত্রপাত বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিতে তপ শিলি জাতির জাতি-রাজনীতিকে (Caste Politics) প্রাসঙ্গিক করে তোলে। কিন্তু ১৯৪০ এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) জন্য সৃষ্ট ঔপ নিবেশিক শাসনের দুর্বলতা [৩] জাতীয় রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির টানাপোড়েন ও শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের[৪] বিভাজনের মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের নতুন দুটি জাতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি বাংলার জাতি-রাজনীতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে । স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশ

এমনকি বিশ্বের রাষ্ট্র বিভাজনের ইতিহাসে র (History of Partition) প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ পূর্ব ঔপনিবেশিক বাংলার সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক রাজনীতির অবস্থান বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। একই সঙ্গে প্রাদেশিক ও জাতীয় রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃ ত্বে যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী র (Caste/Ethnic Group) সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগকে নিজ নিজ স্বার্থে পরিচালিত করার পদক্ষেপগুলিও ঐতিহাসিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[৫]

বাংলার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলিতে ও মুসলমান সংরক্ষিত আসনে মুসলিম লীগের আধিপত্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল ১৯৪৬ এর বিধানসভার নির্বাচনে ।[৬] একইভাবে নিম্নবর্ণীয় তপশিলি জাতিগুলিকে জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিকভাবে করায়ত্ত করতে চেষ্টা করেছিল।[৭] ১৯৪৬ এর নির্বাচনে তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে প্রভূত সাফল্য (৩০টি আসনের মধ্যে ২৪টি)[৮] অর্জন করে বাংলার তপশিলি জাতিগুলিকে জাতীয় রাজনীতির ছত্রছায়ায় নিয়ে এসেছিল জাতীয় কংগ্রেস । ১৯৪৬ এর এই পরিবর্তন পর্বে উপেন্দ্রনাথ বর্মন জাতি-রাজনীতির (Caste Politics) ক্ষুদ্র গণ্ডি (Micro Space) থেকে জাতীয় রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে (Macro Space) নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতিকে জাতি-রাজনীতির উর্দ্ধে নিয়ে গিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহনে উৎসাহিত করেছিলেন তিনি। ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে উপেন্দ্রনাথ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।[৯] বর্তমান

অধ্যায়ে জাতীয় রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথ ও রাজবংশী জাতির অবস্থানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাতি রাজনীতির দুর্বলতা ও জাতীয় রাজনীতির আবেদনকে তপশিলি জাতিগুলি কিভাবে গ্রহণ করেছিল এই প্রশ্নেরও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

৪.১. জাতি রাজনীতির প্রেক্ষাপট

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা থেকে মনে করা হয় যে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়েছিল মূলত উনবিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে।[১০] এই জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি ছিল 'স্বদেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান',[১১] 'স্বদেশ প্রীতি'[১২] ও 'ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা'। এই পর্যায়গুলির চূড়ান্ত পরিণতি ও পরিবর্ত (Alternative) হিসাবে জাতির আত্মপ্রকাশ ও স্বাধীন ভারত রাষ্টের জন্ম প্রক্রিয়া সম্পুর্ণ হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিতে তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির অবস্থান বা অংশগ্রহণের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের ফিরে তাকাতে হবে ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্ন থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত। উক্ত সময়কালে ব্রিটিশ বিরোধী আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিবাদী হিসাবে যাদের অবস্থান লক্ষ করা যায় তাদের একটা বড় অংশই ছিলেন নিম্নবর্ণীয় জাতি (পরবর্তীকালের তপশিলি জাতি) ও উপজাতি (বর্তমানের তপশিলি উপজাতি) সম্প্রদায়ের মানুষ। অধ্যাপক রণজিৎ গুহ ও তার সহমতাবলম্বী ঐতিহাসিকগণ এদের Subaltern/Non-Elite/নিম্নবর্গীয় বলে বর্ণনা করেছেন।[১৩] নামকরণ নিয়ে বৈচিত্র্য যতই থাকুক না কেন এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে নিম্নবর্ণীয় জাতির মানুষেরাই (অন্তত বাংলার ক্ষেত্রে) ব্রিটিশ-বিরোধী ও তাদের সহযোগী-বিরোধী (জমিদার, রাজস্ব সংগ্রাহক, জোতদার, ইত্যাদি) আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন ১৭৭০ ও ১৭৮০র দশকের রংপুর

(১৭৮৩), সন্ন্যাসী ও ফকির আন্দোলনগুলির বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। [১৪] উত্তরবঙ্গের রংপুরের রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহগুলি সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী না হলেও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। উনবিংশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলিতেও (নীল বিদ্রোহ -১৮৫৯, পাবনা বিদ্রোহ -১৮৭৩, ইত্যাদি) বাংলার নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির ব্যাপক অংশগ্রহণ ল ক্ষ করা যায়। কিন্তু এই বিদ্রোহগুলিকে জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই ঊনবিংশ শতকের সাত দশক পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলার নিম্নবর্ণীয়দের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায় না।

কিন্তু ১৮৮০র দশক থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় ‘স্বদেশ ভাবনার’ পর্যায় শুরু হলে বাংলার শিক্ষিত নিম্নবর্ণীয়রা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চুপ ছিলেন একথা বলা যায় না। বরং উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের শিক্ষিত অংশ স্বদেশ ভাবনা দিয়েই তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চানন বর্মা ও উপেন্দ্রনাথ বর্মনের কথা বলা যায়। এরা উভয়েই ‘রাজনৈতিক চিন্তা’ শুরু করেছিলেন ‘স্বদেশ ভাবনা’ ও ‘স্বদেশ প্রীতির’ মধ্য দিয়ে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে স্থাপিত ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ’ রংপুর শাখার হাত ধরে পঞ্চানন বর্মার ‘রাজনৈতিক চেতনার’ বিকাশ শুরু হয়। এই শাখার সম্পাদক ছিলেন জমিদার সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী ও পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন পঞ্চানন সরকার (বর্মা)। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৩১৩ বঙ্গাব্দে লিখেছেন যে---

“ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে আজ দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আমাদিগের জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনে ব্রতী রহিয়াছেন।......পত্রিকাখানির

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, রংপুর শাখা) অর্ধাংশ প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, বিবিধ ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং প্রাচীন অপ্রকা শিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথির বিবরণাদিতে পূর্ণ থাকিবে। অপ রাংশে উত্তরবঙ্গের দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী গ্রন্থাকারে পরিচয় ও গ্রন্থ আলোচনা সহ পৃথক পৃথক পত্রাংক দ্বারা ক্র মশঃ মূদ্রিত হইবে।”[১৫]

তাই একথা বলতে বাধা নেই যে ‘স্বদেশ অনুসন্ধান’ ও ‘স্বদেশ চেতনা’ এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যার সম্পাদক ছিলেন পঞ্চানন। পঞ্চাননের সুযোগ্য সম্পাদনায় এই পত্রিকা তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছিল । এমনকি এই পত্রিকায় প্রকাশিত পঞ্চাননের রচনাগুলিতে [১৬] বহুত্বের মধ্যে একতা বিশে ষ করে ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’ (Communal Harmony) রক্ষা করে হিন্দু-মুসলমানের একতা রক্ষার বার্তাও স্পষ্ট ভাবে ধ্বনিত হয়েছিল।[১৭] মধ্যযুগের পদকর্তা মাধব বিবির পদ উল্লেখ করে পঞ্চানন সরকার তার *‘কামতা-বিহারি-সাহিত্য’* প্রবন্ধে লিখেছেন:

“পুর্ব্বে শুনিয়াছি আমি কেতাব কোরাণ।

এক নিরঞ্জন ফলে হয় তিন নাম।।

‘আল্লা, মহম্মদ, রছুল যারে কয়।

সত্ত্ব, রজ, তম গুণ তাহার আশ্রয়’।।

আল্লা মহম্মদ রছুল এই তিনের একীভাব নিরঞ্জন। ‘আল্লা’ এই নিরঞ্জনের গুণ ভেদ মাত্র। এই মীমাংসা সুখে গৃহীত হইয়াছিল কিনা জানি না; হিন্দু-মুসলমান বিবাদ মীমাংসার অন্যরূপ চেষ্টা দেখিতে পাই।”[১৮]

পঞ্চানন সরকারের এই ধরণের রচনাকে জাতীয়তাবাদী চেতনা বহিঃপ্রকাশ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে 'স্বদেশ প্রীতির উদাহরণ' হিসাবে পঞ্চানন বর্মার আরোও কয়েকটি রচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন—' *গোবিন্দ মিশ্রের গীতা'* নামক প্রবন্ধ [১৯] ও *'গোপী চন্দ্রের গান'*।[২০] ১৭০৮ সনে লিখিত গোবিন্দ মিশ্রের গীতার পুঁথি আবিষ্কার ও তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পঞ্চাননের এই প্রবন্ধ স্বদেশ অনুসন্ধানের পদবাচ্য। এপ্রসঙ্গে সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন:

> "ইহা একটি অভিনব আবিষ্কার। চারি টীকা মিলাইয়া মূল গীতার এরূপ সহজ ভাষায় কেহ পদ্যানুবাদ করিতে পারে নাই।.... যাহা হউক শাখা পরিষদের পরম সৌভাগ্য যে শ্রীযুক্ত পঞ্চাননবাবু আজ এই অশ্রুতপূর্ব গীতার আবিষ্কার করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।"[২১]

এই দৃষ্টিভঙ্গী মাথায় রাখলে পঞ্চাননকে স্বদেশ অনুসন্ধানের অন্যতম কাণ্ডারী বলা যেতে পারে।

ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয়তাবাদ বহিঃপ্রকাশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্যায়টি হল 'ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন' (Anti-British Movement)। এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল বিংশ শতকের গোড়ায় 'স্বদেশী আন্দোলন' (১৯০৫-১৯০৮) এর সময়। স্বদেশী চেতনা ও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রচার করার জন্য সৃষ্ট 'অনুশীলন সমিতির ' মতো বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির বিকাশে রাজবংশীরা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন ছিলেন না। বস্তুত উপেন্দ্রনাথ বর্মন তার ছাত্রজীবনের শুরুতে অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। তার নিজের ভাষায়:

“১৯১১ সালে আমি অনুশীলন সমিতির মেম্বার হই। পাটগ্রাম হ’তে যোগেন দত্ত এসে আমার সহপাঠী হইল। পূর্ব্বেতেই সে অনুশীলনের সভ্য ছিল। মাথাভাঙ্গায় এসে আমাকে বলল যে লেখাপড়ার সাথে শরীর চর্চা করে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা অতিশয় আবশ্যক। তার পরামর্শে আমিও Club এর মেম্বার হলাম । রাত ভোর হওয়ার ২ঘণ্টা পূর্ব্বে বোর্ডিং গৃহ হ’তে জানালার পথে বাহির হইয়া স্কুল বিল্ডিং এর কামরা খুলিয়া সেখানে ডাম্বেল, মুগুর, Chest expender লইয়া ব্যায়াম করিয়া আবার ভোরের আগেই বোর্ডিং এ ফিরে জানালার পথে কামরায় প্রবেশ করে শুয়ে পড়তাম। ক্রমে Clubএর অন্যান্য সাথীদের সাথে পরিচয় হইল। কিছুদিন পরে যোগেন আমাকে যুগান্তর ও বন্দেমাতরম পত্রিকা পড়তে ও নকল করিতে দিল এবং জানাইল যে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে না তাড়িয়ে দিলে এবং দেশকে স্বাধীন না করলে দেশের দুর্দশা ঘুচিবে না। ক্রমশঃ সখারাম, গণেশ দেউস করের বই, দেশের ডাক হইতে ভারতে ইংরেজ শাসন ও শোষনের বিস্তারিত আলোচনা, গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, স্বাধীনতার জন্য ক্ষুদিরাম, কানাই দত্ত, প্রভৃতির আত্মদানের কাহিনী আলোচনা হইতে লাগিল। যোগেন আমাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রত্যহ ভোরে এক অধ্যায় পাঠ করিতে উপদেশ দিল।”[২২]

উপরিউক্ত অংশে বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে উত্তরবাংলার রাজবংশীগণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন ছিলেন না। বরং তৎকালীন

সময়ের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ‘স্বদেশ ভাবনার’ বৈশিষ্ট্যের প্রতি নিজেদের নিয়োগ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ‘বর্ণ বিভক্ত’ বাংলার তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত জাতপাতের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজতে গিয়ে বাংলার অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির মতো রাজবংশীগণ ব্রিটিশ সরকারের কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় “বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের” পরিবর্তে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারকে অনেকক্ষেত্রে সমর্থন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে **১৯১০** খ্রিস্টাব্দে (১৮ই বৈশাখ, ১৩১৭) রংপুরে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি স্থাপনের সময় পঞ্চানন বর্মা তার ভাষণে বলেন---

> “মুসলমান সমাজ গভর্নমেন্টের কৃপা দৃষ্টি পাইয়াছেন। শিক্ষিত কোন ব্যক্তিই বিনা কাজে বসিয়া থাকে না। তাহাদের মধ্যে এ জন্য শিক্ষা বিষয়ে একান্ত আগ্রহ দেখা যাইতেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সমাজ মুসলমান সমাজ অপেক্ষাও পশ্চাৎপদ। আমাদের প্রতি গভর্নমেন্টের অনুগ্রহ আকর্ষণ কর্ত্তব্য। শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মুসলমানগণকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গভর্নমেণ্ট তাহাদিগের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ দেখাইতেছেন, আমাদের প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করা কর্ত্তব্য।”[২৩]

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি রাজবংশীদের এই মনোভাব পরবর্তী বছরগুলিতেও অব্যাহত ছিল। তাই ক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে----

> “ক্ষত্রিয়গণ সকলেই রাজভক্ত, রাজার সুশাসন ও পুণ্য সংকল্পই প্রজার সকল প্রকার উন্নতির মূল, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস সম্পন্ন। দিল্লী প্রবেশ সময়ে বড়লাট সাহেব

বাহাদুরের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়; তাহার আঘাতে তিনি কাতর; এই সংবাদটি সকলকে দুঃখিত করিয়াছিল। কিন্তু এতদিন দুঃখ প্রকাশ করিবার সুযোগ পাই নাই। আজি সকলে মিলিত সুযোগ পাইল। বড়লাট সাহেবের কাতর সংবাদে মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করত : বড়লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট তারযোগে সংবাদ প্রেরিত হইল।"[২৪]

ব্রিটিশদের ভারতীয় সরকারের প্রতি রাজবংশীদের আনুগত্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেদের শিক্ষার উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রাজবংশীদের মতো ঔপনিবেশিক বাংলার আরো দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণীয় জাতি যেমন পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্রগণ ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।[২৫] এমনকি পৌণ্ড্র ও রাজবংশীগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে (১৯১৪-১৮) ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান ও অর্থসরবরাহে সহযোগিতা করেছিলেন।

অন্যদিকে রাজবংশীসহ বাংলার অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় জাতির এই মনোভাবকে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কারণ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একযোগে ব্রিটিশ বিরোধী পদক্ষেপ (লক্ষ্ণৌ চুক্তি, ১৯১৬) ব্রিটিশ সরকারের মনে যথেষ্ট ভয়ের বাতাবরণ তৈরী করেছিল। একইসঙ্গে 'হোমরুল আন্দোলন' (Home Rule Movement, 1916) ও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিকাশ (চম্পারণ -১৯১৭, আহমেদাবাদ-১৯১৭, খেদা-১৯১৭)এবং রাওলাট (১৯১৯) ও খিলাফৎ(১৯২০-২২) আন্দোলন তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে নিম্নবর্ণীয়

জাতিগুলিকে নিজের পক্ষে আনার জন্য পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং নিম্নবর্ণীয়দের ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন আদায় ও ব্রিটিশ সরকারের নিম্নবর্ণীয়দেরকে কাছে টানার মধ্যে একটা পারস্পরিক যোগসূত্র তৈরী হয়েছিল বলা যায়। এই পারস্পরিক চাহিদার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে কয়েকটি পদক্ষেপের কথাও আমরা এখানে উল্লেখ কর তে পারি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **১৯১৬** খ্রি স্টাব্দে মাদ্রাজে স্থাপিত Justice Party র প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন[২৬], ব্রিটিশ- ভারতীয় সেনাবাহিনীতে রাজবংশী যুবকদের নিয়োগের ব্যবস্থা, [২৭] নিম্নবর্ণীয় জাতি সংগঠনগুলি থেকে ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ,[২৮] ইত্যাদি। 'নিম্নবর্ণীয় সমাজ ও ব্রিটিশ সরকারের পারস্পরিক বোঝাপড়ার' এই পদক্ষেপগুলি নিম্নবর্ণীয়দেরকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার পরিবর্তে 'জাতি ভাবধারার' (Caste thought) প্রতি ধাবিত হতে উৎসাহিত করেছিল । এই জাতিকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাকে আরো বেশী উদ্দীপিত করেছিল **১৯১৯** খ্রি স্টাব্দে গৃহীত ভারত শাসন আইন (*The Government of India Act,* 1919)।[২৯]

৪.২. ঔপনিবেশিক বাংলায় জাতি রাজনীতি ও বাংলার তপশিলি জাতি (১৯২০-১৯৩৬)

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে **১৯১৯** এর ভারত শাসন আইন *(The Government of India Act, 1919)* এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এর দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের জাতীয় আন্দোলনের দা বিকে খানিকটা মেনে নিয়ে ব্রিটিশ ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দেরকে অঙ্গীভূত করার জন্য ব্রিটিশ প্রদেশ সমূহে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রতিনিধি'র মর্যাদা থেকে নিজস্ব

সত্তায় পরিণত করে। এই পৃথক স ত্তার যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রাদেশিক আইনসভার   নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের   প্রদেশগুলির[৩০] মধ্যে বাংলায় নির্বাচনভিত্তিক জাতীয় আন্দোলন বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছিল। বাংলার প্রাদেশিক আইন-পরিষদের (Bengal Legislative Council) আসনগুলোকে মুসলমান (৩৮টি) , অ-মুসলমান বা সাধারণ (৪৬টি), ইত্যাদিতে ভাগ করা হয় যেখানে নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলো (Depressed Classes, Depressed Castes বা পরবর্তীকালের Scheduled Castes) তাদের প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পায়।

প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২০   এর ডিসেম্বর মাসে। এই নির্বাচনে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেনি। জাতীয় কংগ্রেস ও মুস লিম লীগ অসহযোগ (১৯২০-২২) ও খিলাফৎ আন্দোলন   (১৯১৯-১৯২২) নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এই দল সমূহের সমর্থকগণ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নির্দল প্রার্থী হিসাবে। পাশাপা   শি নিম্নবর্ণীয় জাতিসমূহের নেতৃবর্গ তাদের ‘জাতি চেতনা’কে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে তিনজন নমঃশূদ্র, তিনজন রাজবংশী, একজন পৌণ্ড্র ও একজন চর্মকার জাতির নেতা জয় লাভ করেন। [৩১] তাছাড়া ভীষ্মদেব দাস কে (নমঃশূদ্র আইনজীবী) মনোনীত সদস্য হিসাবে প্রথম আইন পরিষদে (১৯২১-২৩) স্থান দেওয়া হয়। ১৩৯ সদস্য বিশিষ্ট বাংলার আইন পরিষদে তপশিলি জাতির সদস্যগণ একসঙ্গে কাজ না করলেও তারা আইন পরিষদের বিভিন্ন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন ‘রাজবংশী জাতি আন্দোলনকে ’ জাতি-সংস্কারের (Caste reforms) পরিধি থেকে নির্বাচনমুখী করে তুলেছিল । উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রাজবংশীদের

উল্লেখযোগ্য জনঘনত্ব নির্বাচ নে তাদের জয়লাভের সহায়ক হয়েছিল। রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির প্রাণপুরুষ শ্রীপঞ্চানন বর্মা (রায় সাহেব) রংপুর নির্বাচন ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু প্রা র্থী (রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী ও আশুতোষ লাহিড়ী)দের পরাজিত করে 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতিকে' একটি রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করেন। একই সঙ্গে 'ক্ষত্রিয় সমিতি' সমর্থিত প্রার্থী শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকারও রংপুর (অ -মুসলমান) ক্ষেত্র থেকে জয়ী হন।[৩২] রংপুরে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির এই জয় উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিপক্ষে গিয়েছিল।

প্রাদেশিক আইন সভার দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৩ এর ২৬শে নভেম্বর। প্রথম নির্বাচনের চেয়ে এই নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে আলাদা। নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের মধ্য থেকে সৃষ্ট 'স্বরাজ্য দল' চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৬৯-১৯২৫) নেতৃত্বে নির্বাচনের হাওয়া নিজের দিকে টানতে শুরু করে। ফল প্রকাশের পর দেখা যায় যে অ-মুসলমান আসনে স্বরাজ্য দল অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। তপ শিলি জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে আগের মতই তপ শিলি জাতির নেতৃবর্গ তাদের জয়ের ধারা বজায় রাখে ন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেমচন্দ্র নস্কর (পৌণ্ড্র), মোহিনীমোহন দাস (নমঃশূদ্র), পঞ্চানন বর্মা, নগেন্দ্র নারায়ন রায় ও প্রসন্নদেব রায়কত। পরের তিনজন রাজবংশী জাতির গণ্যমান্য নেতা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উক্ত নেতৃবর্গ ছাড়াও নমঃশূদ্র নেতা মুকুন্দ বিহারী মল্লিক (খুলনা ও ফরিদপুর উত্তর), বিনোদ বিহারী মল্লিক (বাখরগঞ্জ দক্ষিণ), ও ঢাকা গ্রামীণ কেন্দ্রে যোগেন্দ্রনাথ রায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন। ঐ নির্বাচনে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় আ ন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অনুকূল চন্দ্র দাস ২৪ পরগণা (গ্রামীণ -দক্ষিণ) কেন্দ্রে ও রাজবংশী ক্ষত্রিয় নেতা ক্ষেত্রনাথ

সিংহ রংপুর কেন্দ্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন । তাছাড়া দিনাজপুর ও ত্রিপুরা অ-মুসলমান কেন্দ্রে ও তপশিলি জাতির প্রার্থী গণ (যথাক্রমে প্রেমহরি বর্মন ও রজনীকান্ত দাস) অংশগ্রহন করেছিলেন।[৩৩]

সারণী: ৪.১: ১৯২৩র বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উত্তরবঙ্গের প্রার্থীদের তালিকা ও নির্বাচনের ফলাফল ।

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্র	প্রার্থীর নাম	জাতি	মোট প্রদত্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোট	মন্তব্য
১ ক.	দিনাজপুর	বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	উচ্চবর্ণীয় হিন্দু	৯২১২	৫৫৩৪	নির্বাচিত
১. খ.	দিনাজপুর	বাবু প্রেমহরি বর্মন	রাজবংশী (নিম্নবর্ণীয় হিন্দু)	৯২১২	২৮৫৭	পরাজিত
১. গ.	দিনাজপুর	বাবু তারকনাথ চৌধুরী	উচ্চবর্ণীয় হিন্দু	৯২১২	৭৫৫	পরাজিত
২.ক	রংপুর	বাবু ক্ষেত্রনাথ সিংহ	রাজবংশী (নিম্নবর্ণীয় হিন্দু)	৪৪০০	৮৬৭	পরাজিত
২. খ.	রংপুর	বাবু যোগেশ চন্দ্র সরকার	রাজবংশী (নিম্নবর্ণীয় হিন্দু)	৪৪০০	১১৪৮	পরাজিত
২. গ.	রংপুর	রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা	রাজবংশী (নিম্নবর্ণীয় হিন্দু)	৪৪০০	৩১৪৭	নির্বাচিত
২. ঘ.	রংপুর	বাবু নগেন্দ্র নারায়ণ রায়	রাজবংশী (নিম্নবর্ণীয় হিন্দু)	৪৪০০	১৯০৪	নির্বাচিত
২. ঙ.	রংপুর	বাবু বিজয় কুমার রায়	উচ্চবর্ণীয় হিন্দু	৪৪০০	১৬৭৯	পরাজিত

		চৌধুরী				
৩. ক.	জলপাইগুড়ি	রাই কালীপদ ব্যানার্জী বাহাদুর	উচ্চবর্ণীয় হিন্দু	৩৬০৫	৫১৭	পরাজিত
৩. খ.	জলপাইগুড়ি	মি. প্রসন্নদেব রায়কত	রাজবংশী (নিম্নবর্ণীয় হিন্দু)	৩৬০৫	২৮০০	নির্বাচিত
৩. খ/গ	জলপাইগুড়ি	বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র	উচ্চবর্ণীয় হিন্দু	৩৬০৫	২১০	পরাজিত

উৎস: *The Bengal Legislative Council Proceedings, Vol-XVI,* (Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1924).

প্রাদেশিক আইনসভার দ্বিতীয় নির্বাচন বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে বহুবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ত, চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের উত্থান ও নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতিতে বাংলার জাতীয় নেতৃবর্গের অংশগ্রহণ ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অস হযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২২) পরিবর্তে জাতীয় কংগ্রেসের একটা বড় অংশ নির্বাচনে যোগ দিয়ে নির্বাচন রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করেছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলার নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রবণতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৃতীয় ত, এই নির্বাচনের সময় থেকেই জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে বাংলার নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহাবস্থানের সূচনা হয়।

বাংলার আইন পরিষদের তৃতীয় নির্বাচন পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলো থেকে আলাদা ছিল না। তবে কয়েকজন নতুন মুখ বাংলার রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তপশিলি জাতির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও তাদের সফলতার হার কমে যায়। এমন কি রাজবংশী

নেতা পঞ্চানন বর্মাও এই নির্বাচনে পরাজিত হন ।[৩৪] তৃতীয় আইন পরিষদের (১৯২৭-২৯) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল The Bengal Tenancy Reforms Bill (১৯২৮)কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক। আইন পরিষদের সদস্যরা তদের নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের স্বার্থকে মাথায় রেখে এই বিলকে সমর্থন বা বিরোধিতা করেছি লেন। জমিদার স্বার্থবিরোধী কিন্তু কৃষক স্বার্থে আনা এই বিলটিকে কেন্দ্রকরে আইন পরিষদের সসস্যগণ তিন ভাগে ভাগ হয়ে যান– (১) মুসলমান, (২) স্বরাজ্য, ও (৩) মনোনীত (অফিসিয়াল) ও ইউরোপীয়। হিন্দু সদস্যগণ (স্বরাজী ও অ-স্বরাজী) জমিদার স্বার্থ রক্ষার জন্য মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন। মুসলিম সদস্যগণ (দুই-একজন বাদে) প্রজাস্বার্থ রক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। অন্যদিকে নিম্নব র্ণীয় সদস্যগণও এই বিলকে কেন্দ্র করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। পৌন্ড্রজাতির হেমচন্দ্র নস্কর, নিজে জমিদার হওয়ায় ভূস্বামী স্বার্থে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। তবে রাজবংশী নেতা নগেন্দ্র নারায়ন রায় প্রজার স্বার্থে এই বিলটিকে সমর্থন করেছিলেন।[৩৫]

বাংলার রাজনীতির এই রকম একটি পরিস্থিতিতে ১৯২৯ এ আইন পরিষদের চতুর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অ-মুসলমান আসনগুলোতে নিম্নবর্ণীয় (ডিপ্রেসড ক্লাসের) প্রার্থীদের মধ্যে মোহিনী মোহন দাস (ফরিদপুর দক্ষিণ), প্রসন্নদেব রায়কত (জলপাইগুড়ি), ধীরেন্দ্রনাথ রায় (যশোহর দক্ষিণ), পঞ্চানন বর্মা (রংপুর পশ্চিম) ও হেমচন্দ্র নস্কর (২৪ পরগণা গ্রামী ণ কেন্দ্রীয়) জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ এর জানুয়ারী মাসে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ‘পূর্ণস্বরাজের’ দাবিতে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হ ওয়ায় স্বরাজ্য দলের সদস্যগণ আইন পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দেন। এ সময় মোট ৪৩ জন সদস্য ইস্তফা দিয়েছিলেন যেখানে নিম্নব র্ণীয়

জাতির তিনজন সদস্যও ছিলেন (ড. মোহিনী মোহন দাস, হেমচন্দ্র নস্কর ও ধীরেন্দ্রনাথ রায়)। অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থে এরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছিলেন। অন্যদিকে ওই আসনগুলো র উপনির্বাচনে ডিপ্রেসড ক্লাসের (Depressed Class) সাতজন সদস্য জয়লাভ করেছিলেন। এরা হলেন- প্রেমহরি বর্মন, নগেন্দ্র নারায়ন রায়, শরৎ চন্দ্র বল, ললিত চন্দ্র বল, অমূল্যধন রায়, ক্ষেত্রমোহন রায় ও হোসেনী রাউত। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চানন বর্মার মৃত্যু হলে তার স্থলে উপনির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন রাজবংশী জাতির নেতা ক্ষেত্রনাথ সিংহ। অর্থাৎ বাংলার চতুর্থ আইন পরিষদের (১৯২৯-১৯৩৬) সময়ে তপশিলি জাতির মোট আট জন নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। [৪১] এছাড়াও মনোনীত সদস্য হিসাবে রেবতী মোহন সরকার ও মুকুন্দ বিহারী মল্লিকও তৎকালীন আইন পরিষদে গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন।

সারণী: ৪.২: চতুর্থ আইন পরিষদের (১৯২৯-১৯৩৬) সময় উপনির্বাচনে জয়ী Depressed Class এর প্রার্থীদের তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	আসন	জাতি	পূর্ববর্তী সদস্য
১	প্রেমহরি বর্মন	দিনাজপুর	রাজবংশী	যতীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী
২	শরৎ চন্দ্র বল	ফরিদপুর	নমঃশূদ্র	মোহিনী মোহন দাস
৩	হোসেনী রাউত	মেদিনীপুর উত্তর	ঝাড়ুদার (মেথর)	দেবেন্দ্র লাল খাঁন
৪	নগেন্দ্র নারায়ণ রায়	রংপুর পূর্ব	রাজবংশী	যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী
৫	ক্ষেত্রমোহন রায়	ত্রিপুরা	নমঃশূদ্র	অখিল চন্দ্র দত্ত
৬	ললিত চন্দ্র বল	বাখরগঞ্জ দক্ষিণ	নমঃশূদ্র	সত্যেন্দ্র রায় চৌধুরী
৭	অমূল্যধন রায়	যশোহর দক্ষিণ	নমঃশূদ্র	ধীরেন্দ্র নাথ রায়

উৎস: Dilip Banerjee: *Election Recorder, An Analytical References 1862-2012,* (Kolkata, Star Publishing House, 2012),পৃ.পৃ. ৩২-৪৫।

কিন্তু চতুর্থ আইন পরিষদের সময় বাংলা সহ ভারতের রাজনীতিতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। আইন অমান্য আন্দোলনের বিকাশ (১৯৩০-৩২), ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন কাঠামো সৃষ্টির জন্য লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conference, 1930-32), মুসলিম লীগের পৃথক রাজ্য (Separate Homeland) ও কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজের দাবি, ইত্যাদি; ১৯৩০ এর দশকের প্রথম পর্বের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। তবে সবচেয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যা□মজে ম্যাকডোনাল্ডের (Ramsay MacDonald) দ্বারা 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' (Communal Award, 1932) র ঘোষণা। এই ঘোষণার দ্বারা মুসলমানদের মত 'ডিপ্রেসড ক্লাস' বা তপশিলি জাতিগুলিকে পৃথকভাবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। বি . আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে (Dr. B.R. Ambedkar 1891-1956) তপশিলি জাতি ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানগণ একে স্বাগত জানালেও কংগ্রেস এই ঘোষণাকে মেনে নিতে পারেনি। পু ণা জেলে ব ন্দি মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত পু ণা চুক্তির (১৯৩২) মাধ্যমে তপশিলি জাতিসমূহ ও কংগ্রেসের মধ্যে বোঝাপড়া হয়। কংগ্রেস , তপশিলিদের জন্য পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে 'সংরক্ষিত আসনের ' (Reserve Constituency) প্রস্তাব দেয়। বাংলার ক্ষেত্রে ৩০টি সাধারণ আসনকে তপ শিলিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। [৩৭] পাশাপাশি Depressed Caste/Depressed Class ইত্যাদির পরিবর্তে নিম্নব র্ণীয় জাতিগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় যা ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে *The Government of India* (*Scheduled*

Caste) Order এ স্থান পায়। তাছাড়া ১৯৩০ এর যাবতীয় তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে ১৯৩৫ এ ভারত শাসন আইন (*The Government of India Act, 1935*) গৃহীত হয়।

৪.৩. বাংলার তপশিলিদের জাতি রাজনীতি ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন ১৯৩৭-১৯৪৭

১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন ঔপ নিবেশিক ভারতের ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলিতে নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতি কে নতুন মাত্রা দিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতোই বাংলার প্রাদেশিক আইন সভার (Bengal Legislative Assembly or BLA) নির্বাচন জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাতীয় স্তরের দল অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ (All India Muslim League বা ML) এবং হিন্দু মহাসভা ও আঞ্চলিক দল কৃষকপ্রজা পার্টি (KP)[৩৮] এখন থেকে নিজেদের নির্বাচনমুখী করে তোলে। বাংলার ক্ষেত্রে বিধানসভার আসনসংখ্যা ছিল মোট ২৫০ টি। এদের মধ্যে ১১৯ টি আসনকে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়(পৌর-৬, গ্রামীণ-১১১ এবং মহিলা-২)। অন্যদিকে সাধারণ বা অ-মুসলমান আসনের সংখ্যা ছিল মোট ৮০ টি (পৌর-১২ টি, সাধারণ গ্রামীণ-৩৬, তপশিলি সংরক্ষিত-৩০, সাধারণ মহিলা-২)।

সারণী: ৪.৩: ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলার বিধানসভার আসনগুলির বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	আসনের ধরণ	সংখ্যা	আসনের বিভাজন
১	সাধারণ	৪৮	পৌর- ১২, গ্রামীণ- ৩৬
২	সাধারণ (তপশিলি)	৩০	গ্রামীণ-৩০
৩	মুসলমান আসন	১১৭	পৌর- ৬, গ্রামীণ- ১১১
৪	অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আসন	৩	---

৫	ইউরোপীয়	১১	---
৬	ভারতীয় খ্রিস্টান	২	---
৭	বাণিজ্য, শিল্প, খনি ও বাগিচা	১৯	ইউরোপীয়- ১৪, হিন্দু- ৪ মুসলমান -১
৮	ভূম্যধিকারী	৫	------
৯	শ্রমিক	৮	-------
১০	বিশ্ববিদ্যালয়	২	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় -১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- ১
১১	মহিলা	৫	সাধারণ-২, মুসলমান-২, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান- ১
১২	মোট	২৫০	--------

তথ্যসুত্রঃ Dilip Banerjee: *Election Recorder,* (Kolkata, Star Publishing House , 2012) , পৃ. ৪৯।

১৯৩৫ এর আইন অনুযায়ী বাংলার বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ এ (১৬-২৫ শে জানুয়ারী)। বাংলার তপশিলি জাতির শিক্ষিত ও অগ্রসর অংশ এই নির্বাচনে বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করে। নিজেদের জাতি-ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন ও জাতি চেতনার পাশাপাশি জাতীয় রাজনৈতিক দলের (কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, হিন্দু জাতীয়তাবাদী) ছত্রছায়াতেও তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ ও সংরক্ষিত সব মিলিয়ে ৭৮ জন তপ শিলি জাতির প্রার্থী (রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র, মালো, শুঁড়ি, বাগদি, মাল, কৈবর্ত্য, ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ৩০ টি সংরক্ষিত আসনে ২২ জন জয়লাভ করেছিলেন নির্দল প্রার্থী হিসাবে। অন্যদিকে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা যথাক্রমে ৬ টি ও ২ টি সংরক্ষিত আসন দখল করেছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে একজন তপশিলি নেতা সাধারণ আসনে নির্দল প্রার্থী

(যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল) ও আরেকটি সাধারণ আসনে কংগ্রেস প্রার্থী (ঈশ্বরচন্দ্র মাল) হিসাবে জয়লাভ করেছিলেন। সব মিলিয়ে মোট ৩২টি আসনে জয়লাভ করে তপশিলি জাতি ১৯৩৭ এর পরে বাংলার রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী স্থানে উন্নীত হয়েছিল। [৩৯] এমন কি বাংলার প্রাদেশিক সরকার গঠনে তারা হয়ে ওঠে 'অবশ্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শক্তি'।[৪০]

সারণী: ৪.৪: ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল।

ক্র.স.	দল	বিজয়ী আসন	বিস্তারিত বর্ণনা
১	কংগ্রেস	৫৪	কংগ্রেস হিন্দু-৪৩, তপশিলি সংরক্ষিত আসন-৬, তপ শিলি সাধারণ আসন -১, কংগ্রেস শ্রমিক-৪
২	হিন্দু জাতীয়তাবাদী	৩	--
৩	হিন্দু মহাসভা	২	উভয়েই তপশিলি জাতির সদস্য
৪	মুসলিম লীগ	৪০	
৫	কৃষক প্রজাপার্টি	৩৮	
৬	নির্দল/ স্বতন্ত্র মুসলিম	৪৩	মুসলিম সাধারণ আসনে স্বাধীন মুস লিম- ৪১, মুসলিম শ্রমিক- ২
৭	নির্দল হিন্দু	১৪	চা বাগান শ্রমিকসহ হিন্দু
৮	নির্দল তপশিলি	২৩	সংরক্ষিত তপ শিলি আসন - ২২ , তপ শিলি সাধারণ আসন—১
৯	ইউরোপীয়, অ্যাংলো- ইণ্ডিয়ান এবং খ্রিস্টান	৩১	--
১০	অন্যান্য	২	--
১১	সর্বমোট	২৫০	

তথ্যসূত্র: Dilip Banerjee: *Election Recorder*, পৃ. ৫০।

এই নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের অংশগ্রহণ ও তাদের সফলতা বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছিল। রাজবংশী অধ্যুষিত রংপুরে তপ শিলিদের জন্য সংরক্ষিত দুটি আসনে রাজবংশী সমাজের ক্ষেত্রনাথ সিংহ, পুষ্পজিৎ বর্মা (পঞ্চানন বর্মার পুত্র), নগেন্দ্রনাথ রায় ও ইন্দু রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম দুজন জয়ী হয়েছিলেন। অন্যদিকে 'জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি' সংরক্ষিত কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ বর্মন। [৪১] বগুড়া -পাবনা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন মধুসূদন সরকার। রাজবংশী সমাজের এই প্রার্থীগণ ক্ষত্রিয় সমিতির অন্তরালে নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন । কিন্তু দিনাজপুর কেন্দ্রে রাজবংশী প্রার্থী শ্যামাপ্রসাদ বর্মন নির্দল হিসাবে জয়লাভ করলেও প্রেমহরি বর্মন জয়ী হয়েছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে। অর্থাৎ রাজবংশী সমাজ থেকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রবণতা এই সময় থেকেই শুরু হয়। কিন্তু রাজবংশীদের বৃহৎ অংশ ক্ষত্রিয় সমিতি কেই তাদের রাজনৈতিক পরিচিতির প্রধান সূচক হিসেবে মনে করতেন। [৪২] রাজবংশী ক্ষত্রিয় পরিচিতির এই একতাবোধই রংপুর কেন্দ্রে পরাজিত প্রার্থী নগেন্দ্রনাথ রায়কে বাংলার বিধান পরিষদের (Bengal Legislative Council) নির্বাচিত হওয়ার প্রয়োজনীয় সমর্থন জুগিয়েছিল। [৪৩] ফলে জাতীয় কংগ্রেস রাজবংশীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেও 'ক্ষত্রিয় একতার ভাবধারাতে ' ফাটল ধরাতে পারেনি। অর্থাৎ ১৯৩৭ এর নির্বাচন পর্যন্ত উত্তর বঙ্গের রাজবংশীগণ তাদের সামাজিক পরিচিতিকে তাদের রাজনৈতিক শক্তির ঊর্ধ্বে উঠতে দেননি।

নির্বাচনোত্তরকালে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) নেতৃত্বে মোট ১১ জন সদস্য নিয়ে বাংলায় মন্ত্রীসভা গঠিত হয় (১৯৩৭-৪১)। এই মন্ত্রীসভায় দুজন তপশিলি জাতির সদস্যকে স্থান

দেওয়া হয় (প্রসন্নদেব রায়কত ও মুকুন্দ বিহারী মল্লিক)। ফজলুল হকের সরকারে তপশিলিদের মধ্যে রাজ নৈতিক একতা বৃদ্ধি তথা বাংলার আইন সভায় তপ শিলি স্বার্থরক্ষায় যারা সরব ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মন। মূলত রাজবংশী ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রাদেশিক আইনসভায় তার প্র বেশ। কৃষিনির্ভর রাজবংশী সমাজের স্বার্থকেই তিনি নির্বাচনে হাতিয়ার করেছিলেন। ১৯৩৭ এর নির্বাচনে তার নির্বাচনী প্রতীক ছিল লাঙল ও তার প্রচার পত্রের নাম ছিল *'লাঙলের দাবি*।[৪৪] এখানে তিনি স্পষ্টভাবে কৃষকদের কথা তুলে ধরেন:

......কলি যুগে কৃষক আমরা লাঙল মোদের চিন।
যুগে যুগে লাঙল বড়, লাঙল না হয় হীন।।
মাঠে লাঙল চালাই আমরা, তাই বলে সবে চাষা।
মাটির পৃথিবী সোনা ফলাইয়া আমরাই করি খাঁসা।।

....

শুনবি কি ভাই কৃষকের কথা খুঁজে দেখ দেখি পাতি।
দুইশত কোটি টাকা বছরে লাঙলের কেরামতি।।
সাড়া বাংলায় যত ধনকড়ি হয় প্রতি বৎসরে
নব্বইভাগ আমরাই দেই খালি লাঙলের জোরে।
আমরাই পুষি জমিদার, দেই মহাজনকে সুদ।
পরকে খাওয়াই ঘি ভাত, আর নিজে খেয়ে বাঁচি খুদ।।
দিন রাতি ভোর উপাসী থাকিয়া পেটে নিদারুণ ভোক্।

বামহাতে মোরা লাঙল চালাই, আর ডানহাতে মুছি চোখ।।

....

আমারি মত যে লাঙল ধরে লাঙল ভরসা করে।

আমারি মতন আপন ভায়ের তরেতে মমতা করে।।

লাটের সভায় জোর গলায় যে জানাবে মোদের দাবি।

ভোটের বাক্সে "উপেন বর্মন" লাঙল তাহার ছবি।।[৪৫]

প্রকৃতপক্ষেই উপেন্দ্রনাথ বর্ম ন কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় তার দাবি উপস্থাপিত করেছিলেন আইনসভায়। রাজস্বমন্ত্রী বিজয় প্রসাদ সিংহরায় ডুয়ার্স অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশের খাসমহলে অধিক রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করলে উপেন্দ্রনাথ বর্ম ন সরকারের সমালোচনা করে বলেন –

> So far as people in the Dooars are concerned they are not at all prosperous. Enhancement in rents has been in the Dooars not because blood has congested there, but with a policy that no blood might be left out.
>
> ....At a time when the agriculturists were smarting under the burden of economic depression, and they could not clear up their arrears, is it just for Government to increase the value of the tenures...?[৪৬]

উপেন্দ্রনাথ বর্মন নিজে কৃষক পরিবারের সন্তান ও কৃষিজমির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার ফলে ডুয়ার্স অঞ্চলের খাসমহলে কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় তার মতামত প্রাধান্য পেয়েছিল।

১৯৩৭-র নির্বাচন পরবর্তী তপ শিলি জাতি সমূহের মধ্যে রাজনৈতিক একতা তথা বিধান সভায় তাদের হয়ে নেতৃত্ব প্রদানে উপেন্দ্রনাথ বর্মন এগিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে ১৯৩৭ এর বিধান পরিষদ (বা Legislative Council) এর নির্বাচনে তার ভূমিকা স্মরণযোগ্য। মোট সাতজন M.L.A.-র ভোট পেয়ে Council এ নির্বাচিত হতে হত। তৎকালীন বাংলার উচ্চবিত্ত প্রতিনিধিগণ একটি ভোট পাওয়ার জন্য ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা ব্যয় করার জন্য ও প্রস্তুত থাকতেন।[৪৭] কিন্তু উপেন্দ্রনাথ বর্ম ন ও ক্ষত্রিয় সমিতির অন্যান্য বিধায়কগণ (পূষ্পজিৎ বর্মা, প্রেমহরি বর্মা, শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ, ক্ষেত্রনাথ সিংহ, তারিণীচরণ প্রামাণিক) সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে তাদের প্রার্থী নগেন্দ্রনাথ রায়কে বিধান পরিষদে নির্বাচিত করেন। [৪৮] এটা রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি তথা জাতিভিত্তিক রাজনীতির একতার পরিচায়ক।

রাজবংশী ক্ষত্রিয়সুলভ একতা ছাড়াও উপেন্দ্রনাথ বর্মন অন্যান্য তপশিলি জাতির M.L.A.গণকে বিধানসভায় একটি নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা ছাড়া বাকি ২৫ জন M.L.A.কে নিয়ে উপেন্দ্রনাথ বিধানসভায় Independence Scheduled Caste Party (ISCP, 1938) গঠনে উদ্যোগী হন। নমঃশূদ্রনেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন এই ISCPর সম্পাদক। পৌণ্ড্র জাতির হেমচন্দ্র নস্কর ছিলেন এর সভাপতি। উপেন্দ্রনাথ বর্মন ISCP এর নেতা হিসাবে বিধানসভায় আলাদা ব্লক (Block) এ বসার জায়গা

বেছে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ ISCP বাংলার আইনসভায় উপেন্দ্রনাথ বর্ম নের নেতৃত্বে বাংলার তপশিলি জাতির রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হয়।[৪৯]

ফজলুল হকের প্রথম সরকারে (১৯৩৭-১৯৪১) বাংলার তপশিলি প্রতিনিধিগণ তাদের দাবিসমূহ নিয়ে দারুণভাবে সরব হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তারা তপশিলি জাতির শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন।[৫০] বিশেষ করে অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে সরকারের অপারগতার সমালোচনা করেন তারা। বিধানসভায় উপেন্দ্রনাথ বলেন---

> It seems that this question of free and compulsory primary education is going to be agitated over and over in this House and that without any result----It is the duty of this House to see that the agricultural population of Bengal who are producing 90 percent of the wealth of the province must be given their just due.[৫১]

অর্থাৎ আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাকে বাংলার কৃষক ও অন্যান্য প্রান্তিক শ্রে ণীর প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার কথাকে উপেন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। বিধানসভায় ISCP নেতা হিসাবে তার বাগ্মিতার জন্য উপেন্দ্রনাথ ফজলুল হক সরকারে গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলার সরকার সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ ছিল না। মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির আদর্শগত পার্থক্য, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা , বৃটিশদের

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও বাংলার সরকারকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য মুসলিম লীগের অনমনীয় মনোভাব ফজলুল হকের কোয়ালিশন সরকারের (Coalition Party/Government) মধ্যে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি করেছিল। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ভূমিসত্ত্ব (Tenancy right), শিক্ষানীতি ও 'গ্রামীণ দারিদ্র' (rural poverty) বিষয়ক নীতি এই সরকারের অংশীদারদের কাছে (KP, ML ও অন্যান্য) পারস্পরিক বিরোধিতার সৃষ্টি করে। ফজলুল হক কোনোপক্ষকেই সার্বিকভাবে তুষ্ট করতে পারেননি। মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার পদবিতরন নিয়ে মনোক্ষুন্ন ছিল। KPর চরমপন্থীগণ মুসলিম লীগের জমিদার পন্থী স্বার্থের বিরোধী ছিলেন। [৫২] KP র সদস্যরা জমিদা রি ব্যবস্থা ও নিপীড়ণমূলক আইনগুলির অবসানের দা বি চালিয়ে যেতে থাকে ন। এমনকি তারা রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দা বিতে সোচ্চার হন। তাদের দা বি চূড়ান্ত আকার ধারণ করে যখন ফজলুল হকের আদেশ অমান্য করে ২১ জন KP সদস্য কোয়ালিশন থেকে বেরিয়ে আসে ন।[৫৩] তাই সরকার বাঁচানোর জন্য ফজলুল হক মুসলিম লীগের উপরে বে শি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ১৫ই অক্টোবর ১৯৩৭ ফজলুল হক মুস লিম লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এমনকি ১৯৪০ এ মুস লিম লীগের লা হৌর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাবের (Pakistan Resolution or Two Nations Thoery) উত্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। [৫৪] এতকিছু করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে (১৯৩৯-৪৫) ফজলুল হক মুস লিম লীগের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারেননি। ভাইসরয়ের National Defence Council এ যোগদানকে কেন্দ্র করে মহম্মদ আ লি জিন্নাহ (মুস লিম লীগের সর্বোচ্চ নেতা) ও ফজলুল হকের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্ট হয়। মুস লিম লীগ ২৫শে আগষ্ট (১৯৪১) ফজলুল হককে সরকার থেকে

পদত্যাগ করার নির্দেশ জারি করে। বাংলার স্বার্থের কথা উল্লেখ করে তিনি পদত্যাগ করতে রাজি হন।[৫৫] শেষপর্যন্ত অক্টোবরের (১৯৪১) প্রথম সপ্তাহে ফজলুল হকের প্রথম সরকারের অবসান ঘটে।[৫৬]

১৯৪১ এ নির্বাচিত সরকারের পতন বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পর্যায়। বাংলার গভর্নর (Sir John Herbart ১৯৩৯-৪৩) মুসলিম লীগের খাঁজা নাজিমুদ্দিনকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু মুস লিম লীগ, সরকার গঠনে ব্যর্থ হওয়ায় গভর্নর পুনরায় ফজলুল হককে সরকার গঠ নের পরামর্শ দেন। সমর্থন আদায়ের জন্য ফজলুল হক এবার কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী ও তপ শিলি সদস্যদের দ্বারস্থ হন। বাংলার তৎকালীন পরিস্থিতিতে তপশিলি বিধায়কগণ সরকার গঠনে নির্ণায়কের ভূমিকা য় অবতীর্ন হন। এমতাবস্থায় ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ কংগ্রেস (২৮ জন), জাতীয়তাবাদী (১৪ জন), KP-সামসুদ্দিন (১৯ জন), ISCP (১২ জন), অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান (৩ জন) ও শ্রমিক সদস্যদের নিয়ে ফজলুল হক 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট ' (Progressive Coalition Government) গঠন করেন।[৫৭]নয় সদস্যের মন্ত্রীসভায় তপ শিলি জাতির প্রতিনিধি হিসাবে উপেন্দ্রনাথ বর্মন স্থান পেয়েছিলেন। মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার প্রেক্ষাপট ও পদ্ধতি উপেন্দ্রনাথ তার নিজের কথায় তুলে ধরেছেন। তার নিজের ভাষায়---

"Herbert আদেশ দিলেন —'মন্ত্রীসভায় ৯ জনের বেশী সদস্য গৃহীত হইবে না '। মুসলিম পার্টি হইতে ফজলুল হক সাহেব, ঢাকার নবাব হাবিবুল্যা হাসেম আলি খান, সামশুদ্দিন আহম্মদ ও তমিজ্জুদ্দিন খান এবং Nationalist Party হইতে

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, সন্তোষ বোস এবং প্রমথ ব্যানার্জী মনোনীত হইল কিন্তু তপশীল পার্টি হইতে মনোনয়ন বাকী থাকিল। অনেকেই মন্ত্রী হইতে চান। কিছুতেই যখন একমত হওয়া গেল না তখন এক উপায় ঠিক করা হইল হক সাহেবের বাড়ীতে সব সদস্যদের ডাকা হইল। হক সাহেব ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আমাদের প্রত্যেককে কাগজ দিয়ে বললেন প্রত্যেকে নিজ নিজ কাগজে ২টি করে নাম লিখে দিন। তাতে নিজের নামও লিখে দিতে পারেন। যে নামে সর্ব্বাধিক ভোট পড়িবে তিনিই মন্ত্রী নির্বাচিত হইবেন।

আমি মন্ত্রীত্বের জন্য কাহাকেও কোনদিন Canvass করি নাই। নিজের নাম সহ আর একজনের নাম লিখিয়া দিলাম। গণনায় দেখা গেল আমিই সর্ব্বাধিক ভোট পাইয়াছি। এই সাফল্য সম্পূর্ণ আকস্মিক ..... । বস্তুত এই ভাবে পার্টির ভোটে মন্ত্রীসভার সদস্য নির্ব্বাচন আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তখনই লাটভবনে গিয়া মন্ত্রীত্বের শপথ গ্রহন করিলাম। আমাকে Forest and Excise বিভাগ দেওয়া হইল।”[৫৮]

মন্ত্রী হিসাবে উপেন্দ্রনাথের কার্যকাল ছিল মাত্র ষোল মাসের (১১ই ডিসেম্বর ১৯৪১ থেকে ২৯শে মার্চ ১৯৪৩)। এই সময়টি বাংলা তথা ভারতের জাতীয় জীবনের অত্যন্ত উত্তাল সময়। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত (১৯৩৯-১৯৪৫) কারণে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও অন্যদিকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা বাংলার রাজনীতিকে জটিল করে তোলে। একই সঙ্গে কংগ্রেস ভারত ছাড়ো আন্দোলনের (Quit India Movement August,

1942) ডাক দিয়ে সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জটিলতার মাত্রা বৃদ্ধি করে তোলে। এমতাবস্থায় ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সরকার সুস্থভাবে কাজ করার অবস্থায় ছিল না।[৫৯] ফলে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের পক্ষেও অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ ছিল না। তবুও বন ও শুল্ক (Forest and Excise) বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে অরণ্য সম্পদের উপর প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। একই সঙ্গে অরণ্য সম্পদকে শিল্পে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তার মন্ত্রীত্বকালীন সময়ে শিলিগুড়িতে একটি সরকারি করাত কল স্থাপিত হয় (১৯৪২)। অরণ্যজাত উৎপাদনের (Forest Product) উপর লক্ষ রাখার জন্য একজন Special Officer নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেন তিনি।[৬০] উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাংলার প্রাদেশিক সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে 'ব্যক্তিগত মালিকানায় কেউ অরণ্যকেন্দ্রিক কোনো শিল্প বোর্ড তৈরি করতে চাইলে সরকার সবরকমের সাহায্য করবে।'[৬১] অর্থাৎ বনবিভাগের আর্থিক উন্নয়ন ও বনসম্পদ আহরণের প্রতি উপেন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল।

আবগারি বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে উপেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মদ ও ওষুধের দোকানের অনুমতি (License) প্রদানের পূর্বে বাংলার মাদক ও আবগারি দপ্তরের অনুমতি প্রাপ্ত দোকানগুলোর পরিসংখ্যান তৈরি করান। ১৯৪২ সালে এই পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপ---

সারণী: ৪.৫: দেশীয় মদ ও দেশীয় ড্রাগের দোকানের পরিসংখ্যান।

	দেশীয় মদের দোকান	ড্রাগের দোকান
মুসলমান	৮৬	২৭৩
হিন্দু (উচ্চবর্ণীয়)	৪৪৭	৮১৯
তপশিলি জাতি	২৫৫	১৮৪

তথ্যসূত্র : *Assembly Proceedings, Bengal Legislative Assembly, Vol.LXIII, No.I,* (Alipore, Bengal Government Press, 1942), পৃ. ১২৩।

সারণী ৪.৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশীয় মদ ও ওষুধের দোকানের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের প্রাধান্য বেশি ছিল। তপ শিলি জাতি ও মুসলমানদের অনুমোদনপ্রাপ্ত দোকানের সংখ্যা ছিল কম। অর্থাৎ আবগা রি বিভাগের অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক অসমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিধানসভায় উপেন্দ্রনাথকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, “I cannot say what was the principle that was followed during the long past. During the present ministry, we have been observing the communal ratio rules.”[৬২] উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এই ধরনের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে এখন থেকে সাম্প্রদায়িক অনুপাতের নীতি (communal ratio rule) অনুসরণ করা হবে।

মন্ত্রী হিসাবে উপেন্দ্রনাথের পক্ষে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব হয়নি। ১৯৪২ সালের ২০ শে নভেম্বর ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পদত্যাগ, ক্রীপস মিশনের ব্যর্থতা (১৯৪২), বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিকাশ (১৯৪২) , বাংলার মেদিনীপুরের তমলুকে ‘জাতীয় সরকার’ গঠন, ১৯৪৩এর খাদ্যসংকট ও খাদ্য সরবরাহে সরকারের ব্যর্থতা ‘প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকারকে ’ কোনঠাসা করে তোলে। খাদ্য সংকটের মত বিষয়কে মুসলিম লীগ তার হাতিয়া রে পরিণত করে। মুসলিম লীগ ও বাংলার গভর্ণর এই অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়। শেষ পর্যন্ত ২৮শে মার্চ ১৯৪৩ ফজলুল হক

মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং ৩১শে মার্চ ১৯৪৩ প্রগেসিভ কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে।

ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে উপেন্দ্রনাথ বর্মন পদত্যাগ করেন (৩১ শে মার্চ ১৯৪৩)। এর পর মুস লিম লীগের নেতা স্যার নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান বাংলার গভর্নর । স্যার নাজিমুদ্দিন বাংলার স্বরাজ্য পার্টি, ISCP, ইউরোপীয়, ইঙ্গ -ভারতীয়, ভারতীয় খ্রিস্টান, শ্রমিক সদস্য ও নির্দলীয় সদস্যদের নিয়ে সরকার গঠন করেন। অন্য দিকে প্রগেসিভ কোয়ালিশন পার্টি, KP, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও আট জন তপশিলি সদস্য বিরোধীপক্ষে যোগদান করেন। তেরো জন সদস্য নিয়ে গঠিত স্যার নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভায় মোট ৭ জন মুসলমান সদস্য ছিলেন এরা হলেন স্যার নাজিমুদ্দিন (মুখ্যমন্ত্রী), এইচ এস সুরাবর্দি (সিভিল সাপ্লাই), তমিজউদ্দিন খান(শিক্ষা), খানবাহাদুর শায়েদ মুজামুদ্দিন হোসেন (কৃষি), মুসারফ হোসেন (বিচার ও আইন) , খাঁজা সাহাবুদ্দিন(ব্যবসা, শ্রম, শিল্প ও যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠন) ও মৌলবী জালাল উদ্দিন আহমেদ (স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন), অন্যদিকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দেওয়া হয়। নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভার এই তিনজন উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সদস্যরা হলেন- তুলসীচরণ গোস্বামী (অর্থ), বরদাপ্রসাদ পাইন (যোগাযোগ ও পূর্ত), তারকনাথ মুখার্জী (রাজ স্ব)। এই মন্ত্রীসভার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে তপ শিলি জাতির তিনজন সদস্যকে স্যার নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়েছিলেন। এরা হলেন পুলিনবিহারী মল্লিক (পাবলিসিটি) , যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল (সমবায় ঋণ ও গ্রামীন ঋণ) এবং প্রেমহরি বর্মন (বন ও শুল্ক)।[৬৩] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বন ও শুল্ক বিভাগের

পূর্বতন মন্ত্রী ছিলেন উপে ন্দ্রনাথ বর্মন। উপেন্দ্রনাথ পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়ার কালে গভর্নর তাকে স্যার নাজিমুদ্দিনের সরকারে মন্ত্রী হিসাবে যোগ দেওয়ার কথা বলেছিলেন । কিন্তু উপেন্দ্রনাথ শুধু মন্ত্রীত্বের জন্য স্যার নাজিমুদ্দিনের সরকারে যোগদানের জন্য রা জি হননি। তাঁর নিজের ভাষায়--

> ‘আমি পদত্যাগ পত্র লাটসাহেবের হাতে দিতেই তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন “আমি নতুন মন্ত্রীসভায় তোমাকে লওয়ার জন্য Sir Nazimuddin কে বলিয়া দিব” পরে Sir Nazimuddin আমাকে ডেকে মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। আমি দুঃখিতভাবে জানালাম যে Nationalist Party যোগ না দিলে entirely communal ministry তে আমি যোগ দিব না।
>
> পরে অবশ্য ৫ জন হিন্দু বরদাপ্রসাদ পাইন প্রভৃতি Nazimuddin Ministry তে যোগ দিয়াছিল কিন্তু আমি আর তাতে গেলাম না।‘[৬৪]

স্যার নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভার কার্যকাল ছিল মাত্র দুবছরের (১৯৪৩-১৯৪৫)। এই সময়ে বাংলার রাজনীতির সংকট ও তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা নাজিমুদ্দিনের পক্ষে সুখকর ছিল না। ২৮শে মার্চ ১৯৪৫ কৃষি বাজেট পেশ করার সময় বিরোধীপক্ষের আনা অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। স্যার নাজিমুদ্দিন আত্মপক্ষ অর্থাৎ আস্থা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন ফলে ২৯ শে মার্চ ১৯৪৫ বিধানসভার স্পীকার নৌসার আলি সরাসরি ঘোষনা করেন যে ‘নাজিমুদ্দিন সরকারের পতন হয়েছে এবং নতুন সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিধানসভার

কার্য পরিচালনা আর সম্ভব নয় ।'[৬৫] স্যার নাজিমুদ্দিন সরকারের পতনের ফলে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়।

৪.৪. জাতি রাজনীতির জাতীয় রাজনীতিতে রূপান্তর

স্যার নাজিমুদ্দিন সরকারের পতনের পর অবিভক্ত বাংলার রাজনীতি নানাবিধ কারণে জটি ল আকার ধারণ করে। প্রথমত, জাতীয় কংগ্রেস ভারতের 'পূর্ণ স্বাধীনতার' দাবিকে সামনে রেখে এগিয়ে চলতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত, মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দা বিকে তাদের একমাত্র ল ক্ষ্যে পরিণত করে। তৃতীয়ত , খাদ্য সংকট ও যুদ্ধজনিত কারণে অর্থনৈতিক সমস্যা সাধারণ জনজীবনকে ব্যাতিব্যস্ত করে তোলে । চতুর্থত, বা মপন্থী আন্দোলনের বিকাশ বাংলার সমগ্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুনমাত্রা সঞ্চার করে। এমতাবস্থায় ১৯৪৬ এর ১৯ থেকে ২২ শে মার্চ বাংলার বিধানসভার নির্বাচনের দিন ঘোষনা করা হয়। তাই ১৯৪৬ এর নির্বাচন বাংলার সবকটি রাজনৈতিক দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

এমতাবস্থায় তপশিলি জাতির পক্ষে রাজনৈতিক অবস্থান স্থির করা কঠিন হয়ে পড়ে। জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা, তপশিলিদের সর্বভারতীয় সংগঠন All India Scheduled Caste Federation (AISCF) ও তপ শিলিদের জাতিভিত্তিক সামাজিক সংগঠনগুলো বাংলার তপ শিলিদের এক অদ্ভুত সংকটময় অবস্থানের মধ্যে ফেলে দেয়। এই সংগঠনগুলোর মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস তপশিলিদের কাছে জাতীয় স্বার্থের বক্তব্যকে সামনে নিয়ে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী পুণা চুক্তির (১৯৩২) মধ্য

দিয়ে বিধানসভায় তপ শিলিদের সংক্ষরিত আসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। The Yeravda Pact অনুযায়ী বাংলার ক্ষেত্রে তপ শিলিদের (Depressed Classes) জন্য ৩০টি আসন সংক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তিতে কংগ্রেস আরোও ঘোষণা করেছিল যে---

> "There shall be no disabilities attaching to any one on the ground of his being a member of the Depressed Classes in regard to any election to local bodies or appointment to the public services. Every endeavour shall be made to secure fair representation of the Depressed Classes in this respects subject to such educational qualifications as may be laid down for appointment to the public services."[৬৬]

অর্থাৎ তপশিলিদের রাজনৈতিক স্বার্থকে কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত রাখার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৩৭ এর নির্বাচনে কংগ্রেস তপ শিলিদের কাছে খুব জন প্রিয় হতে পারেনি । ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস তপশিলিদের কাছে টানার প্রক্রিয়া শুরু করে। ঐ বছরের মার্চ মাসে সুভাষ চন্দ্র বসু বাংলার তপশিলি বিধায়কদের নিয়ে শরৎ চন্দ্র বসুর বাড়িতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এই আলোচনাসভায় উপেন্দ্রনাথ বর্মন বাংলায় তপশিলিদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে ধন্যবাদ জানান। মহাত্মা গান্ধী তপ শিলিদের জাতীয় স্বার্থে এমনকি তপ শিলিদের নিজের স্বার্থে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, পুষ্পজিৎ বর্মা

প্রমুখ তপশিলি বিধায়কগণ কংগ্রেসকে বর্ণ হিন্দুদের সংগঠন ভেবে কংগ্রেসে যোগ দিতে ইতস্তত করেছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বসু, শরৎ চন্দ্র বসু ও মহাত্মা গান্ধী এঁরা সবাই কংগ্রেসকে তপশিলিদের স্বার্থ রক্ষার দল হিসেবে কাজ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। [৬৭] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতীয়দের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে কংগ্রেসের বক্তব্যকে পুনরায় তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে মৌলিক অধিকারের তিন টি ধারা গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হয়। এগুলি হল,

i) All citizens are equal before law, irrespective of religion, caste, creed or sex.

ii) No disability attaches to any citizen by reason at his or her religion, caste, creed or sex, in regard to public employment, office of power or honour and in the exercise of any trade or calling.

iii) All citizens have equal rights and duties in regard to wells, tanks, roads, schools and places of public resort, maintained out of the state, or local funds or dedicated by private persons for the use of the general public. [৬৮]

শুধু সাংবিধানিক ঘোষনাই নয়, সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বকালে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে কংগ্রেস তার প্রভাব বিস্তারের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত (১৯৩৯

সালের ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুয়ারী) করেছিল রাজবংশী অধ্যুষিত জলপাইগুড়িতে। এই অধিবেশনে রাজবংশী কৃষকেরা দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন।[৬৯] জাতীয় কংগ্রেস তার জেলা সংগঠ নগুলোর মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের সপক্ষে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

এমতাবস্থায় ১৯৪৬-এর নির্বাচনের পূর্বে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমি তির সদস্যদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। শরৎচন্দ্র বসু জলপাইগুড়ির উচ্চবর্ণীয় কংগ্রে স নেতা খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মাধ্যমে উপেন্দ্রনাথ বর্মনকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৭০] কিন্তু উপেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের এই আহ্বানকে গ্রহণ করতে পারেননি। এর কারণ ছিল রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রতি তার দায়বদ্ধতা। তিনি মনে করতেন যে 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সূত্র ধরেই তিনি ১৯৩৭ সালে বিধানসভায় প্রবেশ করেছিলেন এবং ১৯৪৬-এর নির্বাচনের পূর্বে রংপুরের ক্ষত্রিয় সমিতির অন্যান্য সংসদ সদস্য দের সঙ্গে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন । সুতরাং ক্ষত্রিয় সমিতির সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়'।[৭১]

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ক্ষত্রিয় স্বার্থকে কম গুরুত্ব দিয়ে রাজবংশী নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই ল ক্ষ করা যায় যে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে রাজবংশীদের মধ্য থেকে একটা বড় অংশ জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ম ধ্যে যারা কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এরা হলেন রজনীকান্ত রায়বর্মন (রংপুর) , মোহিনীমোহন বর্মন (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি), হরেন্দ্রনাথ রায় (দিনাজপুর), প্রমুখ। অন্যদিকে ক্ষত্রিয় সমিতির প্রার্থীরা ছিলেন

উপেন্দ্রনাথ বর্মন (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি), নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও ক্ষেত্রনাথ সিংহ (রংপুর), শ্যামাপ্রসাদ বর্মন ও গোবিন্দচন্দ্র রায় (দিনাজপুর)। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নির্দেশ অমান্য করে রাজবংশীদের একটা অংশ জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে শুরু ক রেন যার ফলে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় জাতি চেতনায় অন্তর্বিরোধ প্রকট হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে রাজবংশী কৃষক ও প্রজাদের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারার বিকাশ এই সময়ে পূর্ণমাত্রা ধারণ করে। রাজবংশী অধ্যুষিত উত্ত রবঙ্গের জেলাগুলিতে (বিশেষ করে রংপুর, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরে) তেভাগা আন্দোলনের বিকাশ[৭২] ও রাজবংশীদের অংশগ্রহণ বামপন্থী ভাবধারার প্রচারের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। [৭৩] সোমনাথ হোড় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, তেভাগা আন্দোলনে নারী পুরুষ নির্বিশেষে রাজবংশীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বামপন্থী ধারার বিকাশ রাজবংশীদেরকে কমিউনিস্টদের হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসেবে রূপনারায়ণ রায় (দিনাজপুর), রাধামোহন বর্মন (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি) এবং হরিকান্ত সরকার ও নির্মলেন্দু বর্মন (রংপুর) ১৯৪৬-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হিন্দু মহাসভা বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে তপশিলিদের প্রভাবিত করে নির্বাচনে প্রার্থী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা হিন্দু মহাসভার দ্বারা ততটা প্রভাবিত হননি। একইভাবে All India Scheduled Caste Federation (AISCF) নমঃশূদ্রদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করলেও রাজবংশীদের মধ্যে এর প্রভাব ছিল সীমিত। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু মহাসভা ও AISCF রাজবংশীদের চিন্তাভাবনায় নিজেদের স্থান তৈরি করতে পারেনি । ফলে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে রাজবংশী অধ্যুষিত

আসনগুলোতে তপশিলি সংক্ষরিত কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বি দলগুলি হয়ে দাঁড়ায় ক্ষত্রিয় সমিতি, জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (Communist Party of India বা CPI)।

১৯৪৬-এর নির্বাচন জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ১১৭টি আসনের মধ্যে ১১৪টিতে মুসলিম লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। দুটি আসনে মুস লিম লীগ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী জয় লাভ করে। মুসলিমদের মধ্যে অন্যান্য সংগঠন (কৃষকপ্রজা পার্টি, জমিয়াৎ-উল- উলেমা, এমারৎ পার্টি, মুসলিম পার্লামেণ্টারী বোর্ড, ন্যাশনালিস্ট মুসলিম) এই নির্বাচনে শক্তি প্রদর্শন করতে পারেনি। KP পায় মাত্র চারটি আসন ও এমর ৎ পার্টি পায় একটি আসন। মুস লিম সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কোনটিতেই জয়লাভ করতে পারেনি। অর্থাৎ বাংলায় অপ্রতিহত রাজ নৈতিক শক্তি হিসাবে মুস লিম লীগের উত্থান ঘটে। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস মাত্র ৮৬টি আসনে জয়লাভ করে। তপ শিলি সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ২৬টি। শহ রাঞ্চলের অসংরক্ষিত (সাধারণ) ১২টি আসনের ১২টিতেই জয়লাভ করে কংগ্রেস। গ্রামী ণ অঞ্চলের অসংরক্ষিত ৩৬টি আসনের মধ্যে ৩৪টিতেই জয়লাভ করে কংগ্রেস। দুটি আসন কংগ্রেসের দ্বারা অনুপ্রাণিত নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করে। অর্থাৎ অসংরক্ষিত সাধারণ আসনে জাতীয় কংগ্রে সের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র তপ শিলি সংরক্ষিত ৪টি আসন কংগ্রেসের বিপক্ষে যায়। এদের মধ্যে একজন কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী (দিনাজপুরেরর রূপনারায়ন রায়) বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কমিউনিস্ট পার্টি আরো দুটো আসনে জয়লাভ করেছিল কিন্তু এরা কেউই সাধার ণ আসনে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। এরা হলেন ট্রেড ইউনিয়ন লেবারদের কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থী শ্রীজ্যোতি বসু (রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন) ও চা বাগান শ্রমিক (দার্জিলিং) কেন্দ্র থেকে জয়ী রতন লাল ব্রাহ্মণ। [৭৪] শেষোক্ত দুজন কমিউনিষ্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও সাধারণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। কেবলমাত্র রাজবংশী জাতির রূপনারায়ণ রায়ই ১৯৪৬ সালে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কমিউনিষ্ট বিধায়ক হতে পেরেছিলেন।

১৯৪৬ সালের সার্বিক ফলাফলের ভিত্তিতে মুস লিম লীগ বাংলায় সরকার গঠনের সুযোগ পায়। বাংলার গভর্নর ফ্রেডারিক বো রোস্ (Frederick Borrows) ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ - ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭) মুসলিম লীগের নেতা এইচ. এস. সুরাবর্দী কে (H.S. Suhrawardi) সরকার গঠনের আহ্বান জানান। প্রথমদিকে সুরাবর্দী কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ২৩শে এপ্রিল ১৯৪৬ সালে অতি সামান্য হিন্দু সমর্থন নিয়ে মুস লিম লীগের সরকার তৈরী করেন সুরাবর্দী। প্রথমদিকে (২৩শে এপ্রিল থেকে ১৫ই অক্টোবর) সুরা বর্দীর ৭ জনের মন্ত্রীসভায় কেবলমাত্র তপশিলি জাতির যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে হিন্দু প্রতিনিধি হিসেবে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের কোন জায়গা সুরাবর্দীর মন্ত্রী সভায় ছিলনা। একই সঙ্গে একথাও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে তপশিলি জাতির সমর্থনও এই সরকারের সঙ্গে ছিল না। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে তপশিলিদের ২৫জন বিধায়ক (৩০ জনের মধ্যে) কংগ্রেস ও ক মিউনিষ্টদলের হয়ে জয়ী হয়েছিলেন। কংগ্রেস বা কমিউনিষ্ট কেউওই সুরাবর্দীর সঙ্গে ছিল না।

বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সুরাবর্দীর পক্ষে সরকার চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক হিংসা-প্রতিহিংসা ও অন্যদিকে কমিউনিষ্টদের দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত তেভাগা আন্দোলন বাংলার রাজ নৈতিক পরিস্থিতিতে অস্থিরতার সৃষ্টি করে। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet Mission) তার মতামত ঘোষণা করে।[৭৫] এই মিশন মুস লিম লীগের পাকিস্থান প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয় কারণ এই মিশনের মতে পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব কেননা প্রস্তাবিত পাকিস্তানে প্রচুর হিন্দু ও ভারতে প্রচুর মুসলমান থেকে যা বে। এই মিশন ভারতের রাজ্যগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিল:

১. হিন্দু প্রধান রাজ্য (মাদ্রাজ, বোম্বে, মধ্যভারত, যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা),

২. মুসলিম প্রধান রাজ্য (পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও সিন্ধু),

৩. বাংলা ও আসাম।

এই মিশন আরো ঘোষণা করে যে ভাইসরয়ের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকা লীন সরকার (Interim Government) ও একটি সংবিধান সভা (Constituent Assembly) গঠিত হবে যাদের হাত ধরে ভবিষ্যতে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে।

কংগ্রেস এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়। কারণ এখানে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। মুসলিম লীগ ঠিক এই কারণেই এই প্রস্তাবকে পরিত্যাগ করে। 'কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি ' (Congress Working Committee) ক্যাবিনেট মিশনের সপক্ষে ২৫শে জুন ১৯৪৬ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্যদিকে (১৯ শে জুলাই ১৯৪৬) মুসলিম লীগ পাকিস্তান আদায়ের জন্য 'প্রত্যক্ষ

সংগ্রাম' (Direct Action) এর প্রস্তাব গ্রহন করে। ১ ৬ই আগষ্টকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন নির্ধারণ করা হয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (Primier) সুরাবর্দী ১৬ই আগষ্টকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করে দেন।[৮২] ফলে ১৬ই আগ ষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কোলকাতায় হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ ও খুন চলতে থাকে। হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা হয়ে ওঠে দুস্কর। এই হত্যালীলাকে Great Calcutta Killing বলা হয়ে থাকে। মুসলিম লীগের এই কার্যাবলীর বিরুদ্ধে হিন্দুরাও পা ল্টা মারমুখী হয়ে ওঠেন। মহম্মদ আলি জিন্না কলকাতার এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরো ধিতা করলেও বাস্তবে মুসলিম লীগের দাঙ্গা -হাঙ্গামা চলতেই থাকে।[৭৭] এমতাবস্তায় জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বতী সরকার (Interim Government) গঠিত হয় (২৪শে আগষ্ট ১৯৪৬)। এই সরকারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা ছিলেন জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, আসফ আলি, শরৎচন্দ্র বসু, জগজীবন রাম, রাজা গোপালাচারী, সর্দার বলদেব সিংহ, সঈদ আলি জাহির, সফৎ আহমেদ খান ও ড. সি.এইচ ভাবা। ২রা সেপ্টম্বর ১৯৪৬ থেকে এই সরকার তার কার্যাবলী শুরু করে কিন্তু মুস লিম লীগ এই সরকারে যোগ না দেওয়ায় এবং পাকিস্তানের দাবিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ না করায় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুখকর ছিল না। ভাইসরয়ের তৎপরতায় সাম্প্রদায়িক হিংসা বন্ধ করার লক্ষ্যে মুস লিম লীগ শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয় (১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৬)।

মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করায় কয়েকজন কংগ্রেস মনোনীত সদস্যকে (সঈদ আলি জাহিদ, শরৎচন্দ্র বসু, সফৎ আহমেদ) মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ।

মুসলিম লীগের প্রতিনিধি হিসেবে পাঁচ জনকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়। এরা হলেন লিয়াকৎ আলি খান, I. Chundrigar, আব্দুল রব নিস্তার, গজনফর আলি খান, ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। কিন্তু মুস লিম লীগ সরকারে যোগ দিলেও বাংলাতে সাম্প্রদায়িক হিংসা বন্ধ হয় নি। এমনকি মুসলিম লীগের সহ যোগিতায় মুস লিম অধ্যুষিত পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা, তাদের সম্পত্তি বিনষ্ট করা ও হিন্দু মহিলাদের উপর অত্যাচার মারাত্মক আকার ধারণ করে। ত্রি পুরা ও নোয়াখালিতে এ টা হয়েছিল অত্যন্ত সংগঠিত ভাবে।[৭৮] এর ফলে পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুরা পশ্চিমবাংলাসহ ভারতে বিভিন্ন স্থানে আসতে শুরু করেন। কিন্তু বাংলার মুস লিম লীগ সরকার এই সংকট নিরসনের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কারণ সুরাবর্দী মনে করতেন যে এই হিংসার সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি মুস লিম লীগ ত্রি পুরা ও নোয়াখালির দাঙ্গায় অভিযুক্তদের ছেড়ে দেওয়ার জন্যও সুরাবর্দীর কাছে দরবার করতে থাকে।

নোয়াখালির দাঙ্গা হিন্দুদের মনে নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমানবিরোধী দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। এই দাঙ্গা বিহারে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। বিহার সরকার দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যব স্থা গ্রহণ করেছিল।[৭৯] কিন্তু মুসলিম লীগ বিহার দাঙ্গাকে পাকিস্তান আদায়ের হাতিয়ারে পরিণত করে। মহাত্মা গান্ধী বিবদমান হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যসাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে নোয়াখালিতে যান। নোয়াখালিতে তিনি প্রায় তিনমাস (২৯শে অক্টোবর ১৯৪৬-১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭) থেকে বিহারে চলে আসেন।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারের স ঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করে ফলে ভারতসহ বাংলার অবস্থা দুর্বিষহ আকার ধারণ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতের রা জনীতির এই কঠিন সময়ে বাংলার তপ শিলি জাতি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে তাদের ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়া জানাতে থাকে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মুস লিম লীগের প্রতিনিধি হয়ে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করলে অন্যান্য তপ শিলিরা এই ঘটনাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিতে পারেননি। এমনকি নমঃশূদ্র জাতির কংগ্রেস বিধায়কগণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের এই পদক্ষেপকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারেননি। অনুরূপ সমস্যা সৃষ্টি হয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যেও। কেবলমাত্র নগেন্দ্রনাথ রায় ক্ষত্রিয় সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে সমর্থন করেছিলেন এবং বাংলার সুরাবর্দীর মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেসী রাজবংশী বিধায়কগণ নগেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন না। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কমিউনিষ্টদের একমাত্র বিধায়ক রাজবংশী জাতির রূপনারায়ণ রায় কমিউনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় তার পক্ষে কমিউনিষ্ট দলের মতামতের বাইরে বেরোনোর উপায় ছিল না।[৮০] ফলে রাজবংশীদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব ছিল না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিংসার বাতাবরণের মধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এট্‌লি (Clement Attlee) ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ এর জুনের মধ্যে ব্রিটিশ সরকা র ভারতের উপযুক্ত নেতৃবর্গের কাছে ভারতের শাসনভার হস্তান্তর করবে।[৮১] কংগ্রেস এই ঘোষণাকে স্বাগত জানায় অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের

শর্ত মানতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু মুস লিম লীগ 'পাকিস্তান' ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহী ছিল না। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুস লিম লীগের কাছে বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনটি রাস্তা খোলা ছিল—

(১) ভারত বা পাকিস্তানের যেকোনটিতে বাংলার যোগদান,

(২) দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তানে যোগদান,

(৩) দ্বিখণ্ডিত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বঙ্গদেশ গঠন।

কংগ্রেসসহ জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) পৃথক বঙ্গদেশ গঠনে রা জি ছিলেন না। ৮ই মার্চ ১৯৪৭ কংগ্রেস ঘো ষণা করে যে যদি ভারত বিভাজিত হয় তবে পাঞ্জাব ও বাংলা উভয়েই দ্বিখণ্ডিত হবে।[৮২] বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও অনুরূপ মত ঘোষণা করে। যদিও এসময় সুরাবর্দী ও শরৎচন্দ্র বসু 'অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা' গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু তা কে বাস্তবে রূপায়িত করার মত জনসমর্থন ছিল না। হিন্দু মহাসভা বা কংগ্রেস এমনকি মুস লিম লীগের কিছু নেতা এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে রা জি ছি লেন না। ভারতের নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে পৌঁছে (২২শে মার্চ ১৯৪৭) ল ক্ষ করেন যে মুস লিম লীগ ও কংগ্রেসের পক্ষে একসঙ্গে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং ভারতের বিভা জনই একমাত্র রাস্তা।[৮৩] ৩রা জুন ১৯৪৭ তিনি ভারত বিভাজনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন নির্ধারিত হয়।

৩রা জুন পরিকল্পনা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিধানসভার কাছে এক কঠিন সমস্যার উদয় হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই বাংলা বিভাজনের পক্ষে মত দান করে। কিন্তু

বাংলার তপশিলিদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ ছিল না। তপ শিলি কংগ্রেস বিধায়কগণ কংগ্রেসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলার বিভাজনের পক্ষে মত দিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু অ - কংগ্রেসী তপশিলি বিধায়কগণ বাংলা বিভাজনকে মনেপ্রানে মেনে নিতে পারেননি। মতবি রোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, হিংসা ও প্রতিহিংসার বাতাবরণের মধ্যে ১৯৪৭ এর ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট Indian Independence Act 1947 পাশ করে যার দ্বারা ১৫ই আগষ্টের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই আলাদা আলাদা ভাবে সংবিধান সভার দ্বারা নিজেদের সংবিধান রচনা করবে। এই সংবিধান রচনার কাজ খুব সহজ ছিলনা। যদিও ১৯৪৬ এর নির্বাচনের ভিত্তিতে সংবিধানসভা (Constituent Assembly) গঠিত হয়েছিল কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার আগে এই সভা ক্যাবিনেট মিশনের দায়ভার থেকে মুক্ত ছিল না। ২৯৬ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ২০৮ এবং মুসলিম লীগের ৭৩ জন। বাকি ১৫ জনের মধ্যে ৮ জন নির্দল সদস্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সংগঠনগুলোর মধ্য থেকে একজন করে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। AISCF এর একমাত্র সদস্য ছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর যিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলার অকংগ্রেসী তপ শিলি বিধায়কদের দ্বারা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, নগেন্দ্রনাথ রায়, ড. ভোলানাথ বিশ্বাস ও হারানচন্দ্র বর্মন। এদের মধ্যে শেষোক্ত দুইজন কংগ্রেসের আদেশ অমান্য করে তপশিলিদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ড. বি. আর. আম্বেদকরকে সংবিধান সভার সদস্য হিসাবে জয়ী হতে সাহায্য করেছিলেন।[৮৪] বাংলার সাধারণ আসন (অ-মুসলমান) থেকে নির্বাচিত

মোট ২৭ জন সদস্যের মধ্যে বি. আর. আম্বেদকর ছাড়াও আরো কয়েকজন তপ শিলি প্রতিনিধি সংবিধানসভায় প্রবেশ করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হেমচন্দ্র নস্কর, ধনঞ্জয় রায়, প্রসন্নদেব রায়কত ও প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। এরা সবাই কংগ্রেসের দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন। অর্থাৎ বাংলার তপ শিলিদের দ্বারা কংগ্রেসের মত অগ্রাহ্য করে স্বাধীন ভাবে সংবিধান সভায় কাজ করার সুযোগ ছিল না।

সংবিধানসভার কার্যাবলী শুরু হয় ডিসেম্বর (১৯৪৬) থেকে। কিন্তু মুস লিম লীগ পাকিস্তান দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংবিধান সভার সঙ্গে সহযো গিতা করেনি। কিন্তু ৩রা জুন ১৯৪৭ এর ঘোষণার দ্বারা পাকিস্তানের দা বি স্বীকৃত হলে মুসলিম লীগ উৎফুল্লভাবে পাকিস্তানের সংবিধান রচনায় মনোনিবেশ করে। এই পরিকল্পনার দ্বারা বাংলার সংবিধান সভার সদস্যরাও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভাজিত হয়ে যান। পশ্চিম বাংলা থেকে মো ট ২১ জন সদস্য ভারতের সংবিধান সভায় স্থান পেয়েছিলেন। তপ শিলিদের মধ্যে যারা সদস্যপদ পেয়েছিলেন তারা হলেন ড. মনমোহন দাস, মুকুন্দবিহারী মল্লিক ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন।

আমাদের গবেষণার প্রধান চরিত্র উপেন্দ্রনাথ বর্মনের সংবিধানসভার বা গণপরিষদের (Constituent Assembly) সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে 'রাজবংশীদের জাতিচেতনা থেকে কংগ্রেসী রাজনীতিতে যোগদানের পর্ব সম্পূর্ণ হয়েছিল '। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে ১৯৪৬ এর নির্বাচনে ক্ষত্রিয় সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে জলপাইগুড়ি-শিলিগু ড়ি আসনে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে তিনি কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন । তিনি কিভাবে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হয়ে গণপরিষদে প্রবেশ করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রাক্কালে জলপাইগুড়ির প্রসন্নদেব রায়কতের (যিনি গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন) অকস্মাৎ মৃত্যুতে (৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪৬)। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায় ও সুরেন ঘোষের সহযো গিতায় উপেন্দ্রনাথ বর্মন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে গণপরিষদে নির্বাচিত হন এবং তিনিই হয়ে ওঠেন গণপরিষদে বাংলার তপশিলিদের একমাত্র একনিষ্ঠ কর্মী।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংলা বিভাজনের ফলে তপ শিলি জাতির অধিকাংশ আসন পূর্ব বাংলায় চলে যাওয়ায় পাকিস্তানের গনপরি ষদে বাংলার তপশিলিদের সদস্য সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু কংগ্রেসী তপশিলি প্রার্থীগণ পাকিস্তা নের গণপরিষদে নির্বাচিত হতে পারেনি। অ -কংগ্রেসী হিসাবে পাকিস্তানের গণপরিষদে পূর্ববাংলা থেকে যে ক য়জন তপশিলি নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা হলেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রেমহরি বর্মন, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল ও ধনঞ্জয় রায়। ফলে ল ক্ষ করা যাচ্ছে যে রাজবংশী জাতির বিধায়কগণ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিভাজিত হয়ে যাওয়ায় তাদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করার সুযোগ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

৪.৫. সংসদীয় রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথ বর্মন

উপেন্দ্রনাথ বর্মন ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ১৯৪৭ সালে গণপরিষদের সদস্য হয়ে। গণপরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ভারতের সংবিধান রচনায় সামিল হয়ে তার এই যাত্রা শুরু হয় । ১৯৪৭ এর ১৪ই ও ১ ৫ই আগষ্ট 'ক্ষমতা হস্তান্তরের' (Transfer of

Power) ঐতিহাসিক মুহুর্তে রও তিনি অংশীদার হয়েছিলেন। তার এই অভিজ্ঞতার কথা আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন এইভাবে---

"১৯৪৭ সালের ১৪/১৫ আগষ্টের মধ্য রাত্রের স্মৃতিই আমার জীবনের উজ্জ্বলতম স্মৃতি। দিল্লীতে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য গণপরিষদ সদস্যগণ Constitution Hall বা সংবিধান গৃহে সমবেত হইয়াছেন। বাংলা প্রদেশ হইতে গঙ্গার উত্তরতীরস্থ অঞ্চল হইতে আমিই একমাত্র সদস্য। স্বা ধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পতাকা (National Flag) গণপরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে"

১৪ই আগষ্ট সারাদিন দিল্লী উৎসব মুখরিত। সন্ধ্যা হইতেই সমস্ত অট্টালিকা, রাজপথ, বিপনী সমূহ আলো ঝলমল হইয়া উঠিল। রাত্রি ১১টায় গণপরিষদ সভা বসিল। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ President রূপে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।........জওহরলাল নেহেরু, চৌধুরী খালিকুজ্জমান ও ডক্টর রাধাকৃষ্ণান কিছু সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেই ঘড়িতে ঢং ঢং করে ১২টা বাজা মাত্রই সভাপতি ও সদস্যগণ নিজ নিজ আসনের পাশে দণ্ডায়মান হইয়া শপথ গ্রহণ করিলেন।

শপথ গ্রহণের পর সভাপতি প্রস্তাবে বলিলেন "The Constituent Assembly of India has assumed power for the Governance of India".[৮৫]

সুতরাং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গের তপশিলি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে উপেন্দ্রনাথ বর্মন গণপরিষদের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজবংশী জাতিকে ভার তের ক্ষমতাহস্তান্তরের সঙ্গে সামিল করেছিলেন।

১৯৫০ এর ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়। ভারতের যাত্রা শুরু হয় সংবিধান লিপিবদ্ধ সাম্য (Equality), স্বাধীনতা (Freedom), ন্যায়বিচার (Justice) ও মৈত্রী (Fraternity) গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে। এমতাবস্থায় ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় উপস্থিত হয়। সংসদীয় রাজনীতির এই পর্বে উপেন্দ্রনাথ বর্মন কংগ্রেসের হয়ে উত্তরবঙ্গ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এখানে মোট তিনটি আসনের জন্য আটজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। মোট ভোটার ছিলেন **৮১২৫৮৩** জন ও মোট ভোটের সংখ্যা ছিল **১৬২৫১৬৬** টি। ভোট পড়েছিল ৪৭.৩৪% আর এই নির্বাচনে উপেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়ে (২০ .৬০%) জয়ী হয়েছিলেন। লোকসভার পরবর্তী নির্বাচনে (**১৯৫৭**) উত্তরবঙ্গের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ছয়-এ। উপেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কোচবিহারে তপ শিলি জাতির আসন থেকে। এবারেও তিনি ২৮.৬৭% ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরওয়ার্ড ব্লকের কমলকৃষ্ণ সিংহরায় পেয়েছিলেন **১৬.৫৮%** ভোট। কিন্তু **১৯৬২** সালের লোকসভার নির্বাচনে উপেন্দ্রনাথ বর্মন কোচবিহার তপশিলি জাতির সংরক্ষিত আসনে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী দেবেন্দ্রনাথ কার্জীর কাছে পরাজিত হন।

১৯৪৭ থেকে **১৯৬২** পর্যন্ত দিল্লীর সং সদীয় রাজনীতিতে যুক্ত থেকে উপেন্দ্রনাথ বে শ কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হল *The*

Untouchability (Offence) Bill 1954 এর Select Committee এর চেয়ারম্যান রূপে *The Untouchability (Offences) Act. No 22 of 1955* গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। লোকসভা থেকে নির্বাচিত মোট ২৬জন ও রাজ্যসভা থেকে নির্বাচিত মোট ১০জনকে নিয়ে গঠিত জয়েন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হন উপেন্দ্রনাথ। ভারত থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য ঐ কমিটির সদস্য ও ভারতের বিভিন্ন নিম্ন বর্ণীয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণে প্রয়াসী হন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে তার নিজের অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চলতে থাকা অস্পৃশ্যতার ঘটনা থেকে একটি কঠিন আইন গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্যতার অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন এই ভাবে—

> “১৯৪৮ সালের জুন মাসে পার্লিয়ামেন্ট Village Oil Industry ‘গ্রামীন তৈল শিল্পের’ আর্থিক অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। আমাকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল যে তেলকলের সহিত ঘানির প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ঘানিকে কিভাবে সাহায্য করা যায়। ...... বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধানের পর রাজাগোপালাচারীর, ‘সালেম’ জেলায় ঘানি তেলের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে গেলাম। এক গ্রামের মুখিয়ার (headman) বাড়ীতে বসে তথ্য সংগ্রহ করে যখন বেরিয়ে আসি তখন দেখি সমস্ত রাস্তা অবরুদ্ধ। প্রায়

জনা পঁচিশেক লোক পাশাপাশি উবুর হয়ে শুয়ে রাস্তা আগলে পড়ে আছে; আর দুটি হাত সামনের দিকে লম্বা করে জোড় হাত হয়ে আছে।

আমরা আশ্চর্য্য হয়ে মুখিয়াকে এর কার ণ জিজ্ঞাসা করিলাম। মুখিয়া জানাল যে এরা মে টে কূয়া হতে জলপান করে। প্রবল গ্রীষ্মে কূয়া শুকিয়ে গেছে তাই এদের পানীয় জলের অভাব। মুখিয়ার বা ড়ীর সামনেই এক বিরা ট কূয়া (St one Well) হতে একসাথে ৩/৪ জন লোক দড়ি কলসী দিয়ে জল তুলছে। সেদিক দেখিয়া বললাম –"কেন? এই তো এতো লোকে জল তুলছে?" মুখিয়া উত্তরে জানাল যে "এরা হরিজন—যদি এই কূয়া ওরা ছোঁয় তবে গাঁয়ের লোক ওদের পিটিয়ে মেরেই ফেলবে। ওদের আর জীবনে জল খেতে হবে না।"[৮৬]

১৯৫৪ সালে গঠিত সিলেক্ট কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও ভারতের কয়েকটি নিম্নবর্ণীয় জাতিসংগঠন অস্পৃশ্যতা নিবারণী আইন প্রনয়নের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিল। তৎকালীন ভারতের কয়েকটি প্রদেশে প্রচলিত অস্পৃশ্যতা বিরো ধী আইন The Untouchability (Offences) Bill, 1954 এর খসড়া তৈরীর প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। [৮৭] এছাড়াও The Bharatiya Depressed Classes League (New Delhi) ও The Harijan Sevak Sangh (Delhi) এর প্রতিনিধিরা সিলেক্ট কমিটিতে এই আইন প্রনয়ণের সময় অস্পৃশ্যতার প্রমান প্রদর্শন করেছি লেন । শেষপর্যন্ত ১৯৫৫ সালে এই বিলটি আইনে পরিণত হয়। এই আইনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় কোনো ধ রণের অস্পৃশ্যতার প্রদর্শন ও

অস্পৃশ্যতা নীতি গ্রহন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত হ বে। অস্পৃশ্যতার অপরাধে অপরাধীর দণ্ড ছয়মাস জেল ও পাঁচশো টাকার জরিমানার বিধান দেওয়া হয়।

এই আইন গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ভারতের জাতপাতের অবসান কল্পে নতুন যাত্রা শুরু হয়। অস্পৃশ্যতা নিবারণের আইনগত ভিত্তি তৈরী হওয়ায় পরবর্তীকালে ভারতে জাতপাতের মাত্রা অন্যরূপ ধারণ করে। এপ্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে--

"আইন হওয়ার প্রাক্‌কালে যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয় আমি তার চেয়ারম্যান মনোনীত হই। এই আইনে অনেক বিচার বিবেচনার পর অপরাধীর দণ্ড ৬ মাস জেল, ৫০০টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ড হওয়ার বিধান করা হয়।

এতদিনে এই অস্পৃশ্যতা অপরাধ অনেকটা শিথিল হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে, যদিও ভারতের অনেক প্রদেশে এখনও এ পাপ প্রথা দূরীভূত হয় নাই।"[৮৮]

অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন প্রনয়ন ছাড়াও উপেন্দ্রনাথ বর্মন আরো দুটি আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রথমটি হল *The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill 1955*। এই বিল এর জন্য গঠিত সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান হ য়ে উপেন্দ্রনাথ তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দ্বিতীয়টি হল *The Representation of the People (Amendment) Bill*, 1958। এই বিলের খসড়া নির্মানের সময়ও সিলেক্ট কমিটির তিনিই ছিলেন চেয়ারম্যান। ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে লোকসভার সদস্যরূপে আইন প্রণয়নে উপেন্দ্রনাথের ভূমিকা প্রমান করে যে তিনি তার দক্ষতা ও মেধার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সংসদীয় রাজনীতি তথা ভারতীয় রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথ বর্মন ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম পনেরো বছরে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত Commonwealth Parliamentary Conference এ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান ও ১৯৫০ সালের বার্মার রেঙ্গুনে অবস্থিত International Rice Commission এর বার্ষিক অধিবেশনের ভারতীয় দলের নেতৃত্ব প্রদান। এছাড়া ১৯৪৯ সালে কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি ও ১৯৫৬ সালে বিহারের কিষানগঞ্জ অঞ্চলের কিছু অঞ্চল নিয়ে অখণ্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন। [৮৯] তবে জাতীয় ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ন স্থান পেয়েছিলেন ১৯৫৯ সালে Public Accounts Committee এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে।[৯০]

৪.৬. উপসংহার

ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে সৃষ্ট হওয়া নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতি নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলিকে প্রাদেশিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছিল। ১৯২০র দশকে বাংলার অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির সঙ্গে উত্তরবাংলার রাজবংশীগণ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে জাতি-রাজনীতিকে শক্তিশালী করেছিলেন। ১৯৩০ এর দশকে বিশেষ করে ১৯৩৭ এর নির্বাচনের সময় রাজবংশীদের জাতি-রাজনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী আকার ধারণ করে। উত্তরবঙ্গ থেকে জাতি রাজনীতির সূত্র ধরে উপেন্দ্রনাথ বাংলার বিধানসভায় প্রবেশ করে হয়ে ওঠেন

রাজবংশীদের প্রধান গ্রহনযোগ্য প্রতিনিধি। এমনকি ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত সরকারে মন্ত্রীসভাতেও স্থান পেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দশকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে পূর্ণস্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম এবং কমিউনিষ্টদের শ্রেণীআন্দোলন জাতি রাজনীতিকে দুর্বল করে ফেলে। এমতাবস্থায় রাজবংশীসহ অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় জাতির জাতি-ভিত্তিক সংগঠনগুলো নির্বাচনী রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হতে থাকে। ফলে তপশিলি জাতির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। উপেন্দ্রনাথ বর্মন ১৯৪৬ এর নির্বাচনে পরাজিত হয়ে 'জাতি-রাজনীতি' থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করছিলেন। তার সেই সুযোগ এসেছিল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে ভারতে গণপরিষদে প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গণপরিষদ ও লোকসভার নির্বাচিত সদস্য হিসাবে উপেন্দ্রনাথ প্রকৃত অর্থেই জাতি -রাজনীতির আঞ্চলিক বৃত্ত থেকে ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে উপেন্দ্রনাথ ভারতের প্রতিনিধি এবং লোকসভার প্রতিনিধি হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি তার ভূমিকা পালন করেছেন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে। সুতরাং বলা যায় যে জাতি -চেতনার হাত ধরে জাতি-রাজনীতির বিকাশ উপেন্দ্রনাথের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিল।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal 1872-1947,* (Richmond, Surry, Curzon Press, 1997), পৃ. ১৭৩।

২. *তদেব*, পৃ.-পৃ. ১৩৬-১৭২; Rup Kumar Barman: *Partition of India and Its Impact on the Scheduled Castes of Bengal*, (Delhi, Abhijeet Publications, 2012), পৃ.-পৃ. ৭১-৯৬।

৩. ভারত বিভাজনের ইতিহাস চর্চাকারীগনের মধ্যে বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন । এদের মধ্যে –R.J. Moore: *Churchill, Cripps and India 1939-1945*, (Oxford, Clarendon Press, 1979); Anita Inder Singh: *The Origins of the Partition of India 1936-1947*, (Delhi, Oxford University Press, 1987); Radha Kumar: The Troubled History of Partition, *(Foreign Affairs V. 79 Jan/ Feb. 1997),* D.C. Potter: Man power shortage and the end of colonialism: The Case of Indian Civil Service, *(Modern Asian Studies 7 (1993),* পৃ.পৃ. ৪৭-৭৩, ইত্যাদি, বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে।

৪. ভারত বিভাজনের প্রাক্কালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রদেশ (Province) গুলি হল - বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ (United Province), মধ্যপ্রদেশ (Central Province), মাদ্রাজ, বোম্বে, সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ইত্যাদি।

৫. ১৯৪০ এর দশকে জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা তপশিলি জাতিগুলিকে নিজ নিজ দলে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। হিন্দু মহাসভা তপশিলিদের হিন্দু হিসাবে গ্রহণ ও প্রচার করে তাদেরকে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একইভাবে জাতীয় কংগ্রেস তপ শিলিদের 'হরিজন' হিসাবে প্রচার করে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল।

৬. ১৯৪৬ এর বিধানসভার নির্বাচনে ১১৭ টি মুসলমান সংরক্ষিত আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছিল ১১৪ টি আসন। অর্থাৎ মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগের এই আসন সংখ্যা কংগ্রেসের (৮৬টি) তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

৭. ১৯৪৬ এর নির্বাচনে ৩০টি তপশিলি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ২৬টি আসন। কমিউনিষ্ট পার্টি একটি তপশিলি আসনে (রূপনারায়ন রায়, দিনাজপুর) জয়লাভ করেছিল। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা আসন না পেলেও তপশিলি আসনগুলিতে (সংরক্ষিত) প্রার্থী দিয়ে প্রচুর ভোট পেয়েছিল।

৮. জয়া চ্যাটার্জীঃ *বাংলা ভাগ হলঃ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশবিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭,* আবুজাফর (অনুবাদক), (ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস, লিমিটেড, ২০০৩), পৃ.২৬৭।

৯. উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি,* (জলপাইগুড়ি, বিজয় চন্দ্র বর্মন, ১৩৯২), পৃ.-পৃ. ১১৫-১৮০, ও পৃ. ১৯২-১৯৭।

১০. Sumit Sarkar: *Modern India 1885-1947* , (Bombay, Macmillan India Limited, 1996), পৃ.পৃ. ৪-৭।

১১. 'স্বদেশ অনুসন্ধানের ' মধ্য দিয়ে জাতীয় ভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। ১৮৮০ এর দশকে তাঁর একাধিক রচনায় প্রাচীন ও ব্রিটিশপূর্ব যুগের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তার *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *দেবী চৌধুরানী* (১৮৮৪), *কৃষ্ণচরিত* (১৮৮৬), ইত্যাদি জাতীয়ভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আনন্দমঠের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। বন্দেমাতরম্ বর্তমানে ভারতের National Song।

১২. স্বদেশপ্রীতি বলতে আমরা স্বদেশপ্রেম বা দেশের প্রতি ভালোবাসা এই অর্থে ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ দেশের বা জাতির স্বার্থে আত্মত্যাগ ও দেশের কল্যানের জন্য আত্মবলিদান ও জাতির উন্নতির জন্য সেবা ইত্যাদিকে জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

১৩. Subaltern School এর বিকাশ শুরু হয় ১৯৮০ এর দশক থেকে। অধ্যাপক রণজিৎ গুহ ও তার সহযোগী ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে পার্থ চ্যাটার্জী, দীপেশ চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, শাহিদ আমিন, প্রমুখ, 'নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চাকে' ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিচার

বিশ্লেষণের একটি পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ঐতিহাসিকদের প্রচেষ্টায় ১৯৮০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ১২টি খন্ডে ঔপনিবেশিক আমলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় নিম্নবর্ণীয়দের অবস্থান বর্ণিত হয়েছে। রণজিৎ গুহ'র মতে Subaltern বলতে বোঝায় সেইসব সামাজিক অবস্থানের মানুষদের যারা আদতে 'demographic difference between the total Indian population and all those to whom we have described as the *elite'.* Ranajit Guha (ed): *Subaltern Studies-I: Writings on South Asian History and Society*, (Delhi, Oxford University Press, 1982), পৃ. ৮।

১৪. এই বিদ্রোহগুলি সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন A.N.Chandra: *The Sannyasi Rebellion,* (Calcutta, 1977), সুপ্রকাশ রায়ঃ *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম,* (কলকাতা, ১৯৬৬); Suranjan Chatterjee: New Reflections on the Sannyasi, Fakir and Peasants War, *Economic and Political Weekly , Vol. 19.No.4 (January 28, 1984),* pp.PE 2-PE 13; Atis Dasgupta: The Fakir and Sannyasi Rebellion, *Social Scientists , Vol.10, No.1 (January ,1982),* pp.44-55; Jon E. Wilson: A Thousand Countries to Go , *Past & Present , No 189 (Novemeber , 2005),* পৃ-পৃ. ৮১-১১০; ইত্যাদি।

১৫. রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (স): *রায়সাহেব পঞ্চানন রচনাবলী,* (কোচবিহার, প্রতিমা কার্জী, ১৩৯৮), পৃ. ১০।

১৬. পঞ্চানন বর্মার (সরকার) উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল : *কামতাবিহারী সাহিত্য* (উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন,তৃতীয় অধিবেসন, ১৩১৭); *দ্বিজ কমললোচনের 'চন্ডিকা বিজয় কাব্য'র টীকা* (১৯১৫); *গোবিন্দ মিশ্রের গীতা* (২৭শে মাঘ ১৩১৩, সাহিত্য পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন , রংপুর টাউন হল), *জগন্নাথী বিলাই*, *নাদিম পরামানিকের পাঠা* (রংপুর সাহিত্য পরিষ ৎ পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ১ম সংখ্যা, সংখ্যা ১৩১৬) ও *ডাংধারীমাও কবিতাগুচ্ছ* (১৯২০)।

১৭. রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (স): *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

১৮. *তদেব*।

১৯. পঞ্চানন বর্মা *'গোবিন্দ মিশ্রের গীতা'* পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। এই বিষয়ে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ২৭শে মাঘ রবিবার ১৩১৩ বঙ্গাব্দে রংপুর টাউন হলে সাহিত্য পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের সভায় তিনি পাঠ করেন। সেই সভার সভাপতি ছিলেন ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়। রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (স) : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

২০. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় *গোপীচন্দ্রের গান* প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

২১. রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (স): *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

২২. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি*, পৃ.-পৃ. ৩০-৩৬।

২৩. ক্ষত্রিয় সমি তি: *ক্ষত্রিয় সমিতির কার্যবিবরণী, প্রথমবর্ষ বিবরণী,* (রংপুর নাট্যমন্দির, ১৮ই বৈশাখ, ১৩১৭), পৃ. ১৯।

২৪.ক্ষত্রিয় সমিতি: *কার্য্যবিবরণী, চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন, সন ১৩২০ (৭ই, ৮ই ও ৯ই আষাঢ়) ও তৃতীয় বর্ষের বৃত্ত বিবরন,* (রংপুর, মনোহর বর্মা, ১৩২০), পৃ.-পৃ. ১৭-১৮।

২৫. সনৎকুমার নস্কর ও অন্যন্য (স) : *পৌণ্ড্র মণীষা* , (সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসংঘ, ২০১২), পৃ. ২৯৯।

২৬. ১৯১৬ সালে মাদ্রাজে Justice Party স্থাপিত হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ বিরোধিতা ও মাদ্রাজের অব্রাহ্মণদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন। এর স্থাপয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন T.M. Nair ও P. Theagaraja Chetty। পরবর্তীকালে এতে যোগ দিয়েছিলেন Pereyar E.V. Ramaswamy।

২৭ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস* , (জলপাইগুড়ি, বিজয়চন্দ্র বর্মন, ১৪০০)।

২৮. সনৎকুমার নস্কর ও অন্যন্য (স): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯৯।

২৯. Govt. of India Act 1919 ছিল Mantagu Chemsford Reforms (1917) এর আইনগত রূপ। এই আইন বাংলা সহ ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলোতে প্রাদেশিক সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। এই আইন বাংলার আইন পরিষদে (Bengal Legislative Council) ১৪০টি আসনের (১১৪টি নির্বাচিত ১৬টি আধিকারিক পর্যায়ের ও ৮টি ব্যক্তিগতভাবে মনোনীত) ব্যবস্থা করেছিল। বাংলার নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলি

(Depressed Castes/ Depressed Class/পরবর্তীকালের Scheduled Caste হিসাবে পরিচিত)। সাধারণ প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেয়েছিল।

৩০. এই প্রদেশগুলি হল বাংলা, বিহার, আসাম, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বে, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব।

৩১. তিনজন নমঃশূদ্র নেতা হলেন বাখরগঞ্জ (দক্ষিণ) কেন্দ্রের নিরোদবিহারী মল্লিক, ঢাকা (গ্রামীন) কেন্দ্রের যোগেন্দ্রনাথ রায় ও ফরিদপুর (দক্ষিণ) কেন্দ্রের যোগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়। রাজবংশী জাতির জয়ী সদস্যগণ হলেন রংপুরের পঞ্চানন বর্মা , যোগেশচন্দ্র সরকার ও জলপাইগুড়ির কোচ-রাজবংশী জমিদার প্রসন্নদেব রায়কত। নোয়াখালি থেকে জয়লাভ করেছিলেন চর্মকার (মুচি/ চামার) জাতির রসিকচন্দ্র চর্মকার।

৩২. রংপুর (অমুসলমান) কেন্দ্রে উচ্চবর্ণীয় প্রার্থী ছিলেন রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী ও শ্রীআশুতোষ লাহিড়ি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* (জলপাইগুড়ি, শিবেন্দ্রনাথ রায়, ১৪০৮), পৃ.পৃ. ৬২-৬৫।

৩৩. Dilip Banerjee: *Election Recorder: An Analytic Reference*, (Kolkata, Star Publishing House, 2012), পৃ. ৯৫৮।

৩৪. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চাননবন বর্মার জীবন চরিত,* পৃ.৬৮।

৩৫ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন , Partha Chatterjee: *The Land Question,* (Calcutta K.P.Bagchi & Co. 1984)।

৩৬. Dilip Kumar Banerjee: *পূর্বোক্ত* পৃ.পৃ. ৩২-৪৫।

৩৭. পুনা চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Vasant Moon (ed): *Dr. Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches, Vol-9,* (Bombay, Govt of Maharastra, 1991); আরোও দেখুন **সংযোজনী-৪ ।**

৩৮. কৃষক প্রজা পার্টি বা KP তৈরী হয় ১৯২৫ সালে। মূলত মুসলিম সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে জন্ম নেওয়া এই দল মুসলমান, কৃষক, প্রজা ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বে শি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বাংলার ভূমিব্যবস্থার সংস্কার ও কৃষক-প্রজা স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যে এই দল অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের সঙ্গে সখ্যতা ও প্রজা স্বার্থে কাজ করতে না পারার জন্য ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা দলের সরকার অন্তর্বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল।

৩৯. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও তপশিলি জাতির অংশগ্রহণ নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নবর্ণিত গবেষণাগুলো দেখা যেতে পারে। যেমন- Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal 1872-1947,* (Richmond Surry, Curzon Press, 1997) ; Rup Kumar Barman: *Partition of India and Its Impact on the Scheduled Castes of Bengal*, (Delhi, Abhijeet Publications, 2012), ইত্যাদি।

৪০. রূপ কুমার বর্মন : বাংলার নিম্নবর্ণীয় (তপশিলি) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান, বিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি, *অন্তর্মুখ, পর্ব -৩, সংখ্যা ৩, (জানুয়ারী-মার্চ, ২০১৪),* পৃ.পৃ. ১০৬-১২১।

৪১. *তদেব*, পৃ.১১৫।

৪২. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি*, পৃ. ৭০।

৪৩. *তদেব*। বিধান পরিষদের সদস্যরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন। বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্ব পেতেন। এমনকি বিধান পরিষদের সদস্যপদ পেতে উচ্চবর্গীয় (ধনী ও জমিদার শ্রেণীর) ব্যক্তিবর্গ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বিধানসভার সদস্যদের সপক্ষে টানার চেষ্টা করতেন।

৪৪. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি*, পৃ. ৭০।

৪৫. *তদেব*, পৃ. পৃ. ৭০-৭২।

৪৬. *Assembly Proceedings of Bengal Legislative Assembly,* (Alipore, Bengal Government Press, 1937), পৃ.-পৃ. ৪০৮-৪১৩।

৪৭. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি*, পৃ.৭০।

৪৮. *তদেব*।

৪৯. *তদেব*, পৃ. ৭৫।

৫০. *Assembly Proceedings of Bengal Legislative Assembly*, (Alipore, Bengal Government Press, 1937), পৃ. ৮২।

৫১. ২৬ আগষ্ট ১৯৩৭, বিধানসভায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের মন্তব্য। *Assembly Proceedings of Bengal Legislative Assembly,* (Alipore, Bengal Government Press, 1937),পৃ. ৬৩৭।

৫২. Gautam Chattopadhyay: *Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle 1862-1947*, (Delhi, Indian Historical Studies, 1984), পৃ. ১৫১।

৫৩. *তদেব*, পৃ. ১৫০।

৫৪. Rup Kumar Barman: *Partition of India and Its Impact on the Scheduled Castes of Bengal*, পৃ. ১১২।

৫৫. Anita Inder Singh: *The Origins of Partition of India,* পৃ.-পৃ. ৬৮-৬৯।

৫৬. Gautam Chattopadhyay: *প্রাগুক্ত*, পৃ.পৃ. ২০৫-২০৬।

৫৭. *তদেব*, পৃ. ১৭২।

৫৮. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি*, পৃ. ৮২।

৫৯. বিশদভাবে জানার জন্য দেখুন- বীরেশ মজুমদার : *শ্যামাপ্রসাদ ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব*, (কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৬)।

৬০. *Assembly Proceedings: Bengal Legislative Assembly , Vol .LXIII, No-I*, (Alipore, Bengal Government Press, 1942), পৃ. ৩।

৬১. *তদেব।*

৬২. *তদেব*, পৃ.১২৩।

৬৩. Rup Kumar Barman: *Partition of India and Its Impact on the Scheduled Castes of Bengal*, ১১৪। Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Protest and*

Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal 1872-1947, পৃ. ১৯৯।

৬৪. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি,পৃ.* ৮৪।

৬৫. Gautam Chattopadhyay: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪।

৬৬. A,M, Zaidi & Dr. S.G. Zaidi (eds): *The Encyclopaedia of the Indian National Congress, Vol.Ten, 1930-1935, The Battle for Swarj*, (New Delhi, S. Chand & Company LTD.,1980), পৃ.২৬১।

৬৭. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার ও আমার জীবনস্মৃতি*, পৃ.-পৃ. ৭৩-৭৫।

৬৮. A.M. Zaidi (eds): *The Encyclopaedia of the Indian National Congress, Vol.,Eleven, 1936-1938, Combating an Unwanted Constitution*, (New Delhi, S. Chand & Company LTD. ,1980), পৃ.পৃ. ১৩৪-১৩৫।

৬৯. নির্মলচন্দ্র চৌধুরী : *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজবংশী সম্প্রদায়,* (জলপাইগুড়ি, ১৯৮৫), পৃ.-পৃ. ২৮-২৯।

৭০. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি,* পৃ. ৯৮।

৭১. *তদেব*, পৃ. ৯৮।

৭২. তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সোমনাথ হোড়: *তেভাগার ডায়েরী,* (কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৯১)।

৭৩. Swaraj Basu: *Dynamics of a Caste Movement: The Rajbanshis of North Bengal, 1910-1947,* (New Delhi, Monohar, 2003), পৃ.-পৃ. ১২৬-১২৭।

৭৪. জ্যোতি বসু: *যত দূর মনে পড়ে,* দ্বাদশ মুদ্রণ, (কলকাতা, এন . বি.এ. , ২০১৫), পৃ .-পৃ. ২২-২৪।

৭৫ Lord Pathick Lawrence ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ ভারতের রাজনৈতিক ভবিষৎ নিয়ে ক্যাবিনেট মিশনের কথা ঘোষণা করেন যার সদস্যরা ছিলেন Secretary of State, The President of the Board of Trade (Stafford Cripps) ও The First Lord of Admiralty (A.V. Alexander)। এই মিশন মার্চ থেকে মে (১৯৪৬) ভারতে ছিল এবং ১৬ই মে ১৯৪৬ তার মতামত ঘোষণা করে।

৭৬. Anita Inder Singh: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮৭।

৭৭. *তদ্দেব,* পৃ. ১৮৭।

৭৮. *তদ্দেব,* পৃ. ১৯৬।

৭৯. *তদ্দেব,* পৃ. ১৯৮।

৮০. জ্যোতি বসু : *প্রাগুক্ত,* পৃ.-পৃ. ২২-৪৫।

৮১. Anita Inder Singh: *প্রাগুক্ত* পৃ.-পৃ. ২১৪-২১৫।

৮২. Rup Kumar Barman: *Partition of India and Its Impact on the Scheduled Castes of Bengal*, পৃ. ১১৯।

৮৩. Subhas C. Kashyap: *Our Constitution: An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law*; (New Delhi, NBT, 2007), পৃ. ২৮।

৮৪. Rup Kumar Barman: From Ethnographic Subject to Self-Respect Movement: The Scheduled Castes of Colonial Bengal in Historiographical Perspective, *The Quarterly Review of Historical Studies, Vol.LIV, Nos 3 & 4 (October 2014-2015)*, পৃ.পৃ. ৩৬-৩৭।

৮৫. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি*, পৃ.- পৃ. ১০০-১০২।

৮৬. *তদেব*, পৃ.-পৃ. ১৯-২০।

৮৭. *The Untouchability (offences) Bill, 1954- Bill No. 14B of 1954.*

৮৮. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি*, পৃ. ২২২।

৮৯. *তদেব*, পৃ. ২৩৩।

৯০. *তদেব*, পৃ. ২৪৯।

পঞ্চম অধ্যায়
স্বাধীনতা-পরবর্তী উত্তরবঙ্গ , আঞ্চলিকতা ও উপেন্দ্রনাথ বর্মনঃ ১৯৪৭-১৯৮৮

ভারতের স্বাধীনতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে 'বাংলার বিভাজন (১৯৪৭)' পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে এক নতুন মাত্রার সঞ্চার করে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, হিংসা ও ভয়ের বাতাবরণ পূর্ববাংলার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করায় পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের যাত্রা শুরু হয়। পূর্ববাংলার তপশিলি জাতির মানুষেরাও এই সমস্যা থেকে নিস্তার পাননি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে স্বাধীনতার প্রাক্কালে তপশিলি জাতিগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দলগুলোর (জাতীয় কংগ্রেস, সি.পি.আই ., হিন্দু মহাসভা) সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলায় তারা আলাদাভাবে কোনো রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে উচ্চবর্ণীয়দের সঙ্গে তারাও পূর্ববাংলা থেকে ভারতে আসতে শুরু করেন । স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববঙ্গে তপশিলি রাজনীতি হয়ে ওঠে অপ্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলায় তপ শিলি জাতির মধ্যেও বাংলা বিভাজনের অভিঘাতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির মধ্যে অভূতপূর্ব সংকটের বাতাবরণ তৈরী করেছিল। একই সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহা র রাজ্যের সংযুক্তিকরণ, পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার ও ভূমিবণ্টনের নীতি (১৯৫৩-১৯৬৯) এবং রাজবংশীদের আর্থসামাজিক অবক্ষয় তাদের মনে

আঞ্চলিক ভাবনার বীজ বপন করেছিল। বর্তমান অধ্যায়ে স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতির সংকট ও বিবর্তনের সঙ্গে আঞ্চলিকতার ও জাতীয় রাজনীতির অন্তর্বিরোধের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

৫.১.স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সংকট

স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জীবনে প্রধান সংকট তৈরী হয়েছিল তাদের সামাজিক পরিচিতির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। বিংশ শতকের গোড়ায় রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় আন্দোলন তাদের মধ্যে যে সামাজিক ঐক্য তৈরী করেছিল ঐ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে দলভিত্তিক নির্বাচনী রাজনীতি তাদের এই সামাজিক ঐক্যকে বহুভাবে বিভক্ত করে ফেলে। ১৯৪৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে এর প্রমান আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। রাজবংশীদের সামাজিক অনৈক্য স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আরো সংকটময় হয়ে ওঠে। প্রথমত রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রানকেন্দ্র (রংপুর ও দিনাজপুর) রয়ে যায় পূর্ববাংলায়। একইসঙ্গে পূর্ববাংলা থেকে রাজবংশী নেতৃবর্গের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় রাজবংশীদের মধ্যে একতাবদ্ধ সামাজিক পরিচিতি ধরে রাখা বা তৈরী করার মতো কোন সংগঠন ছিল না। পূর্ব বাংলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির পক্ষে পশ্চিমবাংলার রাজবংশীদের পরিচালনা করা আর কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় ক্ষত্রিয় সমিতির স্থানীয় শাখাগুলো (মণ্ডলী) পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে সামাজিক কাজকর্ম চালাতে থাকে। উপেন্দ্রনাথ ব   র্মনের নেতৃত্বে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির কয়েকটি শাখা

সংগঠন একত্রিত হয়ে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে দিনহাটায় 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি' নামে একটি নতুন সংগঠন তৈরী করেন ।[১] এই সমিতি ক্রমশ আসাম ও উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সামাজিক কাজকর্মের অন্যতম সামাজিক সত্তা হিসাবে উত্থিত হয়।[২]

অন্যদিকে কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গের স্থানীয় রাজবংশী সমাজ ও পূর্ববঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে আগত রাজবংশীগন কলকাতায় অবস্থিত 'বঙ্গীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির' তত্ত্বাবধানে একত্রিত হতে থা কেন। ১৯৪৩ এ তৈরী হওয়া [৩] এই সমিতিটি মূল ত রাজবংশীদের তপ শিলি জাতি পরিচিতির (Scheduled Caste Identity) প্রতি বে শি গুরুত্ব দিয়েছিল। রাজবংশীদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য অর্জন করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য।[৪] একইসঙ্গে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং ও পশ্চিম দিনাজপুরে র (বর্তমান উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুর) শিক্ষিত রাজবংশীগণ 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি' নামে নতুন করে আরেকটি সংগঠন তৈরী করেন। মনিভূষণ রায়ের নেতৃত্বে গঠিত এই সংগঠনটি ক্ষত্রিয় পরিচিতির আড়ালে রাজবংশীদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন কেই তার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহন করেছিল। [৫] অর্থাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি সংগঠন তৈরী হওয়ার ফলে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে সামাজিক একতার অভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।

আসামের রাজবংশীদের পরিচিতি হয়ে ওঠে আরোও সংকটময়। রাজবংশীগণ পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতি র (Scheduled Caste) স্বীকৃতি পেলেও আসামে তাদের নির্দিষ্ট কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছিল না। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাকা কালেলকারের (Kaka Kalelkar) নেতৃত্বে গঠিত কালেলকার কমিশনের (Kalelkar Commission বা First Backward Classes

Commission, 1953) সুপারিশ অনুযায়ী আসামের রাজবংশীদের Most Other Backward Class (MOBC) এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় পরিচিতি তাদের সামাজিক ঐক্যকে ধরে রাখতে পারেনি। ফলে তাদের পরিচিতির মধ্যে নতুন ভাবনা আসতে শুরু করে।

এই নতুন ভাবনাটি জাতি পরিচিতির বদলে রাজবংশীদের ভাষাগত পরিচিতিকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। উত্তরবঙ্গ ও আসামে সৃষ্ট রাজবংশীদের বিভিন্ন আর্থ -সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো [(উত্তরখণ্ড দল বা UKD, ১৯৬৯), উত্তরবঙ্গ তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সংগঠন (উৎজাস বা UTJAS, ১৯৭৬), কোচ-রাজবংশী ইন্টারন্যাশনাল (KRI, ১৯৮৬), ভারতীয় কামতা রাজ্য পরিষদ (BKRP, ১৯৮৬), ইত্যাদি] রাজবংশী বলতে রাজবংশী ভাষাগোষ্ঠীর প্রতি ইঙ্গিত করেছে। এদের মতে স্বাধীনতা -পরবর্তী রাজবংশী হল 'রাজবংশী, কোচ, মেচ, রাভা ও অন্যান্য তপশিলি জাতি-উপজাতি শ্রেণীর মানুষ যারা রাজবংশী ভাষায় কথা বলেন ।'[৬] অর্থাৎ 'রাজবংশী ভাষা গোষ্ঠী র' পরিধি ' রাজবংশী জাতির ' তুলনায় অনেক বড় । এই রাজবংশী জনগোষ্ঠি উত্তরবাংলার স্থানীয় মুসলমান ও কয়েকটি উপজাতি সমন্বয়ে গঠিত ' রাজবংশী ভাষাগোষ্ঠি' হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজবংশী পরিচিতি 'জাতির' (Caste) তুলনায় অনেক বেশি সাংস্কৃতিক (ভাষাভিত্তিক)।

রাজবংশীদের ভাষাভিত্তিক পরিচিতি নির্মানের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছিল ১৯৫৫ সালে সৃষ্ট রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (State Reorganization Commission)। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ভাষার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সীমানার পুনর্বিন্যাস শুরু করলে রাজবংশী অধ্যুষিত

বিহারের পুর্ণিয়া ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলাকে পশ্চিমবঙ্গে র সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানিয়েছিল উত্তরবঙ্গের 'শিলিগুড়ি আঞ্চলিক ক্ষত্রিয় সমিতি' | ১৯৫৫ র ৮ই এপ্রিল শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ায় অনুষ্ঠিত এই সমিতি বীরেন্দ্রনাথ রায় সরকারের নেতৃত্বে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে---

> "This meetings of Rajvanshi-kshatriya Samity (Siliguri Zone) is confident upon the Indian Constitution and believes in the re-organisation of states on linguistic base. So, this meetings further, resolves after proper deliberations that due to similarities prevailing in respect of dialects, culture, civilization and historical or geographical backgrounds the district of Purnea under Behar and the district of Goalpara under the state of Assam, which were formerly under the province of Bengal should come under the state of West Bengal. So the claim placed before the Boundary Commission by the Govt. of West Bengal is a legitimate one and fully supported by us in favour of merger of those two districts, Purnea of Behar and Goalpara of Assam into the State of West Bengal immediately."[৭]

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের জন্য আসামের রাজবংশীদের মধ্যেও সেই সময় রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। গৌরীপুরের রাজপরিবারের সন্তোষ বরুয়া ও প্রকিতেশ বরুয়া এবং সিদলির

রাজপরিবারের অজিত নারায়ণ গোয়ালপাড়া, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের জন্য ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের কাছে একটি পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি উত্থাপন করেছিল। তাই বলা যায় যে উত্তরবঙ্গের ও আসামে রাজনীতি সচেতন রাজবংশীগণ তাদের ভাষাভিত্তিক পরিচিতিকে রাজ্য গঠনের দাবিতে পরিণত করার প্রয়াস শুরু করেছিলেন।

১৯৬০এর দশকে বোম্বে প্রদেশ ভেঙ্গে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের জন্ম (১৯৬০) ও ভাষাভিত্তিক পাঞ্জাব ও হরিয়ানার জন্ম (১৯৬৬) হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীদের মনে তাদের ভাষার স্বীকৃতির দাবিকে জাগিয়ে তুলেছিল। এর বাস্তব পরিনতি রূপে ১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গে গঠিত হয় কামতাপুর রাজ্য সংগ্রাম পরিষদ (KRSP)। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অজিত নারায়ণ, গিরিজাশংকর রায়, প্রকিতেশ বরুয়া, শিবেন্দ্র নারায়ণ মণ্ডল ও বিপিন চক্রবর্তী। এদের মূল দাবি ছিল রাজবংশীদের ভাষা একটি নির্দিষ্ট এবং পৃথক ভাষা যার ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গে পৃথক রাজ্য তৈরী করা যেতে পারে।

১৯৬০ এর দশকে ভাষার রাজনীতিকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাজবংশীদের ভাষাকে অপমান ও অবজ্ঞা করার বিরুদ্ধে রাজবংশী বু দ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষাকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ ‘বাহে ভাষা’ হিসাবে চিহ্নিত করতেন । রাজবংশী ভাষার ‘বাহে পরিচিতি’ সাধারণ রাজবংশীদের কাছে চূড়ান্ত অপমান বলে মনে হত।[৮] এ প্রসঙ্গে রাজবংশী বুদ্ধিজীবী শ্রীকলিন্দ্রনাথ বর্ম্মন ‘উত্তরবঙ্গ’ নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখেছেন----

"উত্তরবঙ্গ, গোয়ালপাড়া এবং বিহারের পূর্ণিয়ার জেলার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী সম্প্রদায় এবং তাহাদের সমসাময়িক প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায়গণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠী হইতে পার্থক্য এত বিশিষ্টতাপূর্ণ যে, ইহাকে পৃথক একটি বিশুদ্ধ আর্য ভাষা বলিয়া ইংরেজ গবেষকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। স্যার জর্জ অ্যাব্রাহাম গ্রীয়ারসন ১৯২৭ সালে ইহাকে 'রাজবংশী ভাষা' বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন।

বিবেচক ও চিন্তাশীল বাঙালী সমাজ আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষাগত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বাঙালী বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুতেই রাজী নহেন। তাই তাহারা আমাদিগকে অহরহ 'বাহে' বলিয়া ব্যাপক ভাবে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের আবিষ্কৃত ও অ ভিহিত এই 'বাহে' শব্দটি উপহাস ছলে কিংবা অবজ্ঞা ভরেই বলিয়া থাকুক না কেন পার্থক্যতার ইহা এক স্বীকৃতি।"[৯]

অর্থাৎ 'পার্থক্য'কে (Difference) এখানে চালিকাশক্তি রূপে গ্রহণ করার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন রাজবংশী বুদ্ধিজীবী এই কলিন্দ্রনাথ বর্ম্মন। তিনি *'একটি বিরাট জিজ্ঞাসা ও বাঙালী না বাহে?* নামক পুস্তিকায় রাজবংশীদের 'বাহে পরিচিতিকে' গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এই কারণে যে 'বাহে' হিসাবে চিহ্নিত রাজবংশীদের ভাষা বাঙা লিদের থেকে আলাদা।[১০] তাঁর কথায়----

"আমাদের পার্থক্য ইংরেজ গবেষক এবং সর্বজন স্বীকৃত সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগনকে অগ্রণী হইতে অনুরোধ করি।"[১১]

সুতরাং আমরা লক্ষ করছি যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মধ্যে তাদের আত্মপরিচিতি নিয়ে তিনটি ধারার সৃষ্টি করেছিল। প্রথম ধারাটি ছিল রাজবংশী Sub-Caste (জাতি) হিসাবে তপশিলি জাতির সংরক্ষণের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীদের সার্বিক উন্নয়ন। দ্বিতীয় ধারাটি ছিল উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় পরিচিতির আড়ালে রাজবংশীদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াস। তৃতীয় ধারা টি ছিল উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ভাষাগত পরিচিতি নির্মান। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় এই পরস্পর বিরোধী ধারা রাজবংশীদের সামাজিক পরিচিতির সংকট তৈরী করেছিল। এই সংকটকে আরো গভীর করে তুলেছিল ১৯৪৭ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা, জনবিন্যাসের পরিবর্তন , রাজবংশীদের রাজনৈতিক সংকট ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার যা পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে।

৫.২.উদ্বাস্তু সমস্যা ও জনবিন্যাসের পরিবর্তন

১৯৪৭ এ বাংলা বিভাজনের পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। RedCliff Award অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচটি থানা (পঞ্চগড়, বোঁদা, তেঁতুলিয়া, পাটগ্রাম, দেবীগঞ্জ = ৬৭২ বর্গমাইল) পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) চলে যায়। দিনাজপুর জেলার দশটি থানা (বংশীহাড়ি, হেমতাবাদ, ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ, কুশমন্ডী,

কুমারগঞ্জ, রায়গঞ্জ, সংগ্রামপুর, তপন ও বালুরঘাট) পশ্চিমবাংলায় আসে বাকিটা পূর্ববাংলাকে দিয়ে দেওয়া হয়। মালদা জেলাতেও পাঁচটি থানা (ভোলাঘাট, গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ = ৫৯৬ বর্গমাইল) পূর্ব বাংলাতে চলে যায়। বা কি অংশ পশ্চিমবাংলায় থেকে যায়। উত্তরবঙ্গ থেকে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ দার্জিলিং জেলা পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। অন্যদিকে কোচবিহার দেশীয় রাজ্য ১৯৪৯ পর্যন্ত তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ফলে লক্ষ্য করা যায় যে বাংলা বিভাজনের পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত জেলাগুলোর বিভিন্ন থানা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববাংলায় ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার ফলে রাজবংশীদের আঞ্চলিক একতায় বাধার সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলা থেকে রাজবংশী সহ অন্যান্য হিন্দু (ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু) সম্প্রদায় পশ্চিমবাংলায় দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে যা উত্তবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলোতে জনসংখ্যা অতিদ্রুত গতিতে বাড়াতে শুরু করে। জনসংখ্যার এই চাপ থেকে কোচবিহারও মুক্তি পায় নি। ১৯৪৯ র ২৮ শে আগষ্ট এক চুক্তি অনুযায়ী কোচবিহার রাজ্য ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়।[১২] এবং ১৯৫০ এর ১লা জানুয়ারী কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়।[১৩] ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়।

সারণী : ৫.১ উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (আদমশুমারি অনুযায়ী)।

আদমশুমারি	পশ্চিমবঙ্গ	উত্তরবঙ্গ
১৯৫১-৬১	৩২.৮০%	৪০.৪৯%
১৯৬১-৭১	২৬.৮৭%	৩৩.০১%
১৯৭১-৮১	২৩.১৭%	২৭.৬৩%

তথ্যসূত্র: *আদমশুমারি , ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭১ ও ১৯৮১।*

জনবিন্যাসের পরিবর্তন সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে আদম শুমারির তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৬১.৯০% এবং ১৯৭১-৮১ এর দশকে এই হার ছিল ৬৬.৮৩% অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রথম তিন দশকে রাজবংশীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল অস্বাভাবিক যা তাদের পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম বঙ্গে চলে আসার বক্তব্যকে সমর্থন করে। এপ্রসঙ্গে এটা ও উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গের গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকে প্রতিটি দশকে বেশি ছিল (সারণী ৫.১ দেখুন) । এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উত্তরবঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের আশ্রয় গ্রহণের হার শতাংশের হিসাবে বেশী ছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। যদিও পূর্ববাংলা থেকে রাজবংশীদের একটা অংশ উত্তরবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিন্তু সার্বিক ভাবে শতাংশের হিসাবে উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মোট জনসংখ্যা কমতে শুরু করে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারে রাজবংশীদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৭% যা ১৯৮১ তে কমে দাঁড়ায় ৪০.৯৬% এ। জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৯৫১ সালে মোট জনসংখ্যা র ৩২.৬৮% ছিল রাজবংশী যা ১৯৮১ র আদমশুমারিতে কমে দাঁড়ায় ২৯% এ। তবে দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় মোট জনসংখ্যার তুলনায় রাজবংশীদের জনসংখ্যা কমেনি। কিন্তু এই জেলাগুলোতে রাজবংশীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় অতি সামান্য [দার্জিলিং ৩.৬% (১৯৮১), মালদা ৪.৭৯% (১৯৮১), পশ্চিম দিনাজপুর ২১.১৬ (১৯৮১)]।

জনবিন্যাসে পরিবর্তনের ধারা উত্তরবঙ্গের স্থানীয় রাজবংশীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংকটকে আরোও ঘনীভূত করতে শুরু করে। এখানকার স্থানীয় মানু ষেরা (উত্তরবঙ্গের আদিবাসিন্দা যারা পূর্ববাংলার লোক নন) উদ্বাস্তু ও বাইরে থেকে আসা মানুষদের তুলনায় ক্রম শ দুর্বল হতে থাকে। কারণ বহিরাগতরা এখানকার অর্থনীতি , রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রন করতে শুরু করে। তাই উত্তরবঙ্গ ও আসামে সৃষ্ট রাজবংশীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো উত্তরবঙ্গের 'স্থানীয়/দেশীয়দের' বেশি অধিকারের দা বিকে সামনের সারিতে নিয়ে আসে। এমনকি কয়েকটি সংগঠন 'উদ্বাস্তু' বা 'ভাটিয়া' (Immigrants) দের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে শুরু করেছিল ১৯৫০ এর দশক থেকে। এপ্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি সংগঠনের কথা বলতে পারি যেমন-'শিলিগুড়ি আঞ্চলিক ক্ষত্রিয় সমিতি' (১৯৫৫), কামতাপুর রাজ্য সংগ্রাম পরিষদ (১৯৬৭), উত্তরখন্ড দল (১৯৬৯) , ইত্যাদি। উত্তরখন্ড দল ১৯৮১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে----

> The immediate effects of the partition, as is now well known, was the huge influx of refugees from the then East Pakistan. Other states in India adjoining East Pakistan namely Bihar, Orissa and Assam had their reservation in the matter of acceptance of number of refugees and their rehabilitations. But West Bengal had to throw its border open and its arms of welcome wide to receive the East Pakistan refugees as they were known as one

nation, viz., the Bengalees, during the pre-partition days. W. Bengal could not protest or shirk its responsibility. Hence North Bengal which happened, because of a chance of historical circumstances, to be part of West Bengal could not also raise its voice of objection and had been forced by the command of history to fall in line with W.Bengal in its endeavour to accommodate the refugees. As a result, North Bengal had to live with a chunk of People alien to its customs, language and culture.[১৪]

উদ্বাস্তুদের প্রতি উত্তরখন্ড দলের এই মনোভাবকে উত্তরবঙ্গ তপ শিলি জাতি ও আদিবাসী সংগঠন(উৎজাস, ১৯৭৭), ভারতীয় কোচ রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভা (১৯৮৪) ও কোচ রাজবংশী ইন্টারন্যাশনাল (১৯৮৬) প্রভৃতি সংগঠন সমর্থন জানিয়েছিল। [১৫] ফলে উদ্বাস্তুদের আগমন ও উত্তরবঙ্গে তাদের প্রভুত্ব স্থাপনের প্রতিক্রিয়া উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মানসিকতায় প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছিল।

৫.৩.রাজনৈতিক পরিবর্তন, ভূমিসংস্কার ও রাজবংশীদের আর্থসামাজিক সংকট

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলা বিভাজনজনিত উদ্বাস্তু সমস্যার প্রেক্ষাপটে রাজবংশীদের পরিচিতির সংকট উত্তরবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্ত নে নতুন গতির সৃষ্টি করেছিল। রাজনৈতিক

ক্ষেত্রে, বিভাজন -পরবর্তী সময় (১৯৪৭) থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মোট সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ জন । এদের মধ্যে ছিলেন তিনজন উচ্চবর্ণীয় হিন্দু, দুইজন তপশিলি জাতির সদস্য, চারজন মুসলমান ও একজন শ্রমিক সদস্য। ১৯৫০ এ কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গে যোগদান করায় কোচবিহার থেকে দুজন নতুন সদস্য (উমেশচন্দ্র মণ্ডল ও সতীশচন্দ্র সিংহসরকার) পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় গৃহিত হয় । ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট ১০ জন সদস্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সরকার যাত্রা শুরু করে। এই সরকারে দুইজন তপশিলি জাতির সদস্য স্থান পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মোহিনীমোহন ব র্মন (জলপাইগুড়ি)। তিনি দায়িত্ব পেয়েছিলেন Judicial and Legislative দপ্তরে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ায় মোহিনীমোহন বর্মন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের দায়িত্ব পান। ১৯৪৯ এ র ১লা জানুয়ারী মোহিনীমোহন বর্মনের মৃত্যু হওয়ায় উত্তরবঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ বর্মন। দিনাজপুর-মালদা থেকে নির্বাচিত রাজবংশী জাতির শ্যামাপ্রসাদ বর্মনকে ভূমি ও ভূমিসংস্কারের পরিবর্তে আবগা রি দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫১ সালের ১১ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার রদবদল হওয়ার পরেও তিনি মন্ত্রীসভায় তার স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২র জানুয়ারী মাসে। মোট ২৪০টি আসনের মধ্যে (২৩৮ নির্বাচিত+২অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান) উত্তরবঙ্গের আসন সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬টি। এর মধ্যে ৬টি আসন ছিল তপ শিলি জাতির জন্য

সংরক্ষিত। দার্জিলিং জে লায় তপ শিলি জাতির জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না। জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ১০টি আসনের মধ্যে তপ শিলিদের জন্য দুটো আসন সংরক্ষিত ছিল (জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি)।   এই সংরক্ষিত আসনে   যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন রাজবংশী। এদের মধ্যে জলপাইগুড়ি আসনে অশ্রুমতি দেবী ও ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে সুরেন্দ্রনাথ রায় কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। এমনকি সেন্ট্রাল ডুয়ার্স সাধারণ (অসংরক্ষিত) আসনে রাজবংশী জাতির যজ্ঞেশ্বর রায় কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জেলায় রাজবংশীগণ মোট তিনটি আসনে জয়ী হয়েছিলেন।

অন্যদিকে কোচবিহার জেলায় মোট ছয়টি আসনের মধ্যে দুটো আসন (কোচবিহার ও দিনহাটা) ছিল তপ শিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। কোচবিহার সংরক্ষিত আসনে একজন (বৈজনাথ বিশ্বকর্মা) বাদে বা কিরা সবাই ছিলেন রাজবংশী জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের মধ্যে বিজয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের জ্যোতিন্দ্রনাথ সিংহসরকার। সি.পি.আই.প্রার্থী দীনেশচন্দ্র সিংহ দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন। দিনহাটা সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত আসনেও রাজবংশীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। দিনহাটা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী উমেশচন্দ্র মণ্ডল ও সতীশচন্দ্র রায়সিংহ উভয়েই ছিলেন রাজবংশী জাতির কংগ্রেস প্রার্থী। মাথাভাঙ্গা অসংরক্ষিত আসনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এদের মধ্যে একজন বাদে (ক্ষিতিশচন্দ্র নাগ) বা   কি সবাই ছিলেন রাজবংশী । এখানে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের সারদা প্রসাদ প্রামানিক। অর্থাৎ কোচবিহার জেলার মোট ছয়টি আসনের মধ্যে চারজন রাজবংশী বিধায়ক কংগ্রেস প্রার্থী রূপে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় (বর্তমানের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা) মোট ছয়টি আসনের মধ্যে তপশিলিদের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল মাত্র একটি আসন (রায়গঞ্জ) । এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের শ্যামাপ্রসাদ বর্মন । ইনিও ছিলেন রাজবংশী জাতির উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস নেতা । অন্যদিকে মালদা জেলার মোট নয়টি আসনের মধ্যে একটি আসন ছিল তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত (মালদা আসন) । এখানে জয়ী হয়েছিলেন নির্দল প্রার্থী রাইপদ দাস।

ফলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত মোট ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতেই জয়ী হয়েছিলেন রাজবংশী নেতৃবর্গ। দলগতভাবে এরা সবাই ছিলেন কংগ্রেসের প্রার্থী। একই সঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গে অসংরক্ষিত আসনেও রাজবংশী জাতির তিনজন কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীগণ সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রনে চলে যান (যদিও রাজবংশীদের মধ্য থেকে বামপন্থী দলগুলোতে যোগ দেওয়ার প্রবণতা এই সময় তৈরী হয়েছিল)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫২ সালে লোকসভার নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের মোট ছয়টি আসনের মধ্যে সবকটিতেই কংগ্রেস দল জয়লাভ করেছিল। এদের মধ্যে রাজবংশী জাতির উপেন্দ্রনাথ বর্মন সর্বাধিক ভোট পেয়ে উত্তরবঙ্গ আসনে বিজয়ী হয়েছিলেন। [১৬] উপেন্দ্রনাথ বর্মন উত্তরবঙ্গের কংগ্রেসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় রাজবংশীদের কংগ্রেস দল বা জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ভাবনায় যোগদিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে। এই সময় বিধানসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৬ তে (২৫২ নির্বাচিত+৪জন মনোনীত) যার মধ্যে উত্তরবঙ্গে ছিল মোট ৪৫টি আসন। এদের মধ্যে তপ শিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ এ। (কোচবিহার -৩, জলপাইগুড়ি-২, পশ্চিম দিনাজপুর -১ এবং মালদা -১)। দার্জিলিং জেলায় তপশিলিদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন না থাকলেও শিলিগুড়ি (সাধারণ) আসনে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নেতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়সরকার নির্দল প্রার্থী হিসাবে ৯৮২৩টি ভোট পেয়েছিলেন (১১.৭৯% ভোট)। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বীরেন্দ্রনাথ রায়সরকারের নেতৃত্বে শিলিগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশীগণ স্বাধীনতা পরবর্তী ক্ষত্রিয় আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। অর্থাৎ রাজবংশীদের জাতিভিত্তিক চেতনা এখানে সি.পি.আই . ও কংগ্রেসের সমান্তরাল ভাবধারা রূপে প্রবাহিত ছিল। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি জেলার তপ শিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসন (জল পাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি) এর প্রতিদ্ব ন্দ্বীগণ সবাই ছিলেন রাজবংশী। জলপাইগুড়ি আসনে কংগ্রেসের সরোজেন্দ্রদেব রায়কত তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পি.এস.পি. (প্রজা সোশালিস্ট পার্টি) র হেরম্ভদেবকে পরাজিত করেন। একইভাবে ময়নাগুড়ি আসনে কংগ্রেসের যজ্ঞেশ্বর রায় পি.এস.পি. র নগেন্দ্রনাথ মল্লিককে পরাজিত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ফালা কাটা অসংরক্ষিত আসনে রাজবংশী জাতির পি.এস. পি. প্রার্থী জগদানন্দ রায় কংগ্রেসের রবীন্দ্রনাথ সিকদারকে পরাজিত করেছিলেন। এখানে লক্ষণীয় যে কংগ্রেস বিজয়ী হলেও জলপাইগুড়ি জেলায় রাজবংশীদের মধ্যে পি.এস.পি . দলে অংশগ্রহণের প্রবনতা ছিল। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে ১৯৫২ র নির্বাচনের তুলনায় ১৯৫৭ র নির্বাচনে

জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশীগন কেবল মাত্র সংরক্ষিত আসনেই জয়ী হয়েছিলেন । তবে কোচবিহার জেলার ফলাফল ছিল খানিকটা ভিন্ন । এখানে মোট সাতটি আসনের মধ্যে ৩টি ছিল তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত । এই সবকটি আসনই (কোচবিহার, দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গা) কংগ্রেসের পক্ষে যায়। এই আসনের বিজয়ী প্রার্থীগণ (সতীশচন্দ্র রায় সিংহ, উমেশচন্দ্র মণ্ডল ও সারদা প্রসাদ প্রামানিক) সবাই ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসী নেতা । এছাড়াও তুফানগঞ্জ সাধারণ আসনে রাজবংশী জাতির কংগ্রেস প্রার্থী যতীন্দ্রনাথ সিংহ সরকার ৬৪.৩৮% ভোট পেয়ে অ-রাজবংশী সি.পি.আই . প্রার্থী জীবনকৃষ্ণ দেকে পরাজিত করেছিলেন। অর্থাৎ কোচবিহারের রাজবংশীগন মোট ৪টি (৩+১) আসনে কংগ্রেসের হয়ে জয়ী হয়েছিলেন । ১৯৫৭ এর নির্বাচনে কোচবিহার জেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে বামপন্থী দলগুলি বিশেষ করে সি.পি .আই. ও এফ.বি.এম . (মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক) রাজবংশীদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রভাবিত করতে থাকে। কোচবিহার ও মেখলিগঞ্জ আসনে জয় লাভ না করলেও দীনেশচন্দ্র কার্জী ও অমরেন্দ্রনাথ রায়প্রধান যথাক্রমে ২০.১৫% ও ৩২.০৫% ভোট পেয়েছিলেন (যারা উভয়েই ছিলেন রাজবংশী শিক্ষিত শ্রেনীর প্রতিনিধি)।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ৭টি আসনের মধ্যে কেবলমাত্র রায়গঞ্জ আসনটি তপ শিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হয়েছিল। এই আসনে রাজবংশী জাতির কংগ্রেস প্রার্থী তথা পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীসভার সদস্য শ্যামাপ্রসাদ বর্মন ২৪.৬২% ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। এখানে অন্য দুইজন তপশিলি প্রার্থী সি.পি.আই. এর পীযুষকান্তি দাস ও নির্দল প্রার্থী যতীন্দ্রনাথ প্রামানিক ১৫% করে ভোট পেয়েছিলেন। অ নুরূপভাবে মালদা জেলার তপ শিলি জাতির জন্য

সংরক্ষিত একটি আসনেও (রতুয়া) জয়লাভ করেন কংগ্রেস প্রার্থী ধনেশ্বর সাহা। এই আসনেও সি.পি.আই. প্রার্থী উল্লেখযোগ্য সফলতা পেয়েছিলেন।[১৮] কিন্তু এই তপশিলি প্রতিদ্বন্দ্বিদের কেউই রাজবংশী ছিলেন না।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনের সার্বিক মূল্যায়ন করে বলা যায় যে উত্তরবঙ্গে র তপ শিলি সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত আসনগুলোর প্রত্যেকটি কংগ্রেসের পক্ষে গেলেও এমনকি অসংরক্ষিত তিনটি আসনে রাজবংশী কংগ্রেসী নেতৃবর্গ জ য়লাভ করলেও বামপন্থীদলগুলি (সি.পি.আই . মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, পি.এস. পি.) উত্তরবঙ্গে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অর্থাৎ কংগ্রেস ক্রমশ উত্তরবঙ্গের তপ শিলিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকে যা ১৯৬২ সালের নির্বাচনের সময়ে প্রকটিত হয়ে ওঠে।

উত্তরবঙ্গের তপশিলিদের সংরক্ষিত আসনে বামপন্থীদের প্রথম সফলতা আসে ১৯৬২ সালের নির্বা চনের সময়। কোচবিহার (দক্ষিণ) ও শীতলকুচি আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী যথাক্রমে বিজয়কৃষ্ণ রায় ও সুনীল বসুনীয়া কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজিত করে 'কংগ্রেস বিরোধী' রাজনৈতিক মতাদর্শকে বাস্তব রূপ দান করেন। একই সঙ্গে এটা ও উল্লেখযোগ্য যে মেখলিগঞ্জ সাধারণ আসনে তপ শিলি জাতির ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী শ্রীঅমরেন্দ্র রায়প্রধান কংগ্রেসের উচ্চবর্ণীয় প্রার্থী শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে পরাজিত করে প্রমান করে ন যে ফরওয়ার্ড ব্লকে রাজবংশী জাতি ক্রমশ নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য পাঁচটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস অবশ্য তার জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিল।[১৯] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলি

(সি.পি.আই. ফরওয়ার্ড ব্লক, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি . ও আর.সি.পি.আই .) কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য United Left Front (ULF) গঠন করে এবং বিধান সভায় ৭৭টি আসন দখল করে।[২০]

১৯৬২র বিধানসভার নির্বাচনের কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়ার প্রভাব পড়েছিল লোকসভার নির্বাচনেও। কোচবিহার তপ শিলি আসনে কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মন ফরওয়ার্ড ব্লকের দেবেন্দ্রনাথ কার্জীর কাছে পরাজিত হন।[২১] অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উপেন্দ্রনাথ বর্মন উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের যেভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তা ১৯৬২ সালে দূর্বল হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই রাজবংশীদের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও পরস্পরবিরোধী মনোভাব জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। এই জটিলতা চলাকালীন সময়ে উপেন্দ্রনাথ বর্মন লোকসভা বা বিধানসভায় স্থান না পেয়ে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদে প্রবেশ করেন। এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের শেষ পর্যায়ে উপেন্দ্রনাথ বর্মন ছিলেন (১৯৬৫-১৯৬৯) শেষ Deputy Chairman।[২২]

১৯৬২র নির্বাচনের পরে বামপন্থীদের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের চূড়ান্ত মতপার্থক্য সৃষ্ট হয় চীন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। কলকাতায় বামপন্থী নেতৃবর্গকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং তাদের অনেককে ১৯৬৩ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রেপ্তার করে রাখা হয়। সি.পি.আই . এর সংশোধনবাদীদের সঙ্গে কট্টর মনোভাবাপন্ন বামপন্থীদের মতপার্থক্য বিধানসভায় বাম সদস্যদের দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলে। আদর্শগত সংঘাত শেষপর্যন্ত সি.পি.আই.র মধ্যে ভাঙ্গন ধরায় এবং

১৯৬৪ তে সি.পি.আই. থেকে বেড়িয়ে গিয়ে একদল বামপন্থী সি.পি.আই. (এম) দলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৪ এর ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সি.পি.আই.(এম)র পার্টি কংগ্রেসে এই দলের রাজ নৈতিক কর্মসূচী গৃহীত হয়। [২৩] অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় পশ্চিম বঙ্গের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের দামামা বেজে ওঠে।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার চতুর্থ সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন নানাবিধ কারণে অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। প্রথমত , সদ্যগঠিত (১৯৬৪) সি.পি.আই.(এম)র কাছে এটা ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। দ্বিতীয়ত , কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ফলে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলা কংগ্রেস (B.Cong) পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করে। তৃতীয়ত , বামপন্থী ও ডানপন্থী দলগুলি নিজ নিজ স্বার্থের কথা ভেবে দুটো জোটে সামিল হয়। প্রথম জোটটি হল সি.পি.আই.(এম)র নেতৃত্বে গঠিত United Leftist Front (ULF বা সি. পি. আই. (এম), আর. এস. পি. , এস.এস.পি., এস.ইউ. সি. আই., ডবলু. পি. আই., ও এম.এফ. বি. এর জোট)। দ্বিতীয়টি ছিল বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে সৃষ্ট Peoples' United Left Front (PULF) যেখানে বাংলা কংগ্রেস, সি.পি.আই., ফরয়ার্ড ব্লক, ইত্যাদি সামিল হয়েছিল।

১৯৬৭ র নির্বাচনের সময় উত্তরবঙ্গে মোট আসন ছিল ৫৫টি যার মধ্যে ৯টি আসন তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল (কোচবিহার-৪, জলপাইগুড়ি-৩, ও উত্তর দিনাজপুর-২)। কোচবিহারের ৪টি তপশিলি জাতির সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ২টো যায় কংগ্রেসের পক্ষে আর

ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি.পি.আই. (এম) একটি করে আসন পায়। অন্যদিকে জলপাইগু ড়ির তিনটি তপশিলি জাতির আসন কোনটাই কংগ্রেসের পক্ষে যায়নি। এখানে পি.এস.পি., এস.এস.পি. ও বাংলা কংগ্রেস একটি করে আসন পায়। কেবলমাত্র পশ্চিম দিনাজপুরের আসন দুটো যায় কংগ্রেসের পক্ষে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের কংগ্রেসের প্রবল প্রতিদ্ব ন্দ্বী হিসাবে বামপন্থী দলগুলির উত্থান ঘটে।

নির্বাচনোত্তরকালে ULF ও PULF একসঙ্গে মিশে গিয়ে তৈরী করে United Front (UF)বা যুক্তফ্রন্ট। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। সি.পি.আই. (এম)র জ্যোতি বসু হন তার উপমুখ্যমন্ত্রী। এই সরকারে বামপন্থীদলগুলি বিশেষ করে সি.পি.আই. (এম), ফরওয়ার্ড ব্লক, এস.ইউ.সি. প্রধান মন্ত্রকগুলো দখল করেছিল। বামপন্থী মন্ত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হেমন্তকুমার বসু (Public Works and Housing), হরেকৃষ্ণ কোঙার (Land and Land Revenue), ননী ভট্টাচার্য্য (Health), সুবোধ ব্যানার্জী (Labour), ইত্যাদি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই মন্ত্রীসভায় রাজবং শী জাতির কোন প্রতিনিধি ছিল না যদিও উত্তরবঙ্গ থেকে ননী ভট্টাচার্য্য (আর.এস.পি .--আলিপুরদুয়ার), ও নিশীথনাথ কুণ্ড (পি.এস.পি. --রায়গঞ্জ) এই মন্ত্রীসভায় উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছিলেন। এমনকি এই মন্ত্রীসভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব ছিল খুব কম। ১৯ জন পূর্ণমন্ত্রীর মধ্যে তপ শিলি জাতির একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন বাংলা কংগ্রেসের চারু মিহির সরকার (হাঁসখালি বিধানসভা র বিধায়ক)। তবে উপমন্ত্রী হিসাবে ফালাকাটা থেকে নির্বাচিত রাজবংশী জাতির জগদানন্দ রায়

(পি.এস.পি.) এই মন্ত্রীসভায় 'তপশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যান দপ্তরের (Department of Scheduled Caste and Tribal Welfare) দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জনগণের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। এই সরকারের মন্ত্রীরা সদাচারী, মিতব্যয়ী ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন উপহার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এই সরকার ১৮দফা যৌথ কর্মসূচী নিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছিল।[২৪] এই কর্মসূচীগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজমির খাসকরণ ও খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ। ভূমিদপ্তরের মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার হয়ে উঠেছিলেন খাসজমি বিতরণের প্রধান ব্যক্তিত্ব। কৃষিনির্ভর পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীন কৃষক , ভাগচাষী ও কৃষি মজুরদের মধ্যে জমি বিতরণের পদক্ষেপ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করলেও বামপন্থীদের তথাকথিত 'শ্রেণী-সংগ্রাম' (Class Struggle) এর এই পদক্ষেপ সকলের মনঃপুত ছিলনা। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী সহ বাংলা কংগ্রেস ও ভূমির মালিকগণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই নীতিকে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি র পদক্ষেপ হিসাবে মনে করতো।[২৫] যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভ্যন্তরীন গোলযোগ ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে রাজ্যের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে। [২৬] ড. ঘোষ ১৭জন বিধায়ক নিয়ে ২রা নভেম্বর ১৯৬৭ রাজ্যপালের কাছে জানালেন যে তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।[২৭] এমতাবস্থায় অজয় মুখার্জী র যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রয়োজনীয় বিধায়কের অভাবে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ড.প্রফুল্ল ঘোষ প্রগেসিভ ডেমো ক্রেটিক পার্টি (Progreesive Democratic Party বা পি.ডি.পি.) নামে একটি নতুন দল তৈরী করে কংগ্রেসের সমর্থনে

পশ্চিমবাংলায় মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য দরবার শুরু করেন। শেষপর্যন্ত ২১শে নভেম্বর (১৯৬৭) অজয় মুখার্জীর যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। ঐ দিনই প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন সরকার।[২৮] প্রফুল্ল ঘোষের সরকার প্রথম থেকেই গণআন্দোলন, ছাত্র -শ্রমিক বিক্ষোভ ও উগ্র বামপন্থার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ফলে তার সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে একটি রাজনৈতিক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সরকার তৈরী হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বিধানসভার স্পীকার, বিধানসভার অধিবেশন অনিষ্টকালের জন্য মুলতু বি করে দেন (২৯শে নভেম্বর, ১৯৬৭)। ফলে প্রফুল্ল ঘোষের সরকার বিধানসভায় তার আস্থা অর্জনের কোনো সুযোগই পায়নি। তুমুল গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে চলতে থাকা এই সরকারের অবসান ঘটে ২০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ তে। পশ্চিমবঙ্গে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন এবং এই রাজ্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যায়।[২৯]

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ১২৭ থেকে কমে গিয়ে ৫৫তে দাঁড়ায়। অন্যদিকে সি.পি.আই .(এম) র আসন সংখ্যা ৪৩ থে কে ৮০ তে পৌঁছে যায়। বাংলা কংগ্রেস তার আসন সংখ্যা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল (১৯৬৭ তে ছিল ৩৪ এবং এখনো হল ৩৩)। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির প্রাপ্ত আসন সংখ্যাও (১৯৬৭র তুলনায়) এই সময় বেড়ে গিয়েছিল। সি.পি. আই. (এম) এই সময় হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গে র সর্ববৃহৎ রাজ নৈতিক দল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ৪৫টি আসনের মধ্যে সি.পি.আই . (এম) এমনকি যুক্তফ্রন্ট এর সফলতা ছিল উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। বরং কংগ্রেস তার আধিপত্যকে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। কংগ্রেস এখানে ৪৫টির মধ্যে ২২টি আসন পায়। অন্যান্য বামপন্থীদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক

৩টি, আর.এস.পি. ৪টি, সি.পি.আই. ৩টি আসন পেয়েছিল। আর সি.পি.আই. (এম) উত্তরবঙ্গে পেয়েছিল মাত্র ২টি আসন। উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের সফলতা বা সি.পি.আই .(এম)এর বিফলতার প্রধান কারণ ছিল যুক্তফ্র ণ্টের ঘোষিত ভূমিসংস্কার নীতি যাকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জোতদার এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ মেনে নিতে পারে ননি। নির্বাচনের পূর্বে যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে ভূমিসংস্কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে----

(১) কৃষকের স্বার্থে বর্তমান সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন এবং ভূমিসংস্কার আইনগুলিকে উপযুক্তভাবে সংশোধন করবে।

(২) তিন একরের কম জমি যাদের আছে সেই সকল কৃষকদের ভূমিরাজস্ব মুকুব করা হবে।

(৩) পরিবারের আয়তন অনুযায়ী কৃষক পরিবারের কৃষিজমির উর্ধসীমা নির্ধার ণ করা হবে।

(৪) জমির উর্ধ্বসীমার বাইরে সকল বেনামি জমি চিহ্নিত, উদ্ধার এবং বণ্টন করা হবে।

(৫) ভূমিহীন এবং গরীব কৃষকদের মধ্যে স্থায়ীভাবে উদ্বৃত্ত ও খাসজমি বিতরণ করা হবে।

(৬) বর্গাজমিতে ভাগচাষীদের চাষের অধিকার স্বীকার করা হবে।

(৭) সার্বিক আইন সাপেক্ষে তিন বছরের জন্য বর্গা উচ্ছেদ বন্ধ থাকবে, ইত্যাদি।[৩০]

ভূমিসংক্রান্ত এই সমস্ত ঘোষণা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুরে রাজবংশী জোতদারদের যুক্তফ্রন্ট বিরোধী ভূমিকা পালন করতে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাই ল ক্ষ করা যায় যে ১৯৬৭ এর নির্বাচনে মাথাভাঙ্গা আসনে জয়ী সি.পি.আই. (এম) প্রার্থী শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হচ্ছেন। একইভাবে ১৯৬৯ এর নির্বাচনে দিনহাটা আসনে ফরওয়ার্ড ব্লকের কমলকান্তি গুহ কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হচ্ছেন। কোচবিহার পশ্চিম আসনে কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিত বর্মন ১৯৬৭ এর তুলনায় ১৯৬৯ এ অনেকবেশি ভোট পেয়ে পুনঃনির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে ১৯৬৯ এর নির্বাচনে মেখলিগঞ্জ আসনে অমর রায়প্রধানের (ফরওয়ার্ড ব্লক) ভোট পাওয়ার মাত্রা অনেক কমে যায়। একই সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা আসনে ভোটের হাওয়া উপলব্ধি করে পি.এস.পি. এর জগদানন্দ রায় ১৯৬৯ এ কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এই আসনটিকে কংগ্রেসের পক্ষে নিয়ে যান । অনুরূপভাবে ময়নাগুড়ির আসনটি বাংলা কংগ্রেসের হাত থেকে কংগ্রেস ছিনিয়ে নেয়। একইসঙ্গে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ আসনটি এস.এস.পি . এর থেকে কংগ্রেস নিজের পক্ষে নিয়ে যায়।[৩১] জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও পশ্চিম দিনাজপুরের তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি তে (মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার (পশ্চিম), তুফানগঞ্জ, ফালাকাটা, ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ ও কুশমণ্ডী) একটি বাদে সবকটিতেই কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। অর্থাৎ এনিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার বিশেষকরে ভূমিসংস্কারের ঘোষণা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের কংগ্রেসমুখী বা যুক্তফ্রন্ট বিরোধী করে তুলেছিল।

যাইহোক ১৯৬৯ এ ২৫শে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। বাংলা কংগ্রেস কম আসন পেলেও অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন , জ্যোতি বসু ছিলেন তার উপমুখ্যমন্ত্রী ও হরেকৃষ্ণ কোঙার হয়েছিলেন তার ভূমিসংস্কার মন্ত্রী। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী বিধায়কগণ (একজন বাদে) সকলেই ছিলেন কংগ্রেস দলের। তাই রাজবংশীদের কোনো প্রতিনিধি দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারে ছিল না যা পশ্চিমবঙ্গে আমুল ভূমিসংস্কারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

নির্বাচন পরবর্তীকালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কা রের প্রক্রিয়া পুনরায় পূর্ণ মাত্রায় শুরু করে। একই সঙ্গে বেনা মি ও সরকারি যেসমস্ত জমি জোরদাররা আত্মসাৎ করে রেখেছিল তার উদ্ধারের জন্য পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করেছিল এই সরকার । তৎকালীন উপমূখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দেওয়া তথ্য অনুসারে হরেকৃষ্ণ কোঙারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রায় আট লক্ষ বিঘে জমি গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের দখল নিতে সহায়তা করেছিল। [৩২] সরকারি তথ্য অনুসারে ১৯৬৭-৭০ এর মধ্যে দশ লক্ষ একর জমি সরকার খাস করতে সক্ষম হয়েছিল।[৩৩] ভূমিসংস্কারের এই পদক্ষেপ উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জীবনযাত্রায় এক বড় ধরনের সংকটের সৃষ্টি করে। কৃষিনির্ভর জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের রাজবংশী জোতদারগণ এর বিরুদ্ধে সরব হন। কারণ এই জেলার কৃষিজমির মালিকানা ছিল এদের হাতে ই বেশি। দ্বিতীয়ত খাস জমির বিতরণে রাজবংশী ভাগচাষীদের চেয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অ-রাজবংশী কৃষিশ্রমিক ও ভাগচাষীর সংখ্যা ছিল বেশি। ফলে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনমানসে এই ধারণার সৃষ্টি হতে থাকে যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার নীতি রাজবংশী জোতদার শ্রেণীর বেঁচে

থাকার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। তাদের এই ধারণা আর ও বদ্ধমূল হয়েছিল এই কারনে যে 'যুক্তফ্রন্ট সরকারে তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই। ফলে তাদের সমস্যা সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা ও নেই'। তাই তাদের একমাত্র পরিবর্ত হতে পারে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি যা তাদের দা বিসমূহকে সরকার তথা জনগণের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়েই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং এর রাজবংশীগণ উত্তরখণ্ড দল (UKD) নামের একটি রাজ নৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন যা ক্রমশ আর্থ-সামাজিক সমস্যার মোকাবিলার জন্য আঞ্চলিকতার পথে ধাবিত হয়। এই বিষয়টি এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

৫.৪. উত্তরবঙ্গে আঞ্চলিকতার বিকাশ

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের আঞ্চলিকতার দিকে যাত্রা শুরু হয় **১৯৬৯** এ উত্তর খণ্ড দল (Uttarkhanda Dal, UKD) গঠনের মধ্য দিয়ে। **১৯৭০** ও **৮০**র দশকে উত্তরবঙ্গে আরো ও কয়েকটি আঞ্চলিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলি হল 'উত্তরবঙ্গ তপ শিলি জাতি ' ও 'আদিবাসী সংগঠন (উৎজাস)' , 'ভারতীয় কোচ -রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভা ' ও 'কামতাপুর পিপলস্ পার্টি' (KPP বা কে. পি. পি.) ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গে একটি ভাষাভিত্তিক পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি নিয়ে রাজনৈতিক

আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আঞ্চলিকতার এই ধারা কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনীতির মধ্যে রাজবংশীদের পৃথক সত্তার দাবিকে উত্থাপিত করেছিল।

৫.৪.১.উত্তরখণ্ড দল (UKD)

উত্তরখন্ড দলের জন্ম হয়েছিল ১৯৬৯ এর ৫ই জুলাই। ধূপগুড়ির ঠাকুরপাট রাজমোহন জুনিয়ার হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তবে এই দলের উত্থানের প্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছিল ৩১শে মে ১৯৬৯ এ ময়নাগুড়ির চরেরবাড়ী গ্রামে অনুষ্ঠিত রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশন । এই অধিবেশনে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপেন্দ্রনাথ বর্মন, যজ্ঞেশ্বর রায় ও জগদানন্দ রায়ের বিরুদ্ধে রাজবংশীদের নতুন ছাত্র-যুবক ও কৃষকদের প্রতিনিধিগণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তারা এই নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিলেন যে 'রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় চেতনা তাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এবং ১৯৬৯ এর মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস রাজবংশীদের চেতনাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারে রাজবংশীদের প্রতিনিধি না থাকায় কংগ্রেস রাজবংশীদের স্বার্থকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে' । এমতাবস্থায় ঐ অধিবেশনে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের আলোচনা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তারা হলেন হরিমোহন বর্মন (রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি), পঞ্চানন মল্লিক (জলপাইগুড়ি), হরিপদ রায় (জলপাইগুড়ি), কলিন্দ্রনাথ বর্মন (শিলিগুড়ি), প্রভৃতি। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উত্তরখণ্ড দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৩৪]

উত্তরখন্ড দলের মূল দাবি ছিল উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রধান সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এর দাবিগুলি ছিল নিম্নরূপ:

(১) সমগ্র রাজ্যে ব্যক্তিগত সম্পদ রাখার ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা। The West Bengal Estate Equisation Act অনুসারে একজন কৃষকের সর্বোচ্চ জমির পরিমান হতে পারে ২৫ একর যা বর্তমান বাজারমূল্যে ৭৫ হাজার টাকার সমান। কিন্তু বড় ব্যবসায়ী ও মহাজন পরিবারের কারখানা, লরি, দোকান, ইত্যাদি রাখার ক্ষেত্রে কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই। কেন এই পক্ষপাত?

(২) রেশনকার্ডের শ্রেনীকরণের পূনর্বিন্যাস।

(৩) 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম' শ্লোগানকে বাস্তবায়িত করতে বাংলা ভাষার সঙ্গে রাজবংশী/কামতাপুরি, বোড়ো, নেপালি, সাঁওতালি, ইত্যাদি ভাষায় (দুই কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে) পানীয় জল ও শৌচালয়সহ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

(৪) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঠাকুর পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ে নামান্তঃরণ।

(৫) দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন।

(৬) উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপন।

(৭) অতি অল্পসুদে কৃষকদের মধ্যে ঋণের সরবরাহ ও ভর্তুকিসহ বীজ, রাসায়নিক সার ও কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ নিশ্চিতকরন।

(৮) উত্তরবঙ্গে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

(৯) তপশিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে অবৈতনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(১০) উত্তরবঙ্গে উচ্চ ন্যায়ালয় (High Court), মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, আইন মহাবিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

(১১) তপশিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

এই দাবিগুলির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে রাজবংশীসহ উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নই ছিল উত্তরখন্ড দলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে উত্তরখন্ড দল তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তোলার প্রয়াস শুরু করে।

উত্তরখন্ড দলের কাছে প্রথম নির্বাচনের সুযোগ উপস্থিত হয় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আভ্যন্তরীন দ্বন্ধ, বাংলা কংগ্রেস ও সি.পি.আই . (এম) র রাজনৈতিক শীতল যুদ্ধ ক্রমশ প্রকটিত হতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নিজেই জঙ্গলের রাজত্ব বলে কটাক্ষ করতে শুরু করেন। শেষপর্যন্ত **১৬**ই মার্চ **১৯৭০** অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করেন। সি.পি.আই. (এম) একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসাবে রাজ্যপালের কাছে সরকার গঠনের আর্জি জানিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস.ইউ.সি.আই. প্রভৃতি দল সি.পি.আই. (এম) কে সরকার গড়তে না দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়েছিল। সি.পি.আই. (এম) র পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় যা **১৫**ই মার্চ **১৯৭১** সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এই

রাষ্ট্রপতি শাসনের সময়ই (১৯৭১ র ৯ই মার্চ) পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। আর এই নির্বাচনেই উত্তরখন্ড দল প্রথম অংশগ্রহণ করে।

উত্তরখন্ড দল জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা ও কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ বিধানসভা আসনে অংশগ্রহণ করে। একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনেও প্রার্থী দিয়েছিল এই দল । কিন্তু নির্বাচন রাজনীতিতে উত্তরখন্ড দলের ফলাফল ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। উত্তরখণ্ড দল যে আসনগুলিতে প্রার্থী দিয়েছিল তার ফলাফল থেকে বলা যায় যে ময়নাগুড়ি আসনে এই দলের প্রার্থী হরিপদ রায় পেয়েছিলেন মাত্র ৬০৭৫ টি ভোট যা প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১৫% (মোট প্রদত্ত ৩৯১৭৩ টি ভোটের মধ্যে ৬০৭৫ টি)। অন্যদিকে ধূপগুড়ি আসনে উত্তরখন্ড দলের প্রার্থী ওয়াজউদ্দিন আহমেদ পেয়েছিলেন মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১২.৫% ভোট (মোট ৪২৩৩০ এর মধ্যে ৫৩২১ টি ভোট)। ফালাকাটা তপশিলি জাতির সংরক্ষিত আসনে উত্তরখণ্ড দলের সফলতা ছিল আরোও কম। এখানে উত্তরখণ্ড দলে অন্যতম নেতা পঞ্চানন মল্লিক পেয়েছিলেন মাত্র ৯.৮৫% ভোট (৪৩৬৩৪টি ভোটের মধ্যে ৪৩০২ টি)। জলপাইগুড়ি সদর আসনে এই দলের প্রার্থী গিরীশচন্দ্র দেবসিংহ পেয়েছিলেন মাত্র ৩.৫% ভোট। অনুরূপভাবে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ তপশিলি জাতির সংরক্ষিত আসনে উত্তরখণ্ড দলের সীতানাথ রায় সরকার পেয়েছিলেন ৩.৫% ভোট। জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনেও উত্তরখণ্ড দলের প্রার্থী সোমা ওঁরাও পেয়েছিলেন মাত্র ১১৯৫৭টি ভোট যা প্রদত্ত ভোটের মাত্র ৩.৬২%।[৩৫]

নির্বাচনে উত্তরখণ্ড দলের এই ভরাডুবির কারণ হিসাবে এই দলের নেতারা তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অর্থের অভাবকে দায়ী করেছিলেন। [৩৬] ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়িতে তাদের আংশিক সফলতার কারণ ছিল রাজবংশীদের জাতিগত ঐক্যকে উত্তরখণ্ড দলের সপক্ষে টানার প্রয়াস। কিন্তু সার্বিকভাবে এই দল রাজবংশীসহ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে তার পক্ষে টানতে পারেনি। এই ব্যর্থতা থেকে উত্তরখণ্ড দল বেরিয়ে আসার জন্য উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে নির্বাচনী ইস্তাহারে নিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করে। তাই **১৯৭২** এ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তরখণ্ড দল নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে নির্বাচনী ইস্তাহারে তুলে ধরে----

(১) উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

(২) গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক পার্থক্যের দূরীকরণ।

(৩) খাস জমিতে ভূমিহীন কৃষকদের অধিকার সুনিশ্চিতকরণ।

(৪) উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলির জাতীয়করণ।

(৫) বার্ষিক বাজেটে উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত রাজস্বের সমানুপাতে খরচের তহবিল অনুমোদন।

(৬) কৃষি আয়কর আইনের পরিমার্জন।

(৭) ছিটমহল সমস্যার সমাধান।[৩৭]

উত্তরখণ্ড দল **১৯৭২**র নির্বাচনে মোট আটটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মেখলিগঞ্জ ও দিনহাটা। উত্তরখণ্ড দলের প্রার্থীদের মধ্যে

সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ময়নাগুড়ি আসনের প্রার্থী পঞ্চানন মল্লিক। যিনি ৩৫,৯০৩ টি ভোটের মধ্যে ৬, ৮৬২ টি ভোট পেয়েছিলেন। বাকি প্রার্থীদের সফলতা ছিল খুবই নগন্য। তাই বলা যায় যে নির্বাচন রাজনীতিতে উত্তরখণ্ড দল প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করতে পারেনি।

১৯৭২ এর নির্বাচনে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গে সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। বামপন্থী সহ অন্যান্য বিরোধীদল সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের শাসনকালকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সর্বোপরি ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ভারতে জরুরি অবস্থা উত্তরখণ্ড দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়। ১৯৭৭ এ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তর খন্ড দল পুনরায় তার কার্যাবলিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসতে শুরু করে। উত্তরখণ্ড দলের প্রধান নেতৃবর্গ বিশেষ করে পঞ্চানন মল্লিক ও সম্পদ রায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৮১ এর ২৪ শে আগষ্ট এক স্মারকপত্র প্রদান করেন। এই স্মারকলিপিতে উত্তরখণ্ড দল উত্তরবঙ্গের প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে সমস্যার সমাধানের সূত্র হিসাবে উত্তরবঙ্গে একটি পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি উত্থাপন করে। তৎকালীন উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলার (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা) পৃথক ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধারার বিশ্লেষণ করে উত্তরখণ্ড দল ভারতের সংবিধানের পরিধির মধ্যে ভারতের ভৌগলিক অখণ্ডতা বজায় রেখে উত্তরবঙ্গে 'কামতাপুর রাজ্য' গঠনের দাবিকে বৈধতা প্রদানের প্রয়াস করেছিল।[৩৮] কিন্তু উত্তরখণ্ড দল সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের আপাত পশ্চাৎপদতাকে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করতে পারেনি। তৎকালীন বামফ্রণ্ট সরকার উত্তরখন্ড দলের

এই আন্দোলনকে কোনভাবেই মেনে নিতে রাজি ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের মতে 'উত্তরখণ্ড দল ছিল অরাজকতা সৃষ্টিকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী একটি রাজনৈতিক দল' ।[৩৯] কিন্তু উত্তরখণ্ড দল উত্তরবঙ্গের তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে উত্তরঙ্গে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি পরিত্যাগ করেনি। ১৯৮৯ এর ২৩শে এপ্রিল প্রভাসচন্দ্র সিংহশাস্ত্রীর নেতৃত্বে এইদল পুনরায় তার দাবিগুলিকে প্রচারের আলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল।[৪০]

৫.৪.২.উত্তরবঙ্গ তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সংগঠন (উৎজাস):

১৯৭০ র উত্তরখণ্ড দলের রাজনৈতিক আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ও ১৯৮০র দশকে আসামে ব্যাপক ছাত্রআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উত্তরব ঙ্গে তপ শিলি জাতি ও উপজাতি শ্রে ণীর উচ্চশিক্ষিত ছাত্ররা একটি নতুন সংগ ঠন গড়ে তোলেন যার নাম হল 'উত্তরবঙ্গ তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সংগঠন (উৎজাস) '। মাত্র ১১ জন্য সদস্য নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে উৎজাসের জন্ম হয়। শ্রীরঞ্জিত অধিকারী, অমল সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ বর্মন, সিদ্ধেশ্বর কার্জী ও নরেন দাসের নেতৃত্বে উৎজাস আত্মপ্রকাশ করে। মাত্র একবছরের মধ্যেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উৎজাস জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। প্রথমদিকে মূলত ছাত্র আন্দোলন ও তাদের দা বিগুলির প্রতি বে শি গুরুত্ব দিয়েছিল এই সংগঠন। এর প্রধান দাবিগুলি ছিল-

(১) তপশিলি জাতি ও তপ শিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে ছাত্রদের যেকোন ধরনের অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ/প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

(২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদাধিকারীসহ বৃত্তি ও পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ছাত্রদের ছাত্রবৃত্তি নিয়মিতভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(৩) তপ শিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের যেসব ছাত্র মেধা তালিকার সাধারণ অংশে (General Seat) স্থান পেয়েছেন তাদেরকে কনভাবেই যেন সংরক্ষিত আসনের হিসাবের মধ্যে ধরা না হয় তার জন্য ভর্তি প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

(৪) তপশিলি জাতি ও তপ শিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রতি জোর দেওয়া, ইত্যাদি।[৪১]

উৎজাসের উপরিউক্ত দা বিগুলি উত্তরবঙ্গের তপ শিলি জাতি ও তপ শিলি উপজাতি ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। উৎজাসের আন্দোলনের ফলে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনস্থ অন্যান্য মহাবিদ্যালয় (যেখানে আগে সংরক্ষণ নীতি মেনে নিয়োগ হতো না) শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে সংরক্ষণের নিয়ম মানতে শুরু করে।[৪২] এই আংশিক সাফল্য উৎজাসকে আরো কয়েকটি শাখাসংগঠন খুলতে উদ্দীপ্ত করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'চা মজদুর সমিতি (চা বাগান শ্রমিকদের সংগঠন) ', 'কিষান মজদুর সংগঠন' (কৃষি শ্রমিকদের সংগঠন) ও 'নারী সমিতি'।

১৯৭৭ ও ১৯৭৮ এ উৎজাস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে । এটি হল উত্তরবঙ্গের দুটি জেলায় তপ শিলি জাতির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪০% থেকে ৫০% অথচ সরকা রি চাকরিতে তাদের জন্য সংরক্ষণ হচ্ছে মাত্র ১৫% যা জনসংখ্যার সমানুপাতিক নয়। তাই উৎজাস উত্তরবঙ্গের স্থানীয় চাকরির ক্ষেত্রে ৬০% সংরক্ষণের দাবি তোলে।[৪৩]

উৎজাস আন্দোলনের অন্যতম একটি বিষয় ছিল 'পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় মানুষের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া '। উৎজাস ভাবতে শুরু করে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৬৭-৬৯) ও ১৯৭৭ এ সৃষ্ট বামফ্রন্ট সরকার খাসজমি বিতরণের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের বে শি গুরুত্ব দিচ্ছে। অথচ উত্তরবঙ্গের কৃষিজমির মালিকানা ছিল স্থানীয় রাজবংশীদের হাতে। এই ভূমিহস্তান্তরকে হাতিয়ার করে উৎজাস রাজবং শী জনমা নসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা শুরু করে। এই সংগঠন দা বি করে যে খাস জমি বিতরণের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও তপ শিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে বে শি গুরুত্ব দিতে হবে। এই দাবিকে মাথায় রেখে উৎজাস কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্থানে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে শুরু করে।[৪৪] উৎজাসের উত্থানকে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে উৎজাস সমর্থক ও বামফ্রন্ট সমর্থকেদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়।[৪৫] এই সংঘাত বৃহৎ আকার ধারণ করে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থানা অঞ্চলে। ১৯৮০র ৯ই এপ্রিল তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত জলারধাম গ্রামে উৎজাস সদস্য ও সি.পি.আই. (এম) সদস্যদের মধ্যে খাসজমি বিতরণকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয় এবং শেষপর্যন্ত উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন।[৪৬] ১০ই এপ্রিল ১৯৮০ তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ৭জন

উৎজাস সমর্থককে গ্রেপ্তার করে । পরের দিন (১১ই এপ্রিল , ১৯৮০) উৎজাস সমর্থকগণ তুফানগঞ্জ মহকুমাশাসকের কাছে গ্রেপ্তার হওয়া উৎজাস সমর্থকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আবেদন জানাতে গিয়ে তুফানগঞ্জ থানা ঘেরাও করেন। পুলিশ প্রথমে উৎজাস সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালায়। এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। একজন উৎজাস সমর্থক (নরেন বর্মন) গুরুতর আহত হন এবং পরে তিনি কোচবিহার সদর হাসপাতালে মারা যান (২১শে এপ্রিল, ১৯৮০)। [৪৭] একইসঙ্গে সি.পি.আই . (এম) সমর্থক ও উৎজাসের মধ্যে হাতাহাতি হয়।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই উৎজাস বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানায়। কিন্তু তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের শরিকদল বিশেষকরে সি.পি.আই.(এম) ও ফরওয়ার্ড ব্লক উৎজাসের আন্দোলনকে মেনে নিতে পারেনি। বরং উৎজাসকে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হিসাবে প্রচার করতে শুরু করে। কিন্তু উৎজাস তুফানগঞ্জ ঘটনার প্রতিবাদে ১লা মে ১৯৮০ থেকে তুফানগঞ্জে 'গণঅনশন সত্যাগ্রহ' শুরু করে যা ৮ই জুলাই ১৯৮০ পর্যন্ত চলেছিল। তুফানগঞ্জ ঘটনার প্রেক্ষিতে উৎজাস কলকাতাকেন্দ্রিক তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের সংগঠন 'ভারতীয় তপশিলি পরিষদ' (Indian Council of Scheduled Castes/Tribes) এর আন্তরিক সমর্থন পেয়েছিল। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্যামল মণ্ডল লিখেছেন যে--

> 'উৎজাসের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয় এটা হল দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শান্তিপূর্ণ প্রয়াস।'[৪৮]

উৎজাস, কলকাতায় অবস্থিত ‘বঙ্গীয় রাজবংশী সমিতিরও’ সমর্থন পেয়েছিল। [৪৯] রাজবংশীদের জাতিভিত্তিক সংগঠন ছাড়াও উৎজাস কোচবিহারের স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গের সমর্থন পেয়েছিল।[৫০] কোচবিহারের কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সদস্য শ্রীপ্রসেনজিৎ বর্মন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে একটি চিঠিতে জানান যে ‘উৎজাসের আন্দোলন শুধুমাত্র রাজবংশীদের আন্দোলন নয় এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অন্যান্য তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ যারা উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবেন' ।[৫১] কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এটাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসাবেই চিহ্নিত করেছে।

৫.৪.৩.: ১৯৮০ র দশকে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশীদের অন্যান্য সংগঠন:

১৯৮০ র দশকে উত্তরখণ্ড দল ও উৎজাস উত্তরবঙ্গের জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীগণ তাদের দাবিদাওয়া ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো কয়েকটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন। উত্তরবঙ্গ সহ আসামের রাজবংশীগণ যৌথভাবে এবার একটি নতুন সংগঠনের জন্ম দেন ১৯৮৪ সালে। আসামের তেজপুরের রাজবংশী নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ ড. পূর্ণনারায়ণ সিনহার নেতৃত্বে সৃষ্ট এই সংগঠনটির নাম হল ‘ভারতীয় কোচ রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভা (BKRKM)’। কোচ রাজবংশের বিখ্যাত সেনাপতি চিলারায়ের ৪৭৪তম জন্মদিন পালন উপলক্ষে আসামের ধুবরি জেলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উত্তরপূর্ব ভারতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাজবংশী প্রতিনিধিগণ মিলিত হন। এই সম্মেলনে ‘বঙ্গীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি’ এবং উত্তরখণ্ড দলের বিভিন্ন নেতৃবর্গ যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই ‘ভারতীয়

কোচ রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভার' জন্ম হয় (১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪)। [৫২] এই সম্মেলনের মুখ্য প্রবক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. পূর্ণনারায়ণ সিনহা, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকত, শ্রীপঞ্চানন মল্লিক, শ্রীসম্পদ রায়, শ্রীধর্মনারায়ন বর্মা, শ্রীপঞ্চানন বর্মন, প্রমুখ।

এই ক্ষত্রিয় মহাসম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, বাংলাদেশ ও নেপালের কোচ-রাজবংশীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষা, রাজনীতি, আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া কোচ-রাজবংশীদের মধ্যে সমমনোভাব প্রচার করে তাদের সার্বিক উন্নয়নই ছিল এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়--

(১) কোচ -রাজবংশীদেরকে ভারতীয় সংবিধানের রীতি মেনে ভারতের সর্বত্র 'তপশিলি উপজাতি' (Scheduled Tribe) বলে ঘোষণা করা।

(২) উত্তরখণ্ড দলের প্রস্তাব অনুসারে প্রাক্তন কোচবিহার রাজ্য ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোকে নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সৃষ্টি করা।

(৩) বিদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা। এবং তাদেরকে 'বিদেশি' হিসাবে ঘোষণা করা।

(৪) কোচ -রাজবংশীদের ভাষাসংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৫) চিলারায় ক্লাব ও চিলারায় সংঘ প্রতিষ্ঠা করা।

(৬) আসাম এবং মেঘালয় রাজ্যে কোচ -রাজবংশীদের জন্য উপযুক্ত পরিমানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।[৫৩]

এই মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার জেলার দিনহাটায় (২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬)। এই অধিবেশনে কোচ রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভার নতুন নামকরণ হয় কোচ-রাজবংশী ইন্টারন্যাশনাল (Koch-Rajbanshi International)। [৫৪] এখানে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে---

> "Since the interest, Language, culture, social and economic backwardness of the Koch-Rajbanshi Kshatriyas are the same whether they live in India or outside, the 'Bharatiya Koch-Rajbanshi Kshatriya Mahasabha' be renamed as the 'KOCH-RAJBONGSHI INTERNATIONAL' and broadbased as an international of the Koch-Rjbongshi ethnic Nation spread over Indian States of Assam, Meghalaya, North Bengal, Tripura, Sikkim and Bihar and Countries like Nepal, Bhutan and Bangladesh, with a view to consolidate, ametiorate their conditions and develop this race of great heritage but without interfering with their national status in the countries they live and their relationship with their Governments in any matter." [৫৫]

কোচ-রাজবংশী ইন্টারন্যাশানাল তৈরি হওয়ার পরেও এই সংগঠনের কার্যাব লির মূল দৃষ্টি উত্তরবঙ্গের উপরই নিক্ষিপ্ত ছিল। এই সংগঠন ল ক্ষ্য করেছে যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছে। এই পশ্চাৎপদতার কারণ হল বাইরে থেকে আসা (বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ) উদ্বাস্তুগণ স্থানীয় মানুষদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক করে তুলেছে। এই পশ্চাৎপদতা দূর করার প্রধান উপায় হচ্ছে উত্তরবঙ্গে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা এবং রাজবংশীদের নানা ধরনের সুযোগসুবিধা প্রদান। তাই KRI প্রস্তাব গ্রহণ করে যে----

> 'The Government of India be urged to create a Union Territory of Uttar Bengal to be directly govern by the centre. So that not only safeguards needed be provided but all speedy development of the region and the people may be ensured.' [৫৬]

KRI রাজবংশীদের মধ্যে একতা বৃদ্ধি ও তাদের সামাজিক কার্যাব লিকে স্বীকৃতি দেবার জন্য কয়েকটি পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে। এগুলি হল দেশরত্ন, কামতারত্ন, কামতাবৈর্দুয্যমুনি ও কামতা সাহিত্যরত্ন। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দা বিসমূহের চেয়েও যে বিষয়টি KRI এর প্রধান দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটি ছিল উত্তরবঙ্গে 'কামতাপুর রাজ্য' প্রতিষ্ঠা। ফলে KRI র মধ্যে রাজনৈতিকভাবে যে সংগঠনগুলি যুক্ত হয়েছিল তাদের প্রতিটি কামতাপুর রাজ্যের পক্ষে মতামত দিয়েছিল। এই সংগঠনগুলির মুখপাত্র যেমন উত্তরখণ্ড দলের পঞ্চানন মল্লিক ও সম্পদ রায়, কামতা রাজ্য পরিষদের কৃষ্ণকান্ত বড়ুয়া, কামতা সাহিত্য পরিষদের অম্বিকাচরন চৌধুরী,

এবং All Assam Koch-Rajboangshi Sammilani র দ্বিজেন রায় এরা প্রত্যেকেই কামতাপুর রাজ্য গঠনের পক্ষে মত পোষণ করতেন।[৫৭] এই ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে KRI সৃষ্টির বছরেই। ১৯৮৬ তে স্বাধীনতা দিবসের উদযাপনের প্রাক্কালে KRI এর সহযোগী ভারতীয় কামতা রাজ্য পরিষদ কামতাপুর রাজ্য গঠনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। ৬ই আগস্ট জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে 'ভারতীয় কামতা রাজ্যপরিষদ' উত্তরবঙ্গে কামতাপুর রাজ্য গঠনের প্রস্তাব গ্রহন করে। উত্তর খণ্ড দল ও KRI 'ভারতীয় কামতা রাজ্য পরিষদের' এই দাবিকে সর্বোতোভাবে গ্রহন করে।[৫৮]

কামতা রাজ্য পরিষদ ময়নাগুড়ি অধিবেশনে কামতাপুর রাজ্য দাবির পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ১৫ আগস্টের যে কোন অনুষ্ঠানে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ না করতে আহ্বান জানায়। অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবস বয়কটের ডাক দিয়েছিল এই সংগঠন। এই সংগঠনের ভাষায়,

> In view of the fact that independence has no meaning for the poor and neglected people of Kamtapur, no Kamtapuri will take part in any official or non official functions in the celebration of 'Independence day' all the programmers shall be boycotted.[৫৯]

একই সঙ্গে এই সংগঠন তার দাবিগুলি নিয়ে সবর হয়। কামতারাজ্য পরিষদের প্রধান দাবিগুলি ছিল----

১) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কামতাপুরী ভাষার ছাত্রছাত্রীদের জন্য কামতাপুরী মাধ্যম চালু করা। বাংলা মাধ্যম কোন ভাবেই কামতাপুরীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

২) আকাশবানীর শিলিগুড়ি, কলকাতা ও গৌহাটি কেন্দ্র থেকে কামতাপুরী ভাষায় সংবাদ, আলোচনা ও অন্যান্য সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার করা।

৩) কামতাপুরী ভাষা প্রচার ও উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করা।

৪) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবির্তন করে কামতাপুরী করা।

৫) কামতাপুরী (রাজবংশী) অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও অর্থনৈতিক পরিষেবার জন্য সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করা।

৬) উত্তরবঙ্গের সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে কেবলমাত্র কামতাপুরী বা স্থানীয় তপশিলি জাতি/উপজাতিদের নিয়োগ করা, ইত্যাদি।[৬০]

কোচ -রাজবংশী ইন্টারন্যাশনাল, কামতারাজ্য পরিষদ বা উত্তরখন্ড দল, উত্তরবঙ্গের তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেও এই সংগঠনগুলির কোনটাই বাস্তবে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এই সংগঠনগুলিতে কোচ -রাজবংশী ছাড়া অন্যদের সমর্থন একেবারেই ছিল না। এমন কি রাজবংশীদের একটা বৃহৎ অংশ যারা কংগ্রেসের বা জাতীয় রাজনীতি এবং শ্রেণী বা বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন তারা উত্তরখন্ড দল, KRI ও কামতারাজ্য পরিষদের পৃথক রাজ্যের

দাবিকে অবাস্তব বলে মনে করতেন। যদিও উত্তরখন্ড দলের ভঙ্গুর অবস্থা থেকে কামতাপুর পিপলস পার্টির (KPP)জন্ম হয় কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের একটা বৃহৎ অংশ পৃথক রাজ্যের দাবির সঙ্গে বা অঞ্চলিকতার রাজনীতির সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন না। এই অংশের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে আমরা উপেন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী অংশে আলোচনা করবো।

৫.৫.উপেন্দ্রনাথ বর্মনঃ আঞ্চলিকতা, জাতীয় রাজনীতির পরিসর ও ব্যক্তি সত্ত্বার দ্বন্দ্ব

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া, ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন, জাতীয় রাজনীতি ও আঞ্চলিকতা র বিকাশের দ্বা রা সম্পৃক্ত বৃহত্তর ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের বহুমুখী প্রতিক্রিয়া ল ক্ষ্য করা যায়। তবে তার মূল সুরটি কখনই জাতীয় রাজনীতির পরিপন্থী ছিলনা। পরবর্তী অংশে আমরা সংক্ষেপে এই সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

প্রথমে যে বিষয়টি ব্যক্তিসত্তা, স্বজাতিপ্রীতি ও জাতীয় রাজনীতির সাথে সংঘাত তৈরি করতে পারে সেটি ছিল জাতি রাজনীতির সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে গিয়ে বৃহত্তর রাজনীতির পরিসরে রাজবংশী সম্প্রদায়ের সার্বিক স্বার্থকে রক্ষা করা। মূ লত জাতি রাজনীতির সূত্র ধরে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের রাজনীতিতে আগমন ঘটলেও বাংলা বিভাজনের পরে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে| এমনকি ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র পূর্ববাংলায় চলে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের সামাজিক আন্দোলন দুর্বল হয়ে প ড়ে| এমতাবস্থায় উপেন্দ্রনাথ বর্মনের তৎপরতায় পুনরায় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গে নতুন করে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির যাত্রা আরম্ভ হয়। [৬১] এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত দুটি-- (ক) হিতকর জ্ঞান প্রচার ও

আত্মপ্রতিষ্ঠা; ও (খ) ধর্ম সম্বন্ধীয় নৈতিক, সামাজিক, মান সিক ও কায়িক উন্নতি ও তদ্বিষয়ক শিক্ষা বিস্তার। [৬২] অর্থাৎ এই সমিতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল রাজ বংশীদের সার্বিক উন্নয়ন। আঞ্চলিকতার স্থান এখানে ছিলনা। এই বছরেই ১৩ই পৌষ ১৩৬১ – (২রা জানুয়ারী , ১৯৫৫) জলপাইগুড়ি জেলার জটেশ্বরে এই ক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশন আহুত হয়। এই সম্মেলনে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের প্রদত্ত আভিবাসন থেকে তার মানসিকতার আভাস পাওয়া যায়। উপেন্দ্রনাথ বলেন –

> "জটেশ্বর ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্যোগী ভাইবোনেরা ... আপনাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যদি অন্যান্য স্থানেও সামাজিকগনের মধ্যে জয়গান আসে, তবে ক্ষত্রিয় জাতির ভবিষ্যৎ অতি উজ্বল একথা মুক্তকণ্ঠে আজ বলিতে পারি"।[৬৩]

অর্থাৎ উপেন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় চেতনাকে সামনে রেখে তাদের সামাজিক ঐক্যকে রক্ষা করা। শিক্ষাবিস্তারকে রাজ বংশীদের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি বলে মনে করতেন তিনি। জটেশ্বর অধিবেশনে উপেন্দ্রনাথ বলেন--

> "চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে জাতি শিক্ষায় অগ্রসর সে তত উন্নত বাসস্থান, উন্নত খাদ্য, পোশাক, অর্থ, চরিত্র, স্বাস্থ্য এক কথায় সবকিছুর অধিকারী। আর এই শিক্ষার অভাবেই আমরা কত নীচে প ড়িয়া আছি! তাই আজ আমাদের শিক্ষা প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে নতুবা আমাদের উদ্ধার নাই"।[৬৪]

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সামাজিক একতা তথা জাতীয় ঐক্যের (National Integration) প্রতি উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন। জটেশ্বর অধিবেশনে তিনি বলেন:

"বর্তমান যুগে কোন সমাজ বা জাতি একক আলাদা হইয়া টিকিতে পারে না বা উন্নত হইতে পারে না। ... . বৃহত্তর জাতীয় পরিকল্পনায় সকলের সাথে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে হইবে। সেজন্য ও আপনারা প্রসারিত মন ও হৃদয় লইয়া সহযোগিতা চান ও করুন... .... স্বাধীন ভারতের ল ক্ষ্য এবং একদিন এই অখন্ড জাতি গঠন স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবে ই এবং হইতে বাধ্য। ....মাতৃভূমি ভারতকে পূর্ণ বিকাশের পথে নিতে গেলে অখন্ড ও এক জাতীয়তা অবশ্যকর ণীয়। আপনারাও সেই জন্য প্রস্তুত হউন।

পরিশেষে আমি যুবকদের আহ্বান করিয়া বলিব তোমরা শিক্ষায় উন্নত হইয়া নৈতিক বলে শক্তিশালী হইয়া ভবিষ্যৎ ভারতের নাগরিক ও কর্ণধার হও।"[৬৫]

উপেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে প্র তীয়মান যে তার কাছে আঞ্চলিক স ত্তা(Regional Idenity) বা রাজবংশী জাতির পৃথক জাতি স ত্তা (Caste Idenity) বা ভাষা স ত্তার (Linguistic Identity) চেয়েও ভারতের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, জাতীয় ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া অনেক বে শি প্রাধান্য পেয়েছিল। রাজবংশী সমাজকে এই ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সামিল করে তাদের সার্বিক উন্নতির প্রতি অধিক দৃষ্টি দান করাই ছিল উপেন্দ্রনাথে র প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৯৬০র দশকে বামপন্থী রাজনীতির বিকাশ, রাজবংশীদের মনে ভাষাভিত্তিক পৃথক রাজ্যের দাবির উত্থান এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের নীতি উপেন্দ্রনাথ বর্মনকে রাজবংশীদের কাছে অপ্রিয় করে তোলে। এই অপ্রিয়তা প্রকাশ্যভাবে ধ্বনিত হয় ১৯৬৯ এ ময়নাগুড়িতে অনুষ্ঠিত 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির' অধিবেশনে । ৩১শে মে ১৯৬৯র এই

আধিবেশনে রাজবংশী যুবসমাজ উপেন্দ্রনাথ বর্মনসহ অন্যান্য রাজবংশী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। এমনকি তারা উপেন্দ্রনাথ বর্মনের ভাষণ শুনতে ও অনিহা প্রকাশ করে।[৬৬] উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের এই মনোভাব ধীরেধীরে আঞ্চলিকতার রূপ পরিগ্রহ করে যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

উপেন্দ্রনাথ রাজবংশীদের এই পৃথক রাজ্যের দাবিকে মেনে নিতে পারেননি। যদিও ১৯৮০ র দশকে উপেন্দ্রনাথকে বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের বেশ কিছু কর্তাব্যক্তি উত্তরখন্ডের সমর্থক হিসাবে প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন ।[৬৭] উপেন্দ্রনাথ নিজে উত্তরখন্ড দলের পৃথক রাজ্যের দাবিকে কখনই সমর্থন করেননি। ১৯৮২তে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ প্রকাশের শতবার্ষিকি উৎসব উপলক্ষে সভাপতির ভাষণে উপেন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, 'আনন্দমঠ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যে ভাবে তার ভূমিকা পালন করেছে তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য আনন্দমঠের উৎসারিত বন্দে মাতরম্| ধ্বনি ভারতের জাতীয় ঐক্যকে রক্ষা করবে।'[৬৮]

তবে একজন ব্যক্তি হিসাবে রাজবংশী জাতির সংস্কৃতি চর্চার প্রতি তিনি সর্বদাই যত্নশীল ছিলেন। রাজবংশী সংস্কৃতির দুটি মূল ধারা (১) ভাওয়াইয়া সঙ্গীত (২) রাজবংশী ভাষার (কথ্য ভাষা) চর্চা উপেন্দ্রনাথকে সর্বদাই আচ্ছন্ন করে রাখত। তাই আমরা লক্ষ করেছি যে ভারতের জাতীয় ঐক্যের পরিসরে রাজবংশী জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন যা পরবর্তী অংশে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

৫.৫.১.রাজবংশী-ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস:

‘রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস ’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ (১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে)সনে। এই বইটি লেখার জন্য উপেন্দ্র নাথ বেশ কিছুদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে MLA নির্বাচিত হয়ে কোল কাতায় এলে উপেন্দ্রনাথ তৎকালীন Imperial Library (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার বা National Library) তে, বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক পাঠের মধ্য দিয়ে রাজবংশী জাতিকে ক্ষত্রিয় হিসাবে তুলে ধরার জন্য উক্ত বইটি রচনা করেন। পরবর্তীকালে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৭০ সনে) এর পরিমার্জিত ও পরিবির্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৬৯]

রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস উপেন্দ্রনাথ শুরু করেন রাজবংশী শব্দের অর্থ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এখানে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে প্রমাণ করেন। রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির লক্ষ্য তাদের পেশা, জীবিকা ,আঞ্চলিক বিন্যাস, ইত্যাদির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব দা বির ইতিহাস তুলে ধরেন উপেন্দ্রনাথ। একই সঙ্গে তৎকালীন ও ঔপনিবেশিক গবেষক (Buchanan Hamilton, B.H. Hodgson, W.W. Hunter, L. S. O. Malley, Harendra Narayan Choudhury) ও ভারতীয় সমাজতাত্বিকদের (G.S. Gurye) গবেষণার বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপেন্দ্রনাথ রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করেন। তবে এই বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশটি হল উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ইতিহাসের নির্মাণ এখানে তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন ‘ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণের শাস্ত্রীয় বিধান ও

রাজবংশীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কিভাবে তাদের ব্রাত্যত্ব মোচন সম্ভব হয়েছিল' | উপেন্দ্রনাথের এই গবেষণার প্রধান গুরুত্ব এ খানেই যে তিনিই প্রথম রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন যা পরবর্তীকালে গবেষণার অন্যতম প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করেছে।[৭০]

৫.৫.২.*ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত:*

রাজবংশী জাতির ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐআন্দোলনের প্রাণপুরুষ পঞ্চানন বর্মার জীবনী আলোচনার মাধ্যমে উপেন্দ্রনাথ বর্মন তার স্বজাতিভাবনার পরিচয় দিয়েছেন তার রচিত '*ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত* ' প্রকাশের মধ্য দিয়ে (১৩৭৯ সন)। এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চানন বর্মার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন। [৭১] এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করনের প্রস্তাবনায় উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন---

> " সন ১৩৭২ সালে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। সন ১৩৪২ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর সহকর্মীদের আর অল্প কয়েকজন মাত্র জীবিত আছেন। এমতে তাঁর জীবনচরিত রচনার ইহাই প্র শস্ত সময়। সন ১৩৭৯ সালে তাঁর যে জীবনচরিত লিখিয়াছিলাম তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় এবং কিছু নূতন তথ্য হস্তাগত হওয়ায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করা হইল"।[৭২]

কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে পঞ্চানন সরকারের (বর্মার) জন্ম হয়েছিল তার বিবরণের মধ্য দিয়ে উপেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের সূচনা করেছেন | পঞ্চানন বর্মার শিক্ষাজীবনের পর্যালোচনাও

এখানে পাওয়া যায় । এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশটি খুব ই গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ শতকের শেষপর্যায়ে এবং বিংশশতকের গোড়ায় জাতপাতদীর্ণ বাংলার সমাজে রাজবংশী জাতির অবস্থা ন এবং জাতপাতের অভিশাপে জর্জরিত রাজবংশী জাতি কিভাবে পঞ্চানন বর্মার সুযোগ্য নেতৃত্বে ক্ষত্রিয় আন্দোলন শুরু করেছিল এবং তা কোনদিকে ধাবিত হয়েছি ল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ। ক্ষত্রিয় আন্দোলনকে পঞ্চানন বর্মা বাংলার গন্ডী অতিক্রম করে সর্বভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজে স্থান দিয়েছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে রাজবংশী ক্ষত্রিয়যুবকদের যোগদান ও প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাজবংশীদের সম্পর্কের ইতিহাসও এখানে আলোচিত হয়েছে। ১৯১৯এ ভারতশাসন আইন গ্রহণ করার পরে রাজবংশীসহ তৎকালীন বাংলার উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের প্রাদেশিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির রাজনৈতিক ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন উপেন্দ্রনাথ তার এই গ্রন্থের মধ্যে।

পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিতে উপেন্দ্রনাথ পঞ্চানন বর্মার রাজনৈতিক জীবন ও সর্বোপরি রাজবংশীদের তপশিলি জাতিভুক্তিকরণে তার (পঞ্চানন বর্মার) ভূমিকাকে তুলে ধরে ১৯৭০এর দশকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী যুবসমাজকে এই বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ‘রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনই রাজবংশী জাতির সার্বিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেছিল’ । তাই উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“কিভাবে তিনি রাজবংশী জাতির ক্ষাত্রত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমান সংগ্রহ করতঃ ১৩১৯ সনের শুরু হইতে ব্রাত্যত্বমোচন ও উপবীত গ্রহণ করান এবং জাতির সর্ব্বাঙ্গী ণ

উন্নতির জন্য বিবিধ প্রচেষ্টা করেন। এই সমিতির প্রভাবে সমাজে সামাজিক, ধার্ম্মিক, নৈতিক উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্ষত্রিয় সমিতির দ্বারা সমগ্র উত্তরবঙ্গ, আসামের গোয়ালপাড়া জেলা ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার রাজবংশী সমাজে যে একতার বন্ধন আসে ১৯৩২ সালে লর্ড লোথিয়ান স্বীয় রিপোর্টে তা উল্লেখ করে বলেন— Rajbanshi is a well-organised Community 'রাজবংশীরা এক সুশৃঙ্খলাযুক্ত সমাজ'। তত্ত্ব-নিষ্ঠার বিচারে এই উক্তিই সমিতির বা সংস্থার সফলতার যথেষ্ট প্রমাণ। এই সমিতির কর্ণধার রূপে ব্যক্তি পঞ্চাননের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় তাহাতে তিনি সমাজের জন্য বহু বিষয়ে যথা শৈক্ষিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনে জাতির সাফলের সূচনা করে যান এবং পরবর্তীকালে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং তত্ত্ব-নিষ্ঠার দিক দিয়া রাঁয় সাহেবের সমাজসেবা বহুল ভাবে সার্থক হইয়াছে।"[৭৩]

তাই আমরা বলতে পারি যে ১৯৭২ এ প্রকাশিত *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত* উপেন্দ্রনাথের দুটো উদ্দেশ্য সফল করেছিল। প্রথমটি ছিল রাজবংশীদের জাগরণে পঞ্চানন বর্মার ভূমিকাকে তুলে ধরা এবং দ্বিতীয়টি ছিল উত্তরখণ্ড দল সহ রাজবংশীদের অন্যান্য বিভেদমূলক দলগুলোকে ক্ষত্রিয় ভাবনার একতাবদ্ধ করে রাখা।

৫.৫.৩.রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ, প্রবচন ও হেঁয়ালী:

রাজবংশী ভাষা সংস্কৃতির প্রতি উপেন্দ্রনাথের সহজাত ভালোবাসা এবং রাজবংশী জাতির প্রতি তার কর্তব্যবোধের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হল ১৯৭৮ সালে রচিত *'রাজবংশী ভাষায়*

প্রবাদ, প্রবচন ও হেঁয়ালী।' [৭৪] ভাষা বিষয়ক এই গ্রন্থটির রচনায় উপেন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজবংশী ভাষার মৌলিকত্ব প্রমাণ করা। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রিয়ারসনের গবেষণা ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন পৌরাণিক সূত্র উল্লেখ করে উপেন্দ্রনাথ উত্তর বাংলার রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ভাষাকে একটি নির্দিষ্ট উপভাষা রূপে প্রমানের অবতারণা করেছিলেন।[৭৫]

উপেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থটিতে মোট **১৭৫**টি রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ প্রচলিত বা সিলকা আছে। এই প্রবাদগুলো মূলত সামাজিক উপদেশ, দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া ও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত। এই গ্রন্থটির সাহিত্যিক বা ভাষাগত মূল্য যাই হউক না কেন একথা বলতে কোনো বাধা নেই যে উপেন্দ্রনাথ জাতীয় রাজনীতির পরিসরে আঞ্চলিকতার ভাবনাকে গুরুত্ব না দিয়েও রাজবংশী জাতির প্রতি তার নিজস্ব দায়বদ্ধতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রবাদ প্রবচনমূলক এই গ্রন্থটি রচনার দ্বারা।

৫.৬.পর্যবেক্ষণ:

১৯৪৭ এ ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত হিসাবে বাংলা প্রদেশের বিভাজন তপশিলি জাতির রাজনৈতিক জীবনে অভূতপূর্ব সংকটের সৃষ্টি করে। তপশিলিদের সংখ্যাধিক্য অংশ পূর্ব বাংলায় থেকে যাওয়ায় পশ্চিমবাংলার তপশিলিরা সার্বিক ভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু বিভাজন-পরবর্তীকালে পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায় ব্যপকহারে উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে পশ্চিমবাংলার স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যপক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এই পরিবর্তন পশ্চিমবাংলার স্থানীয় তপশিলি জাতির মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই বিরূপ

প্রতিক্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই উত্তরবাংলার রাজবংশী জাতিকে।

রাজবংশী জাতির বিরূপ মনোভাবকে সাময়িক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ বর্মন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা গৃহীত ভূমিসংস্কার নীতি কৃষিজীবি রাজবংশীদের সামাজিক সংকটকে চূড়ান্ত মাত্রায় নিয়ে যায়। এই সংকট থেকেই রাজবংশীদের মধ্যে দুটো নতুন ধারার জন্ম হয়। প্রথমটি ছিল আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিভিন্ন সংগঠনের বিকাশ যারা আঞ্চলিক উন্নয়নের স্বপক্ষে মত পোষণ করত। দ্বিতীয়টি ছিল ভাষা-সংস্কৃতি প্রশ্নকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জন্য একটি পৃথক রাজ্যের জন্ম দেওয়া। আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে উপেন্দ্রনাথ বর্মন আঞ্চলিকতার পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থের মধ্যেই রাজবংশীদের সার্বিক উন্নয়নের কথা প্রচার করেছেন। তবে আঞ্চলিকতার দাবিকে সরাসরি সমর্থন না করলেও রাজবংশী জাতির ইতিহাস , সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সর্বোপরি ভাষাগত উন্নয়নের প্রতি উপেন্দ্রনাথ তার নিজস্ব মতামত ও আবেদন রেখে গেছেন তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *উত্তর বাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি,* (জলপাইগুড়ি, বিজয় চন্দ্র বর্মন, ১৩৯২), পৃ. ৪৯। এই সমিতি গঠনের জন্য উপেন্দ্রনাথ বর্মনের নেতৃত্বে ৮ই

নভেম্বর ১৯৬১ সালে দিনহাটায় ক্ষত্রিয় সমিতির সভা আহূত হয়েছিল। এই নতুন সংগঠনটি নথিভুক্ত হয় ১৯৬২ সালে (Reg. No. S 5089 of 1961-62 dated 19.03.62),

২. *তদেব* , পৃ. ৪৯।

৩. বঙ্গীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি : *সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা,* (কলকাতা, ১৯৮৬), পৃ.পৃ. ৩-৪। এর রেজি. নং. ১২০৮৬/৩৯৮/১৯৪৪-৪৫।

৪. *তদেব,* পৃ.পৃ.৬-৭।

৫. মনিভূষণ রায়: *নবপর্যায়ে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির অষ্টম ও নবম বার্ষিক সম্মেলন ১৩৭০,* (ডাউকিমারী, ১৯৬৪)।

৬. *Mayanaguri Declaration, Bharitiya Kamta Rajya Parishad, Circular No. KRP/Dated 8th August, 1986.*

৭. Resolution Passed in the First Annual Conference of the Siliguri Anchalic (Zonal) Kshatriya Samity held on the 8th April, 1955 at Haidarpara, P.O. Ektiasal, Dt. Jalpaiguri, West Bengal.

৮. *উত্তরবঙ্গ, (সাপ্তাহিক), ১লা এপ্রিল, ১৯৬৫,* পৃ. ৩।

৯. *তদেব,*

১০. কলিন্দ্রনাথ বর্ম্মন : *একটি বিরাট জিজ্ঞাসা ওরা বাঙালী না বাহে?* (শিলিগুড়ি, পঞ্চানন আশ্রম, ১৩৭৭)।

১১. *উত্তরবঙ্গ, (সাপ্তাহিক) ১ এপ্রিল, ১৯৬৫,* পৃ. ৩।

১২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন , Rup Kumar Barman: *Contested Regionalism* , (Delhi, Abhijeet Publications, 2007)

১৩. রূপ কুমার বর্মন: বিভাজন ও সংযোজনের অনুরণন: জেলা কোচবিহার, বাংলা বিভাজন ও কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ; *উত্তর প্রসঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা-১* (কোচবিহার, দেবব্রত চাকী, ২০১১), পৃ.২০।

১৪. *Letter of Panchanan Mallick, President, Uttarkhand Dal to the Prime Minister of India, Indira Gandhi,* Dated, Kantivita, The 24th August, 1981.

১৫. Rup Kumar Barman: Partition of Bengal and Struggle for Existaence of the Scheduled Castes: Impact of Partition (1947) on the Rajbanshis of North Bengal, *Voice of Dalit , Volume 2, No 2(July-December),* 2009, পৃ. ১৪১-১৬৩।

১৬. Dilip Banerjee: *Election Recorder, An Analytical Reference, Bengal, West Bengal, 1862-2012*, (Kolkata, Star Publishing House, 2012), পৃ.পৃ. ৩০৭-৩১০।

১৭. *তদেব* , পৃ.-পৃ. ৩৩৭-৩৩৯।

১৮. Election Commission of India: *Statistical Report on General Election 1957 to the Legislative Assembly of West Bengal*, (New Delhi, Election Commission of India, 1957).

১৯. Election Commission of India: *Statistical Report on General Election 1962 to the Legislative Assembly of West Bengal* (New Delhi, Election Commission of India, 1962).

২০. জ্যোতি বসু: *যতদূর মনে পড়ে, রাজনৈতিক আত্মকথন,* দ্বাদশ মুদ্রণ, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫), পৃ. ২০৮।

২১. Dilip Banerjee: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩৪।.

২২. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি,* পৃ.২৫৫।

২৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী): *১৯৬৪ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী* , একবিংশতিতম মুদ্রণ, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫)।

২৪. অরবিন্দ পোদ্দার : *পশ্চিমবাংলা, রাজনৈতিক সমাজতান্ত্রিক বৃত্তে পঞ্চাশ বছর,* (কলকাতা, প্রত্যয়, ২০০০), পৃ. ১০।

২৫. বিমলেন্দু হালদার : পৌণ্ড্রসমাজ ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ, *সমাজ দর্শন (আগষ্ট ২০০৯),* পৃ.পৃ. ৪-৬।

২৬. অরবিন্দ পোদ্দার: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০।

২৭. Dilip Banerjee: *প্রাগুক্ত,* পৃ.৪১৬।

২৮. জ্যোতি বসু: *প্রাগুক্ত, পৃ.*২৪৯।

২৯. *তদেব* , পৃ. ২৪৭; অরবিন্দ পোদ্দার: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১।

৩০. জ্যোতি বসু: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ২৬২-২৬৩।

৩১. Dilip Banerjee: *প্রাগুক্ত,* পৃ. পৃ.৩৮৮-৪২১।

৩২. জ্যোতি বসু: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬৬।

৩৩. D. Bandopadhyay: Land Reforms in West Bengal: Remembering Harekrishna Konar and Binay Chaudhury, *Economic and Political Weekly, Vol-XXXV. (No-21, 27th May 2000),* পৃ. ১৭৯৬।

৩৪. Haripada Ray: 'The Genesis of Uttar Khanda Movement' , in Sukhbilas Barma (ed): *Socio-Political Movement in North Bengal (A Sub-Himalayan Tract); Vol.1,* (New Delhi, Global Vision Publishing House, 2007), পৃ.পৃ. ১১২-১১৫।

৩৫. Dilip Banerjee: *প্রাগুক্ত,* পৃ.১৫৬, পৃ.-পৃ. ৪৪৫-৪৪৭।

৩৬. Haripada Ray: *প্রাগুক্ত,* পৃ.১২০।

৩৭. *তদেব,* পৃ.১২১।।

৩৮. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীকে প্রদত্ত উত্তরখণ্ড দলের স্মারক লিপি, (কান্তিভিটা, ২৪ শে আগষ্ট, ১৯৮১)।

৩৯. দীনেশ ডাকুয়া : *কামতাপুরী একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী জনবিরোধী আন্দোলন,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩), পৃ ২৪।

৪০. *উত্তরখণ্ড দলের দাবিপত্র, (২৩শে এপ্রিল, ১৯৮৯)।*

৪১. Naren Das: 'Uttar Banga Tapasili Jati O Adibashi Sangathan (UTJAS): A Dalit Student Movement ', in Sukhbilas Barma (ed): *Socio-Political Movement in North Bengal, Vol .I* (New Delhi, Global Vision Publishing House, 2007), পৃ. ১৪৩।

৪২. *তদেব,পৃ.* ১৪৩।

৪৩. *তদেব , পৃ.* ১৪৪।

৪৪. *পরিবর্তন (১৬ই আগষ্ট ১৯৮০),* পৃ.পৃ. ২৫-৩১।

৪৫. *তদেব,* পৃ. ২৮।

৪৬. Letter of Shri Prabhat Sen Eshore, President, Central Committee. North Bengal Scheduled Caste and Scheduled Tribe Association; to the Hon'ble Prime Minister of India, Dated 11th August 1980.

৪৭. *তদেব।*

৪৮. Letter of Shyamal Mandal (Indian Council of Scheduled Castes/Tribes) Dated 28/06/80 to Prasenjit Barman M.P, Rajya Sabha.

৪৯. Rup Kumar Barman: *Contested Regionalism,* পৃ. ১৩২।

৫০. তদেব, পৃ. ১৩২।

৫১. *Letter of Prasenjit Barman Dated 5th June 1980* to the Chief Minister of West Bengal.

৫২. *Letter of Dr. Purnya Narayan Sinha* , President of the Bharatiya Koch Rajbongshi Kshatriya Convention, Dated 27th January 1984 to Panchanan Barman, Secretary, Bangiya Kshatriya Samity.

৫৩. *Minutes of the All India Koch Rajbanshi Kshatriya Convention* held on 16th-17th February 1984 at Ginkata Satra, Halakura, Dhubri.

৫৪. *Minutes of the Proceedings of the Second Conference* of the Bharatiya Kshatriya Mahasabha, 23-24 February, 1986.

৫৫. তদেব।

৫৬. তদেব।

৫৭. তদেব।

৫৮. Bharatiya Kamta Rajya Parishad: *Maynaguri Declaration, 8th August 1986, Circular No. KRP.*

৫৯. তদেব।

৬০. তদেব,

৬১.উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত,* চতুর্থ সংস্করণ, (জলপাইগুড়ি, শিবেন্দ্রনাথ রায়, ১৪০৮), পৃ. ৮২।

৬২. *তদেব,* পৃ. ৮২।

৬৩.জটেশ্বর ক্ষত্রিয় সমিতি: *উপেন্দ্রনাথ বর্মনের অভিবাসন* , (জটেশ্বর, জটেশ্বর ক্ষত্রিয় সমিতি, ১৩৬১), পৃ. ৪।

৬৪.*তদেব,* পৃ. ৬।

৬৫.*তদেব,* পৃ. ১০।

৬৬.Haripada Ray: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১২।

৬৭.পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো: *উত্তরখণ্ড আন্দোলন কি ভাওতা? (পরিবর্তন, ১৬ই আগষ্ট ,১৯৮০),* পৃ. ২৮।

৬৮.উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *জলপাইগুড়ি জেলা আনন্দমঠ শতবার্ষিকী উৎসব (১৯৮২) এ প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।*

৬৯.উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* চতুর্থ সংস্করণ, (জলপাইগুড়ি, বিজয়কুমার বর্মন, ১৪০১)।

৭০.রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় আন্দোলন সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা গুলি হল---Swaraj Basu: *Dynamics of Caste Movement, The Rajbanshis of North Bengal 1910-47,* (New Delhi, Manohor, 2003); *Rup Kumar Barman: Contested Regionalism* , (New Delhi, Abhijeet Publications,

2007); Ranjit Kumar *Mandal: Life and Times of Rai Saheb Panchanan Barma* (New Delhi, All India Forum for Development of the Rajbanshis, 2003); Sukhbilas Barma (ed): *Socio-Political Movement in North Bengal (A Sub-Himalayan Tract); 2.Vols.,* (New Delhi, Global Vision Publishing House, 2007); ইত্যাদি।এরা প্রত্যেকেই উপেন্দ্রনাথ বর্মনের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাসকে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

৭১.উপেন্দ্রনাথ বর্মন : *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত,* চতুর্থ সংস্করণ, (জলপাইগুড়ি, শিবেন্দ্রনাথ রায়, ১৪০৮), পৃ. ক।

৭২.*তদেব,* পৃ. ক।

৭৩.*তদেব,* পৃ. ৮৩।

৭৪.উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ, প্রবচন, হেঁয়ালী,* (জলপাইগুড়ি, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, ১৩৮৫)।

৭৫. *তদেব,* পৃ. ঝ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

‘জাতি রাজনীতি’ (Caste Politics) ও ‘জাতীয় রাজনীতির’ পারস্পরিক সম্পর্ক বিংশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক আমলে ঔপনিবেশিক সরকারের শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা -নিরীক্ষা ও জাতীয় আন্দোলনের পরিসরে সৃষ্ট ‘জাতি-রাজনীতি’‘জাতীয় রাজনীতির’ সমান্তরাল ধারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল । মূলত ঔপনিবেশিক সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ভারতীয় নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলি তাদের সামাজিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে জাতি-রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারতের এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল ঔপনিবেশিক বাংলার মাটিতে।

আমরা আমাদের গবেষণায় ল ক্ষ করেছি যে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলি বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক নামে (Depressed Class, Depressed Caste, Exterior Caste, Aboriginal Caste, Semi Hinduised Caste,ইত্যাদি) পরিচিত হতেহতে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তপশিলি জাতির (Scheduled Caste) পরিচিতি বা মর্যাদা পায়। সামাজিক মর্যাদাহীন ও আর্থিকভাবে দুর্বল তপশিলি জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলো (Sub-caste) অতি প্রাচীনকাল থেকেই সামাজিক বঞ্চনার শিকার। বর্তমান গবেষণায় লক্ষ করা গিয়েছে যে ঔপনিবেশিক আমলেও ঔপনিবেশিক -পূর্ব ভারতের (pre-colonial India)সামাজিক অভিশাপ ও সামাজিক বঞ্চনা তপ শিলি জাতির মানুষের দৈনন্দিন জীবন -যাত্রার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে

জড়িয়েছিল। ঔপনিবেশিক আমলের সরকারি প্রতিবেদন ও বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে আলোচিত বর্তমান গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এবিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করেছি। এখানে আরোও লক্ষ করেছি যে বাংলার বিভিন্ন তপশিলি জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম রাজবংশী জাতির প্রাত্যহিক জীবনেও জাতপাতের অভিশাপ লিখিত উপাদানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

জাতপাতের অভিশাপ ও সামাজিক অমর্যাদা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় রাজবংশীসহ অন্যান্য তপশিলি জাতিগুলি সামাজিক মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে ক্ষত্রিয় পরিচিতির জন্য আন্দোলন শুরু করে। আমাদের গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে মূল ত সামাজিক মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে উত্তরবঙ্গে র রাজবংশী সমাজ 'ক্ষত্রিয় আন্দোলনের' সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সামাজিক একতা বৃদ্ধি, সামাজিক বল ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার উপর। রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রানপুরুষ পঞ্চানন বর্মা ও তার সহযোগীগণ রাজবংশী সমাজের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন ও একইসঙ্গে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সমাজ থেকে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় পরিচিতির মর্যাদা আদায় করেছিলেন। শিক্ষাবিস্তার ও আধুনিক পেশা গ্রহনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় আন্দোলন তাদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল। একই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক রাজবংশী জীবনে ক্ষত্রিয়ত্বের ধারণা প্রচারিত হয়েছিল। আর এই ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সূত্র ধরেই উপেন্দ্রনাথ বর্মন তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন।

সামাজিক আন্দোলনের জাতি-রাজনীতির দিকে ধাবমানতা আমাদের গবেষণার অন্যতম একটি বিষয়। বর্তমান গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে ১৯১৯ এর *ভারত শাসন আইন* (*The Government of India Act, 1919*) গৃহীত হওয়ার পর বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সঙ্গে জাতপাতের রাজনীতি শুরু হয়। বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদে তপশিলি জাতির বিভিন্ন জাতি সংগঠন সরাসরি রাজনৈতিক (নির্বাচনী) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীগণ এই ধারা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেনি। বরং ১৯২০ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত সময় কালে বাংলার আইন পরিষদের (Legislative Council) বিভিন্ন নির্বাচনে (১৯২০, ১৯২৩, ১৯২৬ ও ১৯২৯) রাজবংশীগণ তাদের ক্ষত্রিয় সমিতির তত্ত্বাবধানে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

বর্তমান গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আরো লক্ষ করেছি যে সাইমন কমিশনের (১৯২৭) প্রতিবেদন, গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০-৩২), পুণা চুক্তির দ্বারা প্রস্তাবিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন *(The Government of India Act, 1935)* ভারতের নির্বাচন রাজনীতিতে জাতি-রাজনীতির ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধভাবে প্রস্তুত করেছিল। এমতাবস্থায় ১৯৩৭ এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাজবংশী জাতির প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন উপেন্দ্রনাথ বর্মন। বিধায়ক হিসাবে জয়লাভ করে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ। এই সময়ে বিধানসভায় বিধায়কদের নিয়ে গঠিত Independent Scheduled Caste Party র (ISCP) দলনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। বিধানসভায় বাংলার

তপশিলিদের দুঃখ-দুর্দশা ও তাদের সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ বর্মন। কিন্তু ১৯৪০ এর উত্তাল সময়ে বাংলার সরকারের অস্থিরতা ও জাতি-রাজনীতির ভবিষ্যত নিয়ে সন্দিহান উপেন্দ্রনাথ ক্রম শ জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে (কংগ্রেসের নেতৃত্বে) রাজবংশী জাতির সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে আসেন। ১৯৪৬ এর নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের ক মউনিস্ট পার্টি রাজবংশীসহ বাংলার বিভিন্ন তপশিলি জাতিকে তাদের দলের ছত্রছায়ায় টানতে শুরু করে। উপেন্দ্রনাথ রাজবংশী জাতির সার্বিক স্বার্থের কথা ভেবে কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজী হননি। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী কালে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত গণপরিষদের বিকাশ উপেন্দ্রনাথকে জাতি রাজনীতির ক্ষুদ্রগণ্ডী ত্যাগ করে ভারতের জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহান্বিত করে তোলে।

গণপরিষদে প্রবেশ করে উপেন্দ্রনাথ ভারতের সংবিধান রচনা ও ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতের প্রতিনিধি রূপে বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে উপেন্দ্রনাথ যথার্থ অর্থেই ভারতের জাতীয় জীবনের সঙ্গে রাজবংশী জাতির সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি যে উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে *The Untouchability (Offences) Bill, 1954* এর খসড়া তৈরী হয়েছিল এবং পরের বছর তা আইনে পরিণত হয়েছিল। একই সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ Public Accounts Committee এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ বলা যায় যে জাতির আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূত্রধরে উপেন্দ্রনাথ জাতি রাজনীতির বৃত্তে সংযুক্ত

হয়েছিলেন কিন্তু কালক্রমে জাতি -রাজনীতির পরিবর্তে রাজবংশী জাতিকে ভারতের বৃহত্তর জাতীয়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার পথ প্রস্তুত করেছিলেন তিনি।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্ববাংলায় তপশিলি রাজনীতির দুর্বলতা , পূর্ববাংলা থেকে দলে দলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সংকট , প্রভৃতি কারণে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জীবনে নানাবিধ সংকট সৃষ্টি করে। এই সংকটকে আরো ও ঘনীভূত করেছিল স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সরকা রি ভূমিসংস্কার নীতি। ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকের পশ্চিমবঙ্গের ভূমি অধিগ্রহণ, খাসকরণ ও ভূমি বিতরণ উত্তরবঙ্গের কৃষিভিত্তিক রাজবংশী সমাজের অর্থ নৈতিক সংকটকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায় । একই সঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের অবক্ষয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সাংস্কৃতিক সংকট সৃষ্টি করে। উপেন্দ্রনাথ বর্মন জাতীয় রাজনীতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে স্বাধীনতা - পরবর্তী প্রথম দুদশক (১৯৪৭-৬৭) রাজবংশী জাতিকে সর্বোতভাবে ভারতের জাতীয় স্বার্থের সাথে যুক্ত রাখার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছেন। আমাদের গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি যে ১৯৬৭ খ্রি স্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সৃষ্টি ও ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পুণরাগমন ও ভূমিবিতরণের প্রয়াস উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জনমানসে কংগ্রেস ও বামপন্থাবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে। এই মনোভাব চূড়ান্ত আকার ধারণ করে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর খণ্ড দল (UKD) নামে রাজবংশীদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক দল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। উত্তর খণ্ড দল বা পরবর্তীকালে সৃষ্ট উৎজাস(১৯৭৭), ভারতীয় কোচ -রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভা (১৯৮৪), কোচ -রাজবংশী ইন্টারন্যাশনাল (১৯৮৬), কামতা রাজ্য পরি ষদ (১৯৮৬),

কামতাপুর পিপলস্ পার্টি , প্রভৃতি ; উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের জন্য ভাষাভিত্তিক একটি পৃথক রাজ্যের দা বি তোলে। একই সঙ্গে রাজবংশী ভাষা সংস্কৃতির সার্বিক উন্নয়নের প্রতিও এই সংগঠনগুলির সজাগ দৃষ্টি ছিল। উপেন্দ্রনাথ বর্মন রাজবংশী জাতির এই সংগঠনগুলির আঞ্চলিকতার দাবিকে সমর্থন করেননি। বরং জাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজবংশীদের উন্নয়নের কথা ভেবেছেন। রাজবংশী জাতির প্রতি তার দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে রাজবংশী ভাষা, রাজবংশী জাতির ইতিহাস ও তার জীবন সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তার নিজের ভাষায়। এজন্য তাকে আমরা নিম্ন বর্ণীয় জাতির একজন বলিষ্ঠ লেখক হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি 'যিনি নিম্নবর্ণীয় জাতির সামাজিক অমর্যাদার শিকার হয়েও জাতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছিলেন'।

সংযোজনী

সংযোজনী- ১

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমি   তির বর্তমান কেন্দ্রিয় কার্যালয়   , রংপুর।

সংযোজনী-২

রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি স্থাপিত ছাত্রাবাসের বর্তমান অবস্থা, রংপুর।

সংযোজনী-৩:
রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন রাজবংশী সমাজ কর্মীর আলোকচিত্র।

রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা

হরমোহন খাজাঞ্চী

নগেন্দ্রনাথ রায়

উপেন্দ্রনাথ বর্মন

সংযোজনী -৪

The Yeravda Pact (Poona Pact, 1932)

The following is the text of agreement arrived at between the leaders of the Depressed Classes and of the rest of the Hindu community regarding representation of the Depressed Classes in the legislatures. The agreement was adopted by Government in suppression of Paragraph 9 of there decision of the British Government regarding communal representation in the constitution of India:

(1)There shall be seats reserved for the Depressed Classes out of the general electorate seats in the Provincial Legislatures as follows:

Madras 30, Bombay with Sind 15, Punjab 8, Bihar and Orissa 18, Central Provinces 20, Assam 7, Bengal 30, United Provinces 20, Total 148.

These figures are based on the total strength of the Provincial Councils, announced in the Prime Minister's decision.

(2) Election to these seats shall be by Joint electorates subject, however, to the following procedure:

All the members of the Depressed Classes registered in the general electoral roll in a constituency will form an electoral college, which will

elect a panel of four candidates belonging to the Depressed Classes for each of such reserved seats, by the method of the single vote; the four persons getting the highest number of votes in such primary election shall be candidates for election by the general electorate.

(3) Representation of the Depressed Classes in the Central Legislature shall likewise be on the principal of Joint electorates and reserved seats by the method of primary election in the manner provided for in clause two above, for their representation in the Provincial Legislatures.

(4) In the Central Legislature, eighteen per cent of the seats allotted to the general electorate for British India in the said legislature shall be reserved for the Depressed Classes.

(5) The system of primary election to panel of candidates for election to the Central and Provincial Legislatures, as here in before mentioned, shall come to an end after the first ten years, unless terminated sooner by mutual agreement under the provision of clause six below:

(6) The system of representation of the Depressed Classes by reserved seats in the Provincial and Central Legislatures as provided for in clause 1 and 4

shall continue until determined by mutual agreement between communities concerned in the settlement.

(7) Franchise for the Central and Provincial Legislatures for the Depressed Classes shall be as indicated in the Lothian Committee Report.

(8) There shall be no disabilities attaching to any one on the ground of his being a member of the Depressed Classes in regard to any elections to local bodies or appointment to the Public Services. Every endeavour shall be made to secure fair representation of the Depressed Classes in these respects subject to such educational qualifications as may be laid down for appointment to the public services.

(9) In every province out of the educational grant, an adequate sum shall be earmarked for providing educational facilities to the members of the Depressed Classes.

All the leaders present in Poona, including Pandit Malaviya, Dr. Ambedkar, Dr. Solanki, Rao Bahadur Srinivassan, Sir Tyej Bahadur Sapru, Mr. Jayakar, Rao Bahadur M.C. Raja, Mr. P. Ballo, Mr. Rajbhoj and Mr. Sivraj signed the agreement.

Source: A.M. Zaidi & S.G.Zaidi(ed): *The Encyclopaedia of the Indian National Congress: The Battle for Swaraj, Volume Ten: 1930-1935, (New Delhi, S. Chand & Company Ltd, 1980)*, পৃ.-পৃ. ২৬০-২৬১।

সংযোজনী-৫

১৯৩৭ এ নির্বাচিত বাংলার অ-কংগ্রেসী তপশিলি বিধায়কদের তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম
১	রাজা প্রসন্নদেব রায়কত
২	মুকুন্দবিহারী মল্লিক
3	হেমচন্দ্র নস্কর
৪	প্রেমহরি বর্মন
৫	দেবেন্দ্রনাথ দাস
৬	বঙ্কুবিহারী মন্ডল
৭	অনুকূল চন্দ্র দাস
৮	পুলিনবিহারী মল্লিক
৯	ক্ষেত্রনাথ সিংহ
১০	উপেন্দ্রনাথ এদবার
১১	পুষ্পজিত বর্মা
১২	শ্যামাপ্রসাদ বর্মন
১৩	লক্ষ্মীনারায়ন বিশ্বাস
১৪	মধুসূদন সরকার
১৫	ধনঞ্জয় রায়
১৬	অমৃতলাল মন্ডল
১৭	মনমোহন দাস

১৮	জগতচন্দ্র মন্ডল
১৯	পতিরাম রায়
২০	কৃতিভূষন দাস
২১	উপেন্দ্রনাথ বর্মন
২২	তারিনীচরণ প্রামানিক

তথ্যসূত্রঃ Dilip Banerjee: *Election Recorder* , (Kolkata, Star Publishing House, 2012), পৃ. ৫২।

সংযোজনী-৬

তপশিলিদের স্বার্থ রক্ষায় Independent Scheduled Caste Party র পক্ষ থেকে বিধানসভায় উপেন্দ্রনাথ বর্মন পদত্ত ভাষণের (১০ই আগষ্ট, ১৯৩৮) অংশবিশেষ

Mr. Speaker Sir, in the course of Monday's debate Sir George Campbell had deplored that members who had originally supported the Government have now crossed the floor of the house. We do not for a moment concept that Sir George Campbell wanted to a adumbrate a principle of "once a supported, always a supported"; but on behalf of the members of the Independent Scheduled Castes Party, I own it to house to make our position clear, to dispel any mistaken idea that might have been association with his remarks.

At the time of the formation of the Ministry we associated ourselves with it in the hope that the Huq Ministry will blind up a reputation of

good Government, bring in communal concord, impartially and equitably distribute public emoluments taking it up as a duty to level up and ameliorate the condition of the neglected and backward masses of the province. We placed high hopes on the demonstrative speeches of Mr. A.K. Fazlul Huq and got satisfied to see him installed as the Chief Minister of Bengal.

But long 15 months after the assumption of office by the Huq Ministry, it is our considered opinion that the Huq Ministry has completely failed to discharge its duties in a straightforward manner. So far as the reputation of good government is concerned, the Hon'ble Mr. Fazlul Huq's public utterances, times without number, have been carried to the extreme. After the lapse of long 15 months we find that no actual beneficial work worth mentioning had been undertaken in right earnest to ameliorate the condition of the masses or benefit them either educationally, economically, or physically. We find that Bengal is in the the same position today in which it was 15 months ago. Our Ministers are simple proxies of the erstwhile bureaucrats and have acquired the self-same mentality and air themselves in the same fashion. In the language of

the late Bepin Chandra Pal, by the boon of the so-called provincial autonomy we have got brown bureaucrats in the place of white bureaucrats.

As regards policy, they are reciting the kindergarten prepared by their predecessors. Sir, during the 160 years of rule by the white bureaucrats, the country has been impoverished day by day; the peasantry of Bengal are now in a dying condition. If the popular Ministers want to say after the lapse of these 15 months that they cannot do anything overnight, they ought to resign and make room for others to try the same. But they are clinching to their high-salaried jobs by resorting to methods and tactics which are most reprehensible. They have not hesitated to take resort to the fair name of Islam, obviously to perpetuate their continuance. Is it not extremely shameful to proclaim this Ministry as a Muslim Raj, when the Legislature is composed of so many classes and interests and when the Chief Minister's brother in faith realize in their heart of hearts that they are nothing but a subject race? If this sort of nuisance continues, Sir, the dream of communal concord will vanish and this will bring in a serious-repercussion within the province. This play by the self-seeks in death to

the nation's consciousness, and the more we allow the game, the more we injure the cause of the country.

As regards the Scheduled Castes, they have not yet got their oft-promised quota even in the lower grade of the public services and have been left entirely at the mercy of the appointing authorities. A sum of Rs. 5 lakhs had been promised, but no scheme has as yet been attempted or drawn up though the Chief Minister privately promised to do so before the current session. A few of the poor students of the Scheduled Castes ventured to get themselves admitted in schools and colleges with the false hope of getting Government help, but their circumstances allow them no longer to continue.

Sir, let it be stated definitely that we bear no personal malice against any one, neither are we prepared to do perpetual homage to anyone in the Cabinet. We have in our perspective the duty as we read it and the working of the cabinet as a whole. Let it be said that it is one thing to love Mr. Fazlul Huq the man, but it is an entirely different thing to condemn the Hon'ble Mr. Fazlul Huq, the Chief Minister. In the name of the constituency we represent and on behalf of the people of Bengal, we

charge this cabinet and that charge stands unchallenged—that to only maintain the high salaried position, the ministers have not taken up an impartial deal in the matter of appointment to public services, and by resorting to nepotism they have demoralized the conscience of this house. We deem it very oppressive to tolerate this sort of affairs continuing any longer.

Mr. Speaker, Sir, these along with other considerations have forced us to form an Independent Group, with the hope that henceforth we may conscientiously judge every measure on its merits and dissociate ourslaves from anything anti-national, or vindictively detrimental to the cause of any class, community, or interest. We are ready to follow the "give and take" policy and place before the judgment of this House the dictum of "greatest good of the greatest number". We had not been nor are we committed to any other party to follow their dictates, unless and until we are convinced of the justness of the measure, and we hope the House will not misjudge our action. Before I conclude, there is one point which I must emphasise on behalf of our party. It has been demonstrated beyond doubt that the present Government does not enjoy the confidence of the

majority of the Indian members of the House; and what is most significant is that at least two-thirds of the members belonging to the Scheduled Castes have definitely expressed their want of confidence in the present Cabinet. Members like ourselves, who are newcomers in the field of politics, would humbly ask the great British representatives in this House, the redoubtable champions of democratic form of Government, and I ask particularly their leader, to state the principle on which they justify their support for a Ministry which claims to represent different groups in the Legislature but actually do not enjoy their confidence. If the Ministers and I specially refer to these two who represent the Scheduled Castes, have any self-respect left to them, they would have resigned immediately rather than brought upon themselves shame and humiliation by sticking to their posts, depending upon the support of the European Group.

Even at this late hour, I voice the united opinion of our party, and I ask our Ministers, who no longer enjoy the party's confidence, to resign forthwith and save the honour and prestige of the Scheduled Castes of Bengal.

তথ্যসূত্রঃ *Assembly Proceedings , Official Report: Bengal Legislative Assembly, Fourth Session , 1938, Vol.53, Nos. 1-4,* (Alipore, The Bengal Government Press, 1938), পৃ-পৃ ৯২-৯৪।

সংযোজনী -৭

বাংলার বিধানসভার অধিবেসনে (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯) ভবিষ্যত ভারতের 'সংবিধান সভা (Constituent Assembly)' স্থাপন ও সংবিধান রচনা সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বর্মন প্রদত্ত অভিমতের অংশবিশেষ

I beg to move that in paragraph 3 in line 21 of the Resolution, as notified, after the word "constitution" the rest of the paragraph be omitted and the following clause and paragraph be added, namely:--

"be framed by a Constituent Assembly, in which the agriculturists and the labourers of the country will have real, effective and superior representation."

> "This Assembly further authorizes the Government to convey to His Majesty's Government, that in order that India's full co-operation as indicated in paragraph 2 might be a spontaneous one, the declaration in terms as indicated in a paragraph 3 may be made forthwith."

Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble the Chief Minister and after him Mr. Wordsworth spoke elaborately on the first part of the Resolution and I beg to associate myself with their remarks. The first part says that the British Government was forced to take up arms against the German aggression, and I agree with it.

As regards the second and the third parts, I wish to deal with them jointly and my amendment is to that effect. So far as the Congress amendment is concerned, it proposes that unless and until the British Government gives an immediate declaration that India would have independence just after the termination of the war, the Indian people cannot give their full co-operation. Government Resolution on the other hand does not propose any such condition precedent but rather unreservedly supports the war and offers full co-operation on the part of India. In the third part of the Government Resolution the Chief Minister also says that he wants Dominion Status as defined by the Statute of Westminster but that so far as the constitution is concerned, it will be framed after the attainment of Dominion Status in such a way that the rights of the minorities and recognized interests will be safe-guarded. Until

and unless the full support of the minorities is received, that constitution would not be accepted in India. Minority interests are of such vital importance that there should be a consensus of opinion in this case. The Viceroy has stated that he would consider our case if we came to a joint agreement. He says that the British Government has the idea of Dominion Status as the goal of India. Joint agreement is then a real difficulty! It is the suspicion of the Congress Party that joint agreement is an impossible contingency and India will never get Dominion Status. The intension of the Government Resolution so far as I understand it, is that it would not be right to accept the Constituent Assembly as the sole criterion of framing the new constitution. It has been said both by the Hon'ble the Chief Minister and Mr. Jinnah, the President of the Muslim League, that this Constituent Assembly will be nothing but a bigger edition of the Hindu Mahasabha. And the British Government probably means that if we can come to a joint agreement and if the major communities are united in their demand, then they will certainly be ready to grant Dominion Status.

Sir, it must be conceded that this demand of the Britishers is based on certain realities. Until now we find that the Muslim League is quite

suspicious of the Congress on the plea that the Constituent Assembly will be nothing but a greater Hindu Mahasabha which will override the interests of the Muslim minorities. And in such a case, the Britishers will be justified in saying that as you are quarrelling amongst yourselves, how you can accuse us of withholding Dominion Status! So my suggestion is, let both the communities come to a general agreement on the basis of which the country as a whole can advances a untied demand to the British Parliament. And for the formulation of such a demand I suggest that the Constituent Assembly be constituted not on a communal or religious basis but of sound economic principle. On that basis of sound economic principle, the constituent Assembly will be a true spokesman of the masses, the agriculturists and the labourers. Who as producers, of the country's wealth, should have the uppermost voice in the Assembly. Such an Assembly will no doubt faithfully represent the Hindus, Muslims, Indian Christians and other minorities without giving undue importance to their denominations but solely with an eye to their economic betterment. So my appeal to both the Hindus and Muslims is, to take up their stand on the basis of a common economic principle and then proceed to joint

deliberations on that basis. In that case, the poor agriculturists and labourers who are being exploited not only by the foreigner Britishers but also by both the Hindu and Muslim capitalists and middle classes, will no longer be at the mercy of others. So if there is representation on economic principle and not on denominational ground, there will certainly be economic liberation of the masses to some extent.

It might be argued that the representatives of the agriculturists and labourers might not have the talent to frame a constitution for the Indian people but my answer to that is, that not only will there be representatives of the masses in the Assembly but also of other interests and minorities and there will always be some talented members who will try to lead the majority by formulating proposals acceptable to them. In that case, even a minority group belonging to the upper classes might influence the majority group in the Assembly. Then the Hindu-Muslim question would disappear and the question of economic liberation of the masses would come to the forefront.

With these words, Sir, I commend my motion to the acceptance of that House.

তথ্যসূত্রঃ *Assembly Proceedings: Bengal Lagislative Assembly , Sixth Session 1939 Vol.55, No 3,* (Alipore, Bengal Government Press, 1940), পৃ-পৃ, ৯০-৯২।

সংযোজনী -৮

উত্তরবঙ্গে জলসেচ ব্যাবস্থার উন্নয়নের দাবিতে বিধানসভায় উপেন্দ্রনাথ বর্মন প্রদত্ত ভাষণের (১৯ই মার্চ, ১৯৪১) অংশবিশেষ।

Sir, I beg to move that the demand for Rs. 32,13,000 for expenditure under the heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100.

In this House, the Hon'ble Minister in charge of Irrigation has demonstrated how his department has carried out the policy of Government so far as the irrigational problem throughout the whole of Bengal is concerned and member of this House have criticized the Hon'ble Minister regarding that policy. My submission is that much may be said on both sides, regarding that policy as well as the inadequate undertaking of the department concerned. But the irony is that so far as North Bengal is concerned, the Hon'ble Minister has not followed that policy. The only thing that he can point out is that his department has recently taken up the contour survey of North Bengal and nothing more. Even on that matter it may be pointed out, that though the scheme itself, namely, the

contour survey of North Bengal contemplated an expenditure of Rs. 3,95,000, only Rs. 25,000 has been provided in the budget for the year 1940-41, and so far as this scheme is concerned in the budget under discussion only Rs. 35,000 has been provided. I ask the Hon'ble Minister whether he is earnest about the irrigational undertakings in North Bengal. On a rough calculation if matters precede in this way it will take at least 10 years to finish the contour survey. It is evident, that so far as the irrigational problem of North Bengal is concerned, the Ministry does not contemplate that anything should be done during the coming five years. After the contour survey is completed, we will have to consider schemes, estimates, financial difficulties and so on. To speak shortly, the Hon'ble Minister is not earnest about the irrigational needs of North Bengal at all.

I know, Sir, that irrigational matter is a subject which is important all over Bengal and though I speak about the needs of North Bengal, I realize that money spent in other parts of Bengal is a necessity. If the Bengal peasantry is to live, the Bengal Government must spend for it. If we look at the budget, we find that though the Bengal Government have limited resources they have spent enormous sums throughout other parts of

Bengal and that they have neglected North Bengal entirely. Under head "17" we find that as much as Rs. 20, 70, 000 is charged under "Interest". Now under adjustments with the Central Government the capital that is involved in the irrigational works in Bengal has been liquidated or adjusted. Nevertheless that amount was actually spent in other parts of Bengal without spending a pie in North Bengal. The interest has been calculated at 4 percent. And if we calculated from that, it becomes evident that as much as Rs. 5 crores has been spent already by the previous Government in respect of matters of irrigation, embankment, drainage, etc. Thus about Rs. 2 crores has been spent on irrigation and Rs. 3 crores under other heads. That is one aspect of the matter before the Provincial Autonomy came into being. After the present Ministry has come into power, we find that year after year a huge sum is being spent. So far as the present budget is concerned, we find that as much as Rs. 26, 54,000 is going to be spent in the coming year. Out of that the working expenses come to Rs. 8,55, 000 maintenance and repairs Rs. 6,45,000 and works in progress Rs. 3,74,000. So we cannot say that even with the present limited resources of the present Government, the revenue receipts are not quite

enough to spend any large amount. They are actually spending money, but so far as North Bengal is concerned, only Rs. 35,000 has been provided for in the budget for a project which will require as much as Rs. 3,95,000. I would ask this Government and Hon'ble Minister in Charge: what is the idea of the Ministry about North Bengal? Does ....Minister think that North Bengal can wait until this contour survey is completed and until the needs of all other parts of Bengal are met with adequate funds? So far as I can see from the answers to questions that have been put from time to time they think that North Bengal is apart of the province where rainfall is heaviest. At one time, in answer to one of my questions the Hon'ble Minister in charge has said that Jalpaiguri is a district where there is the greatest rainfall in rural Bengal. I want to say this much to the Cabinet that they are entirely ignorant of the conditions so far as North Bengal is concerned. There is no doubt that rainfall is heaviest there but the condition of the soil is entirely different. It has a porous soil. The Soil is entirely sandy. If there is continuous rain for three or four days then of course the land is surcharged with water, but if there be no rain for one or two days the whole water passes away through the porous soil and

even *haimantic* paddy does not get enough water. That is the condition there.

Recently my friend Mr. Khagendra Nath Das Gupta put a question to the Hon'ble Minister asking whether he is aware that in North Bengal there has been failure of crops. The Hon'ble Minister replied "no". I put a supplementary question to enquire whether there was partial failure and the Hon'ble Minister replied in negative. Sir, only two days before that, the Commissioner of the Rajshahi Division held a durbar in Dinajpur and in that durbar speech he pointed out that due to failure of rain there had been partial failure of paddy in North Bengal. Even in places where there was not so much dearth of rain, it is a fact that only eight annas paddy has been grown this year, due to the effect of the rains and due to the condition of the soil obtaining there. Now, Sir, in North Bengal there are small and big rivers carrying with them from the Himalayas fertilizing silts. If by means of an irrigation project we can utilise that silt. I think North Bengal can become the most fruitful soil in the whole of Bengal; but if that is not done, if it be neglected for a number of years, the people of that locality will be ruined economically and famine will be the result. I

therefore appeal to the Hon'ble Minister not to forget the case of North Bengal. We, find, Sir, that the Ministry has been spending enough money for irrigation works throughout the whole of Bengal except North Bengal. My appeal, therefore, is to start irrigation works in North Bengal. Even contour survey is being neglected which clearly proves that the Ministry is not alive to the demands of North Bengal. I also beg to submit that while contour survey and other things are being done in North Bengal, adequate financial help in the shape of subsidy should also be forthcoming for small irrigational projects. My grievance is that even a small irrigation project, costing a sum of Rs. 1,5000 of which only 1/3rd was suggested to be contributed by Government has not met with their approval.

Mr. Speaker, Sir, as I have said, North Bengal is laboring under a two-fold sense of wrong. Firstly, there has been no big scheme to ameliorate the condition of agriculturist of that part of the province by launching upon any irrigational scheme. Though the Ministry has undertaken a contour survey of that part, yet the sum provided this year and the sum going to be financial aspect of the scheme, because though as much as Rs. 3 lakhs 95 thousand is required for that purpose. Only Rs. 35,000 has been

provided for. So, it seems that the Ministry is not earnest about the fulfillment of the irrigational needs of North Bengal. Secondly, Sir, though Rs. 50,000 has been provided for to go on with small irrigational projects of other districts. North Bengal has been left out. So far as irrigation is concerned our part of the province has been most neglected.

Sir, I have brought this motion not with the purpose of opposing the main demand on irrigation. Because that will mean that I am unsympathetic to the irrigational needs of other parts of the province. That is not my real intention. My motion is only intended to bring home to the Ministry the necessities of North Bengal and I hope my North Bengal friends will not go against this motion because that will be unkindest cut of all.

তথ্যসূত্রঃ *Assembly Proceedings: Bengal Legislative Assembly, 1941, Vol.59, Nos. 4-6,* (Alipore, Bengal Government Press, 1941), পৃ-পৃ। ৮০-৮৩।

সংযোজনী--৯

কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের লিখিত “ দশিুয়াল! দশেরে ময়াল (দগি্বলয় horizon) কতদূর?” নামক প্রবন্ধ:

কথায় বলে “আপন বুদ্ধিত্ রাজা, পরবুদ্ধিত ফকির”। কথাটা ঠিক। তেওঁ এমন সময় আইসে, যেলা নিজের বুদ্ধিতে দিশা দুওর পাওয়া যায় না, দিশুয়াল-ক পুছিবার লাগে। তাতে যদি এক-এক দিশুয়াল ভিন্ ভিন্ কথা কয় সে’খনে হয় মুস্কিল—

তোমারাও কন্ ওমরাও কয়, কারবা কথা ধরিম?

দুই নৌকাত্ পাও দিয়া, কি মাঝ দরিয়াত মরিম্?

এহেন মুস্কিল যদি আইসে, সেখন্ শরণ করিবার লাগে পুরাণপুরুষের কথা। হামার-লার মাবাপে কঞা দিসে—

তুই বাছা! সত্যত্ থাক্

আন্ধার রাতিত (তোর) মিলিবে ভাত।।

আত্মারাম মন-পাঞ্জিক পুঁছারি কর। উয়ার ঠিক্ ঠিক্ কঞাদিবে। এই’নন একটা সময় সাঁচা করি আইস্ছে। বাপ-চৌদ্দ পুরুষের আমল হইতে আছিনু হামেরা রাজার বেটা-বেটী। হুটৎ-কার শুনি বলে যে রাজার রাজপাট্ আর থাকে না।

কাঞ-বা কয় এগুলা কথা কাঞ-বা পইতায়?

তিনচন্দ্র উলটি যাবে, রাজপাট যাবার নোঞায়।।

কিন্তু ভাই, দেখিতে দেখিতে রাজার রাজপাটতো উলটি গেইল!! এটাও হাদা-তারা বিধা-তারার লিখন্।

১৯৫০ ইংরাজী সালের ১লা জানুয়ারীর আগত্ হামার দেশের ময়াল আছিল—একটা ছোট্ট রাজ্য কুচবিহার। একে দিনে দেশের এক সীম্ হ’তে আর এক সীম হাটিয়া পার হওয়া গেইছে।

আজি দেশের ময়াল হইল্ ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান। এক সীম্ হ’তে আর এক সীম্ পার হইতে রেল-গাড়িতে লাগিবে সাত দিন সাত আতি। আগে আছিনু বাংলাদেশের এক কোণাত আজি হইছি বাংলাদেশের মধ্যত্। দেশের ময়াল আজি একদিগে হিমালয় পর্বত, আর একদিকে সমুদ্র। ছোট্ট হয় নাই—বড় এ হই’ছে। ভালের নাগি হই’ছে”

১৯৪৯ সালের ২৮শে আগষ্ট হামার মহারাজা রাজ্যের ভালের নিগি হিন্দুস্থানের সাথে রাজ্য-খানক্ যোগ করিয়া দিছে। হিন্দুস্থানের উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেল বড়ো গলায় কইছে—কুচবিহারবাসীর ভালের জন্যে এই কাম্ করা গেইছে। একলা হামার রাজা নোঞ্ঞায়’ হিন্দুস্থানের ৫৬২টা ছোটবড়ো রাজা আছিল। সব্বাঞ আজি হিন্দুস্থানের ভালের জন্যে একেমতো কাম্ ক’রছে। হাজার দিশুয়াল মিলিয়া যেকাম ক’’রছে ভালের নাগিয়া, সেটাতে ভাই তোরও ভাল মোরও ভাল।। “এ’টাও বিধাতারার লিখন্”।। এই কাম যে কেমন করিয়া ভাল – সেকথা শুনিবার চান্? সেকথা আর একদিন কইম্।

দেশের পুরা ময়াল হিন্দুস্থান আর তারে মধ্যে ছোট ময়াল বাংলাদেশ। নেখাপড়াক্ ঝুঁকি নাগাও। চখু ফুটুক্। দেখিবেন —এই বাংলাদেশত জন্ম নি’ছে চৈতন্য গোঁসাই। দুয়ারে দুয়ারে প্রেম বিলাই’ছে। তোর বাড়ীত্ যে তুউসীপাট্ ছয় গোসাইর পাট্ তার জন্ম দি’ছে নদীয়ার ঠাকুর চৈতন্য গোঁসাই। তাঁক্তো তুই ভাই খানিক্ খানিক্ জানিস্। আরো জানিবু, এই বাংলাদেশত জন্ম নি’ছে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, কেশবচন্দ্র; আরো কতো কইম?

যে জমিখানত্ সোনা ফলে, ভালমত হালুয়া সেইখান জমিত্ ডিক্কি হালের মুটি ধরে। যে বাংলাদেশত্ জন্ম নি'ছে চৈতন্য গোঁসাই, তাত তোর ভাল না হ'এঞা হবে কোনঠে? ভগবান যা করে , মঙ্গলের জন্যে। তোর দেশের ছোট ময়াল বাংলা; আর পুরা ময়াল হিন্দুস্থান।

ডিক্কি হালের মুটি ধর, আর ঝুকি নাগেয়া লেখাপড়া কর, আর কারো হিংসা নাকরিয়া তুই সত্যত্ থাক। বাপ-মার আশুব্বাদে—

"আন্ধার রাতিত্ তোর মিলিবে ভাত্"

তোমারে এক ভাই—
উপেন বর্ম্মণ,
জলপাইগুড়ি।
২০।৬।৫০ ইং

সংযোজনী- ১০

কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের লিখিত 'দশেরে ময়ল' নমক প্রবন্ধ (horizon, August 15.1950)

প্রকৃতির চিত্রপটে ভারতের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে দিঁজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন:----

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট সাগর উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা।

বক্ষে দুলিছে মুকুতার হার পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।।

কালের আবর্ত্তে ভারতের এই প্রাকৃতিক রূপের বিকৃতি ঘটিয়াছে। খণ্ডিত বাংলা, খণ্ডিত পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি লইয়া পাকিস্থান সৃষ্টি হইয়াছে এবং কাশ্মীর লইয়া দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ভারতের 'প্রাকৃতিক' ময়াল বিনষ্ট হইয়াছে। আজ রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে ভারতের ময়াল খুঁজিতে হয়।

অৰ্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী কঠোর সাধনায় কংগ্রেস ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা আনিল। ভারত কিন্তু তখনও পাকিস্থান ছাড়াও অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত। প্রাকৃতিক ময়াল দূরের কথা, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতেও ভারতের ময়াল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও অগণিত। ভারতের মধ্যে ৫৬২ টী রাজ্য। কোনটীর বার্ষিক আয় ৮/৯ কোটী কোনটীর বা ৩/৪ শত টাকা, অথচ এঁরা সকলেই এক একটী খণ্ডেশ্বর। শুধু তাই নয়, এই রাজ্যগুলির অস্তিত্বের জন্য ভারত-দেহ শত শতে খণ্ডে বিভক্ত ও অর্থনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক প্রভৃতি সম্পর্কে শতধা বিচ্ছিন্ন ছিল। একই ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস হেতু পরস্পরের স্বার্থ ভিন্ন বলিয়া মনে করিত ও ভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্য অসম্ভব করিয়া রাখিয়াছিল।

আলেকজান্ডার হইতে আরম্ভ করিয়া মামুদঘোরী, পাঠান, মোঘল, ইংরাজ যে ভারতকে যুগে যুগে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিল তাহার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সামন্তরাজগণের খণ্ডেশ্বরত্বের মধ্যেই ভারত স্বাধীনতার ধ্বংশবীজ নিহিত ছিল, বিদেশী তাহা কাজে লাগাইয়াছে মাত্র। কংগ্রেস দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ১৯৪৯ সালের মধ্যেই এই ধ্বংশবীজের মুলোৎপাটন করিয়াছে। খণ্ডশ্বরেতত্বের উচ্ছেদ করিয়া জনসাধারণের অধিকার স্থাপন করিয়াছে। ভারতের ময়াল আর কখনও সঙ্কুচিত হওয়ার আশঙ্কা নাই। জগৎ কংগ্রেসের এই দ্বিতীয় কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে। ইহার তুলনা নাই বলিলেই চলে।

কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের কিন্তু উহা সূচনা মাত্র। অশেষ কৃচ্ছ্রলব্ধ স্বাধীনতা যাহাতে পূর্ণ ও শক্তিশালী হয় তদ্‌সাপেক্ষে কংগ্রেস ভারতের রাষ্ট্রীয় বিধান রচনা করিয়া ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী তাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এই বিধানের মধ্যে ভারতের জীবনীশক্তি নিহিত।

পাতালপুরীর নিঝুম রাজপুরীর মধ্যে রাজকন্যা আঘোর নিদ্রায়নিদ্রিত ছিল, পাশেই ছিল পড়ে তাঁর জীওনকাঠি –সোনার কাঠী। কৃতী রাজপুত্র সেই সোনার কাঠীর সন্ধান পাইয়া ঘুমন্ত রাজকন্যার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। বিশাল রাজপুরীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আজ ভারতলক্ষ্মী নিদ্রিতা আছেন ভারতের গনদেবতাকে আজ জীওনকাঠির সন্ধান করিয়া ভারতকে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। "পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জালকে" অপসারিত করিয়া সঞ্জীবনী মন্ত্রে আজ দীক্ষিত হইতে হবে। গণপরিষদ রচিত বিধানে তার সন্ধানে দেওয়া আছে। তার মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় বিশেষ অগ্রগণ্য।

১ম অধ্যায়ে ভারত মহারাষ্ট্রের ভৌগলিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র আছে বটে কিন্তু সবগুলিই গণরাষ্ট্র কোনটাই সামন্তরাষ্ট্র নহে। কেন্দ্রীয়রাষ্ট্রের কি ক্ষমতা ও অধীন রাষ্ট্রেরইবা কি ক্ষমতা তাহা সপ্তম তফশীলে ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে কূটনৈতিক ভাষায় ভারতীয় বিধান মূলত Unitary কেন্দ্রানুগ শক্তিবিশিষ্ট, Federal সম্মিলিত রাষ্ট্রধর্ম্মী নহে। সুতরাং ভবিষ্যতে ভারত-দেহ খণ্ডিত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নাই!

২য় অধ্যায়ে ভারতবাসী বা ভারতীয় নাগরিক কে তাহাই বলা হইয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভারতীয় বিধানে মারাঠী, বিহারী, বাঙ্গালি অসমিয়া বলিয়া কোনও নাগরিক সংজ্ঞা নাই। ভারতীয় নাগরিকের হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অক্ষুন্ন অধিকার। ভারতীয় নাগরিকের কি কি মৌলিক অধিকার তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয় না। মোটামুটি তাহা এইরূপঃ—

(১) রাষ্ট্রীয়-বিচারে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। ধনী হউক, নির্ধন হউক রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠনে এক ভোটের বেশী দুই ভোট ধনীরও নাই। রাষ্ট্রশক্তির অধিকার যেখানে বা যে সকল প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত তার ত্রিসীমায় উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান রাষ্ট্র কখনই বরদাস্ত করিবে না।

(২) প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় মতামত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। ভারতের যে কোন অংশে বসবাস করার, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জ্জন করার, স্বীয় অভিরুচিমত ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার আছে। ভারতীয় বিধানের দৃষ্টিতে যে কোনও প্রদেশের অধিবাসী অন্য যেকোন প্রদেশে গিয়ে ভারতীয় হিসাবেই অধিকার পাইবে। কুচবিহার রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ার পরদিন হইতে সেখানে মাড়োয়ারী,গুজরাটি, ভাটিয়া বা অসমিয়ার সর্ব্ববিষয়ে অধিকার সাবেক কুচবিহারবাসীর অধিকারের সমান পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। তেমনি কলিকাতা বা গৌহাটিতে বিহারী বা ওরিষার অধিকার বাঙালী বা অসমিয়ার অধিকারের সহিত তুল্য বিবেচিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক নাগরিক স্বীয় ধর্ম্ম বিশ্বাস পালন করার অধিকারী ইত্যাদি।

সংক্ষেপে বলিতে হয় যে ভারতীয় বিধানের লক্ষ্য যে ভারতবাসী তার সামাজিক জালজঞ্জাল স্বরূপ জাতিভেদ ভুলিয়া যাউক, বাঙালী বিহারী ভেদ ভুলিয়া একমাত্র ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিচয় দিক। অতীতের ধর্ম্মান্ধতা বিদূরিত করিয়া সত্যম্‌শিবম্‌সুন্দরমরূপী ধর্ম্মকে উদ্‌জীবীত করুক, রাষ্ট্রহিতকে ধর্ম্মান্ধতা মুক্ত করুক। মেঘমুক্ত রবির কিরণে ভারতের আকাশ (বাতাস) সঞ্জীবীত হইয়া উঠুক। মাতৃপূজা সার্থক হউক।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মন

সংযোজনী- ১১

উপেন্দ্রনাথ বর্মনসহ প্রথম লোকসভার সদস্যগণ

Ist Row (Sitting) L to R : Shyam Nandan Mishra, Jagannathrao Krishnrao Bhonsle, Ganesh Sadashiv Altekar, Dr. N. B. Khare, B.R. Bhagat, V. B. Gandhi, Pandit Thakur Das Bhargava, Shrimati B. Khongmen, Raj Bahadur, Shrimati Sushma Sen, Awadheshwar Prasad Sinha, V.V. Giri, M.C. Shah, Hari Vinayak Pataskar, Dr. Panjabrao S. Deshmukh, Dr. B.V. Keskar, V.K. Krishna Menon, Khandubhai Kasanji Desai, Ajit Prasad Jain, Sardar Swaran Singh, C.C Biswas, Dr. Kailas Nath Katju, Satya Narayan Sinha, Jawaharlal Nehru (Prime Minister), M Ananthasayanan Ayyangar (Speaker), Sardar Hukam Singh (Deputy Speaker) Rajkumari Amrit Kaur, Jagjivan Ram, Gulzari Lal Nanda, T.T. Krishnamachari, K. C. Reddy, Mahavir Tyagi, D.P. Karmarkar, Keshava Deva Malaviya, Arun Chandra Guha, Shrimati Ammu Swaaminadhan, Nityanand Kanungo, Balwant Nagesh Datar, Shrimati M. Chandrasekhar, Hirendra Nath Mukerjee, **Upendranath Barman**, Balvantray Gopaljee Mehta, M.M. Shah, Frank Anthony, Shrimati Uma Nehru, B. Das, Shrimati Renu Chakravarty.

সংযোজনী- ১২

উপেন্দ্রনাথ বর্মনের আলোকচিত্র

সংযোজনী- ১৩

৬কঃ নবপর্যায়ে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির বার্ষিক সম্মেলন ১৩৭০ এর প্রতিবেদনের প্রচ্ছদের প্রতিলিপি, ও ৬খঃ জটেশ্বর ক্ষত্রিয় সমিতির সম্মেলনে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের প্রদত্ত সভাপতির ভাষনের প্রথম পাতার প্রতিলিপি ।

৬.ক.

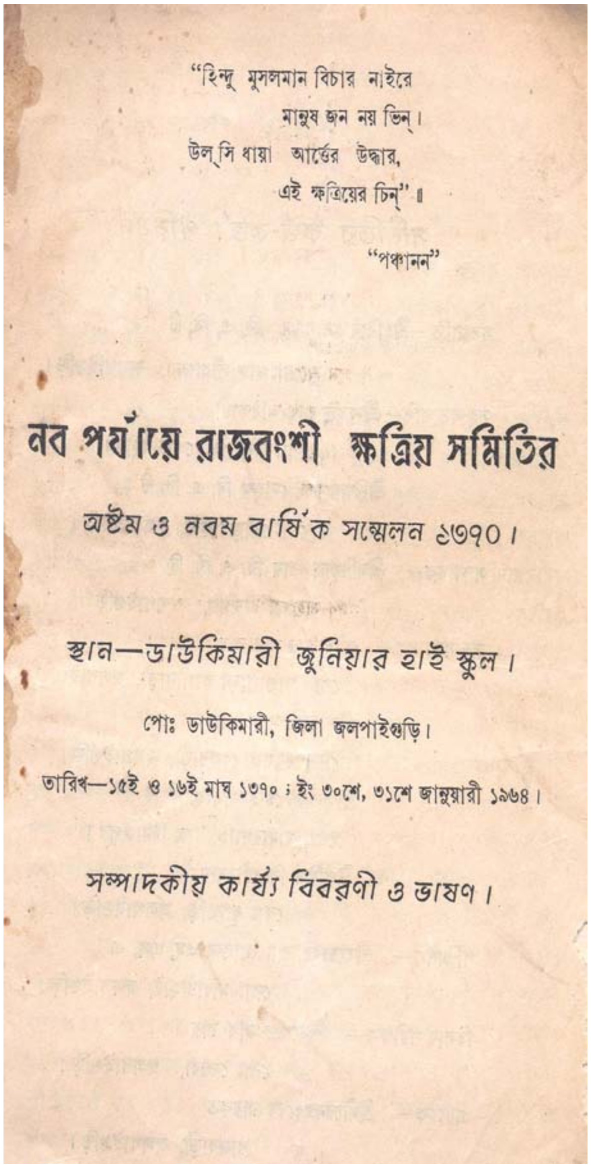

"হিন্দু মুসলমান বিচার নাইরে
মানুষ জন নয় ভিন্।
উল্‌সি ধায়া আৰ্ত্তের উদ্ধার,
এই ক্ষত্রিয়ের চিন্" ॥

"পঞ্চানন"

নব পর্যায়ে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির

অষ্টম ও নবম বার্ষিক সম্মেলন ১৩৭০।

স্থান—ডাউকিমারী জুনিয়ার হাই স্কুল।

পোঃ ডাউকিমারী, জিলা জলপাইগুড়ি।

তারিখ—১৫ই ও ১৬ই মাঘ ১৩৭০ ; ইং ৩০শে, ৩১শে জানুয়ারী ১৯৬৪।

সম্পাদকীয় কার্য্য বিবরণী ও ভাষণ।

৬.খ.

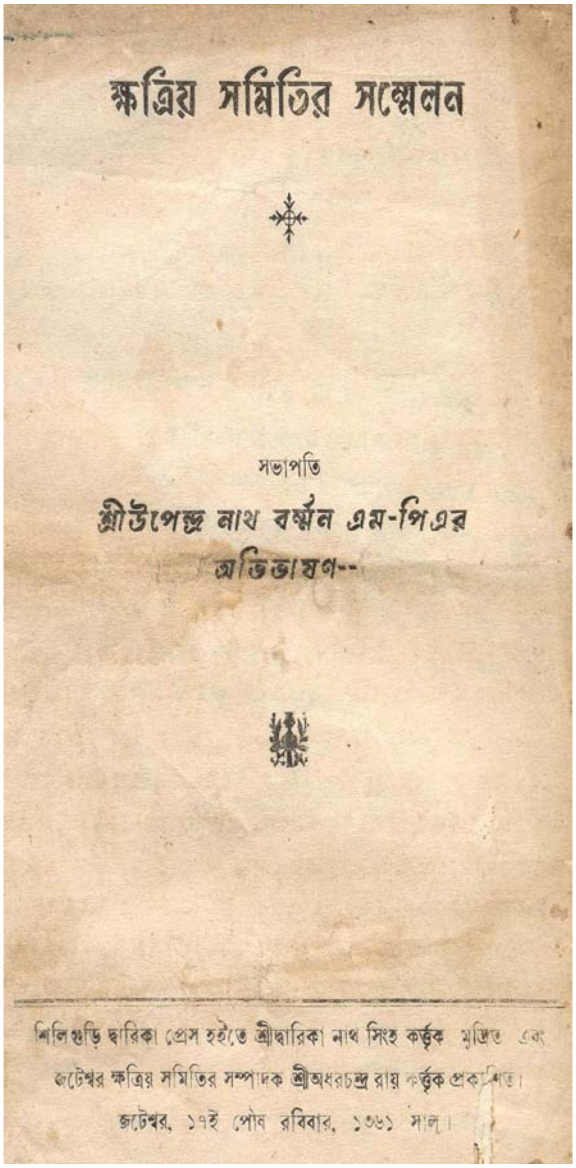

ক্ষত্রিয় সমিতির সম্মেলন

সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্ম্মন এম-পিএর

অভিভাষণ--

শিলিগুড়ি দ্বারিকা প্রেস হইতে শ্রীদ্বারিকা নাথ সিংহ কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং
জটেশ্বর ক্ষত্রিয় সমিতির সম্পাদক শ্রীঅধরচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
জটেশ্বর, ১৭ই পৌষ রবিবার, ১৩৬১ সাল।

সংযোজনী- ১৪

৭কঃ উপেন্দ্রনাথ বর্মন রচিত *'রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ , প্রবচন ও হেয়ালী* এর প্রচ্ছদ ও ৭খঃ পুস্তক পরিচিতি পত্রের প্রতিলিপি।

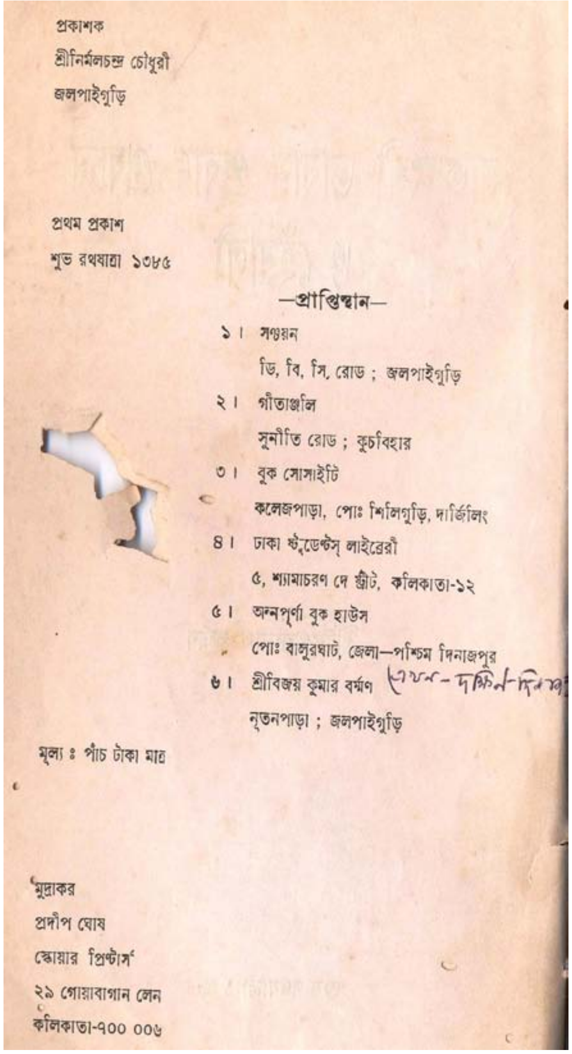

প্রকাশক
শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী
জলপাইগুড়ি

প্রথম প্রকাশ
শুভ রথযাত্রা ১৩৮৫

—প্রাপ্তিস্থান—

১। সঞ্চয়ন
ডি, বি, সি, রোড ; জলপাইগুড়ি
২। গীতাঞ্জলি
সুনীতি রোড ; কুচবিহার
৩। বুক সোসাইটি
কলেজপাড়া, পোঃ শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
৪। ঢাকা ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৫। অন্নপূর্ণা বুক হাউস
পোঃ বালুরঘাট, জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর
৬। শ্রীবিজয় কুমার বর্ম্মণ
নূতনপাড়া ; জলপাইগুড়ি

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর
প্রদীপ ঘোষ
স্কোয়ার প্রিণ্টার্স
২৯ গোয়াবাগান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সংযোজনী- ১৫

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে উত্তর খন্ড দলের পাঠান স্মারকলিপির প্রথম পাতার প্রতিলিপি।

BANDE MATRAM

UTTAR KHANDA DAL

Head Office : **KANTI-VITA, Dist. DARJEELING**

From : PANCHANAN MALLICK
Chairman of the Presidium
UTTAR KHANDA DAL
P. O. Bhangarhat, Dist. **Jalpaiguri**
Pin. 735224

To : SRIMATI INDIRA GANDHI
The Hon'ble Prime Minister of India
NEW-DELHI

Respected Madam,

Under authority from the Executive Committee of the Uttar Khanda Dal as envisaged in its Resolution dated 17. 8. 81, I on behalf of that Committee and the Dal itself and for the matter of that of the much exploited aboriginal inhabitants of North Bengal irrespective of their caste, creed, religion, sex and political shades, would like, with all humility and deference to you, to invite your kind attention to the two memoranda submitted to you on previous occasions, one by me on 22nd April 1980, and the other by Shri Sampat Roy, General Secretary of the Dal on 27th March/81 on the matter of demand for a separate state within the Indian Union curved out of five districts of North Bengal viz, Cooch Behar, Jalpaiguri, Darjeeling, West Dinajpur and Malda.

The Executive Committee of the Dal felt very much disappointed and pained at the tight lipped silence of the Govt of India for more than a year now on its just demand for a separate state within the Indian Union. This has compelled the Dal to give vent to its dissatisfaction on different platforms and through various newspaper media. But the Govt of India thought it convenient to ignore all these as occasional barks of few interested jaunts. The Govt. of India might have adopted this callous attitude on the advice of some of its interested leaders. But the fact must clearly be stated without any sort of ambiguity that the Dal is firm in its stand and shall not rest a while or lie low with any kind of threat till it has achieved its goal of a

(Contd. on page 2)

সংযোজনী- ১৬

কোচ-রাজবংশী ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি ডঃ পূর্ণনারায়ণ সিনহার লেখা একটি চিঠির প্রতিলিপি।

KOCH-RAJBONGSHI INTERNATIONAL

(An organisation of Koch-Rajbongshi-Kshatriyas, everywhere)
H. O. TEZPUR : ASSAM : INDIA
(Branches — Cochbehar, Jhapa, Tura & Bongaigaon)

Mahajati Path,
TEZPUR-784001 (Assam)

Patron :
Maharani Gayatri Devi of Jaipur

President :
Dr. Purnanarayan Sinha of Tezpur

Vice-Presidents :
Kr. P. Narayan of Cochbehar
Sh. Panchanan Mallik of Bhangarhat (N. B.)
Sh. Gopalsingh Rajbongshi of Bhadrapur (Nepal)

Secretary-General :
Sh. Prabhash Singha Shastri of Bhulki (N. B.)

Joint Secy.-General :
Sh. Phulsingh Rajbongshi of Jhapa (Nepal)
Dr. K. K. Baruah of Sorbhog (Assam)

REF :

The 5th April, 1986.

Dear Burman Dada,

I send you my greetings for the ensuing Nava varsha and festival, for which we are all looking forward eagerly. I proposed to spend the Baisakhi holidays with you, but could not do so.

As per resolution No. 10 demanding Union Territory Status for erstwhile Cochbehar State we have to take out a deputation to Delhi to meet the Union Home Minister, Prime Minister & others. We will get support from non-Left national political parties because they are eager to dismantle the Left-Front Vote Bank in North Bengal.

I invite you to come to Madhupur Shrimanta Shankardeva Dham near Cochbehar on the 25th of Baisakh (9 th May) next. I request you to bring your 'draft' of the Memorandum to be submitted to the Union Government. We will finalise it there. I shall carry my typewriter, type it out and then those of us selected to form the deputation to go to Delhi, will proceed as per plan we discussed at our Burirhat Conference. We may visit Tarai-Nepal now or in future. Our people there are busy with the election. I shall spend Rs.2,500.00 for the travelling and other expenses. The rest will be your contribution. We will need Rs.5,000.00 minimum for the journey.

This may kindly be treated as most urgent. But I shall move from here only when I receive your confirmation, that you are ready with money.

With best regards,

Yours Sincerely,
(PURNA NARAYAN)

Shri Panchnan Burman,
Milanpally,
Calcutta-79

সংযোজনী- ১৭

কোচ-রাজবংশী ইন্টারন্যাশনালের দ্বারা প্রচারিত বীর চিলারায় পত্রিকার একটি পাতার প্রতিলিপি।

BIR CHILARAI 16 February 1984 Introductory Issue

Read

CONVERT COCH BEHAR TO A UNION TERRITORY DEMANDS A MEMORANDUM

The Coch Behar Peoples 'Welfare' Association has reminded the Government of India its assurance dated 11 September, 1949 and that of West Bengal Government dated 1 January, 1950, for solution of various political and economic problems of the erstwhile princely State, and made a demand for constitution of Coch Behar district as a Union Territory. The memorandum states that Sir Jagaddipendra Narayan Bhup Bahadur through a special agreement dated 11 Sept., 1949, handed over the State and its people for the sake of its development and their prosperity and Sardar Ballabh Bhai Patel, the then Home Minister of India declared that the Government of India was fully aware of the various problems of the people of Coch Behar and assured that the people could achieve their honourable place in the political and administrative setup of India and for this noble purpose the Government of India requested the people of Coch Behar to co-operate with the Government of India 'as a united team'. At the same time according to the wishes of the people of Coch Behar and the Maharaja the Government of India decided to keep Coch Behar under the Central Administration and actually did so from 11 Sept. to 31 December, 1949.

During this period the then Chief Minister of West Bengal Dr. Bidhan Chandra Roy requested the Govt. of India to transfer Coch Behar to West Bengal Sadar Patel deputed Mr. Haider Ali, the then Governor of Assam to verify whether the people of Coch Behar were agreeable to accept merger of Coch Behar with West Bengal. In 1949 the people speaking Bengali and not belonging to the Rajbongshi community were not more than thirty thousand only as against eleven lakhs of local origin, who spoke a language different from Bengali and had a different culture. After investigation Mr. Ali wrote a strong letter opposing the merger, whereupon Sadar Patel wrote to Dr. B. C. Roy — 'From all evidence independent or otherwise it seems that the merger with West Bengal is locally unpopular. This is a difficult problem ; we have to think about it lest we have to provoke unpleasant local situation··· ····'. This was followed by a declaration of Pundit Jawaharlal Nehru at a public meeting held at Calcutta later in the year 'the question of merger of Coch Behar with West Bengal could be decided according to the wishes of the people··· ····' (see Patel's Correspondence 1945-50, Vol. 8 p 413). Pundit Nehru indicated taking a plebiscite. But more letters published in the Patel's Correspondence prove that Dr. B. C. Roy misguided Sardar Patel and Government of India merged Coch Behar with West Bengal with effect from 1 January, 1950, but the backward people, leaderless after the removal of the Maharaja from power, meekly submitted their fate and future to the altar of sacrifice. Dr. B. C. Roy betrayed the people of Coch Behar.

Although Dr. Roy assured that he would take steps to ensure all round development of Coch Behar and remove its backwardness, in practice the successive Government of West Bengal failed to improve the life and conditions of the people as the result of which today about 90 per cent of the indigenous Coch Beharis are below the poverty line and many of them have been facing starvation. While the people are poor and starving the glory that Coch Behar was has vanished even from the minds of those who own and belong to it and the rising generation hardly knows what was left behind for their people by the glorious King Naranarayana who was the Vikramaditya of the East. The old relics and monuments of the Koch Kings have either been thrown away or eaten up by the surge of the devourers from outside, mostly from east and south Bengal. Under the Left Front regime which is ruling West Bengal for nearly a decade now the law and order situation of Coch Behar is the worst and the local Rajbongshis are at the receiving end on all occasions of violence while their exploitation continues unabated. They have been reduced to serfs of those who were cleverer than they are and whom the Government at all times during the past 34 years abetted to suck the blood of life out of the local Rajbongshi people, known as the "Deshi".

(3)

সংযোজনী- ১৮

রাজবংশী ভাষা সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের অভিমতসহ তার হাতে লেখা একটি চিঠির প্রতিলিপি

চন্দ্রমনি ট্রাষ্ট এষ্টেট

সক্রেটারী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মন

জেলা ও পোষ্টাফিস—জলপাইগুড়ি

ফোন নং ৫০১

তাং ১৪/৭/৬০

[illegible]

[illegible] dialect [illegible]

[illegible]

তথ্যসূত্রঃ পরিতোষ দত্তঃ উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, (কলকাতা, সহজপাঠ, ২০০০), পৃ.১১৯

সংযোজনী- ১৯

১৯ ক. উপেন্দ্রনাথ বর্মন লিখিত রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাসের প্রচ্ছদ, ও ১৯খ উপেন্দ্রনাথ বর্মন লিখিত ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিতের প্রচ্ছদ

১৯.ক

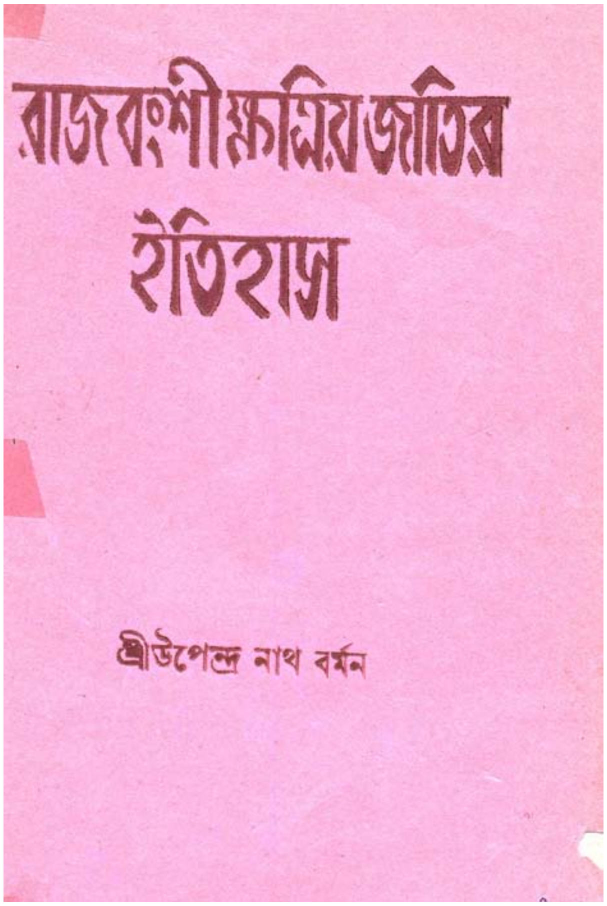

১৯ খ

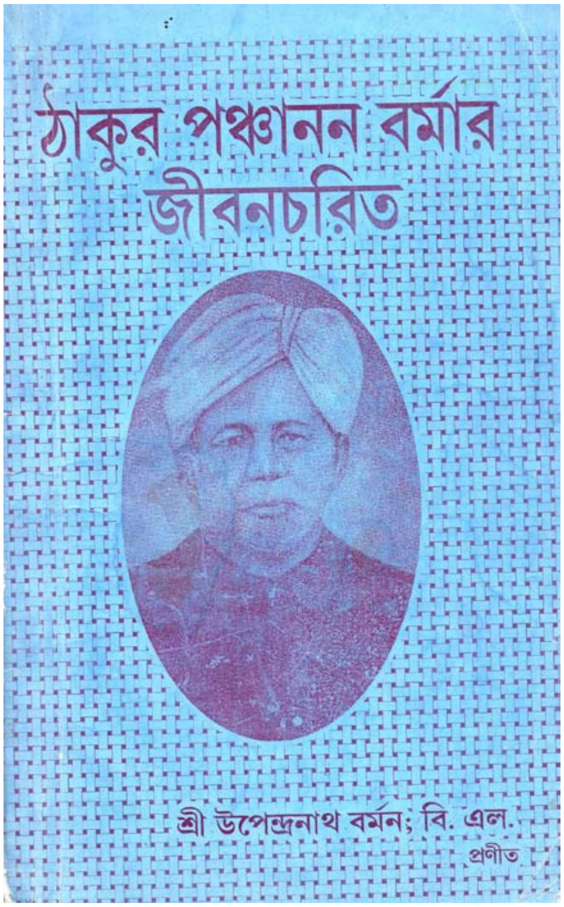

গ্ৰন্থপঞ্জী

মৌলিক উপাদান

অসমীয়া

লেখারু, উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ: *কথা গুৰুচৰিত*, হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱা (স.): ৪ৰ্থ সংস্কৰন, গৌহাটি, দত্তবৰুৱা পাবলিশিং কো: প্ৰা: লি:, ২০০২।

সূৰ্যখড়ি দৈবজ্ঞ: *দৰং ৰাজবংশাবলী*, নবীন চন্দ্ৰশৰ্মা (স), গুয়াহাটি, বানী প্ৰকাশ, ১৯৭৩

ঠাকুৰ, ৰামচৰণ : *গুৰুচৰিত (শ্ৰীমন্তশংকৰদেবেৰ লীলাচৰিত),* ১ ৮শ প্ৰকাশ, হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুয়া(স), গুয়াহাটি, দত্তবৰুয়া পাবলিশিং কো: প্ৰা: লি:, ২০০১।

ইংৰেজী (সৰকাৰি প্ৰকাশনা, প্ৰতিবেদন/চিঠিপত্ৰ/আবেদনপত্ৰ/Proceedings/Bill/ Minutes/ইত্যাদি)

Assembly Proceedings of Bengal Legislative Assembly, Alipore, Bengal Government Press, 1937.

Assembly Proceedings , Official Report: Bengal Legislative Assembly, Fourth Session , 1938, Vol.53, Nos. 1-4, Alipore, The Bengal Government Press, 1938.

Assembly Proceedings: Bengal Legislative Assembly, Sixth Session, 1939 Vol.55, No 3, Alipore, Bengal Government Press, 1940.

Assembly Proceedings: Bengal Legislative Assembly , 1941, Vol.59, Nos. 4-6, Alipore, Bengal Government Press, 1941.

Assembly Proceedings: Bengal Legislative Assembly , Vol. LXIII, No-I, Alipore, Bengal Government Press, 1942.

Beverley, H: *Report on the Census of Bengal 1872*, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1872.

Bharatiya Kamta Rajya Parishad: *Maynaguri Declaration, Circular No. KRP. Dated 8th August 1986.*

Choudhuri, H.N.: *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement*, Cooch Behar, The Cooch State Press, 1903.

Election Commission of India: *Statistical Report on General Election 1957 to the Legislative Assembly of West Bengal*, New Delhi, Election Commission of India, 1957.

Election Commission of India: *Statistical Report on General Election 1962 to the Legislative Assembly of West Bengal*, New Delhi, Election Commission of India, 1962.

Government of West Bengal : *Short Note on Scheduled Castes of West Bengal*, Kolkata , Cultural Research Institute, 2005.

Hodgson, B.H.: *Essay on the Koch, Bodo and Dhimal Tribes*, Calcutta, Baptist Mission Press, 1847.

Hunter, W.W.: *Statistical Account of Bengal, 20 Vols.*, London, Trubner and Co. (1875-76), reprinted in India, New Delhi, Concept Publishing Company, 1984

Letter No. 340 dated 8th April, 1873 From W.S. Well Esq. Magistrate of Furredpore to the Commissioner of the Dacca Division.

Letter No. 106. Dated 19th April 1873, From M.D. Bose , (Superintendent of the Alipore Jail), to W.S. Wills. Esg, (Magistrate of Fureedepore).

Letter of Dr. Purnya narayan Sinha , President of the Bharatiya Koch Rajbongshi Kshatriya Convention, Dated 27th January 1984 to Panchanan Barman, Secretary, Bangiya Kshatriya Samity.

Letter of Panchanan Mallick, President, Uttarkhand Dal to the Prime Minister of India, Indira Gandhi, Kantivita, 24th August, 1981.

Letter of Prabhat Sen Eshore, President, Central Committee, North Bengal Scheduled Caste and Scheduled Tribe Association; to the Hon'ble Prime Minister of India, Dated 11th August 1980.

Letter of Prasenjit Barman, Dated 5th June 1980 to the Chief Minister of West Bengal.

Letter of Shyamal Mandal (Indian Council of Scheduled Castes/Tribes) Dated 28/06/80 to Prasenjit Barman, M.P, Rajya Sabha.

Martin, Montgomery: *History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India Vol. 3, Rangpur and Assam (1838),* reprint edition, Delhi, Cosmo Publications, 1976.

Minutes of the All India Koch Rajbanshi Kshatriya Convention held on 16th-17th February, 1984 at Ginkata Satra, Halakura, Dhubri.

Mitra, H.N.(ed): *The Government of India Act 1919: Rules Thereunder & Government Reports,* Calcutta, Annual Registrar Office, 1921.

Proceedings of the Second Conference of the Bharatiya Kshatriya Mahasabha, 23-24 February, 1986.

Resolution Passed in the First Annual Conference of the Siliguri Anchalic (Zonal) Kshatriya Samity held on the 8th April, 1955 at Haidarpara, Jalpaiguri, West Bengal.

Risley, H.H.: *The Tribes and Castes of Bengal, 2 Vols.* Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1891.

The Bengal Lagislative Council Proceedings, Vol. XVI, Calcutta, Bengal Secretariat Pres, 1924 .

The Constitution (Scheduled Castes) Order 1950, Ministry of Law Notification No. S.R.O. 385, dated the 10th August, 1950, *Gazette of India, Extraordinary, 1950, Part II, Section 3.*

The Government of India : *The Government of India Act ,1935 (As Amended upto 15th August 1943),* New Delhi, The Government of India Press, 1943.

The Government of India Scheduled Caste Order, 1936, At the Court at Buckingham Palace, The 30 day of April 1936.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order , 1956, Ministry of Home Affairs, New Delhi, 29th October 1956, published in *The Gazette of India , Extra Ordinary , Part II-Section 3, No 316.*

The Untouchability (offences) Bill, 1954, Bill No. 14B of 1954.

Wise, James: *Notes on the Races, Castes Trades of Eastern Bengal,* London, Harrisons and Sons, 1883.

Zaidi, A.M. and Zaidi, S.G. (eds): *The Encyclopaedia of the Indian National Congress, Vol.Ten, 1930-1935, The Battle for Swaraj*, New Delhi, S. Chand & Company Ltd.,1980.

Zaidi, A.M. (ed): *The Encyclopeadia of the Indian National Congress, Vol., Eleven, 1936-1938, Combating an Unwanted Constitution*, New Delhi, S. Chand & Company Ltd. ,1980.

বাংলা

অধিকারী, রমেন্দ্রনাথ(স): *রায়সাহেব পঞ্চানন রচনাবলী,* কোচবিহার, প্রতিমা কার্জী, ১৩৯৮।

অধিকারী, হরকিশোর : *রাজবংশী কুলপ্রদীপ,* প্রথম প্রকাশ, ১৩১৫ সন, অসমীয়া অনুবাদ, ললিতনারায়ণ দেব (স): গৌরিপুর, প্রান্তবাসী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৭৮।

উত্তরখন্ড দল: *মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রদত্ত স্মারক লিপি,* কান্তিভিটা, ২৪ শে আগষ্ট ১৯৮১।

উত্তরখন্ড দল: *দাবিপত্র,* ২৩শে এপ্রিল ১৯৮৯।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *ক্ষত্রিয় সমিতি কার্য্যবিবরণী, প্রথম বর্ষ,* রঙপুর নাট্যমন্দির, ১৮ই বৈশাখ, ১৩১৭।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *চতুর্থ সম্মীলনী ও কার্য্যবিবরণী ও তৃতীয় বর্ষ বৃত্তবিবরণী* , রংপুর, মনোহর বর্ম্মা, ১৩২০।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *পঞ্চম বার্ষিক সম্মিলনী কার্য্যবিবরণী,* রংপুর, ১৩২১।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *কার্য্যবিবরনী, ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনী* , ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই আষাঢ়, ১৩২২।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *কার্য্যবিবরণী, সপ্তম বার্ষিক সম্মিলনী,* রংপুর, ১৯১৬।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *বার্ষিক সম্মিলনী (৪ঠা , ৫ই ও ৬ই আষাঢ়) ও ১৩২১ সালের বৃত্তবিবরন* রংপুর, ১৩২২

ক্ষত্রিয় সমিতি: *কার্য্য বিবরণী: দশম বার্ষিক অধিবেশন,* রংপুর, ১৩২৬।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *দশম সম্মিলনী (৩২শে জৈষ্ঠ ও ১লা আষাঢ় ও ২রা আষাঢ় , ১৩২৬) কার্য্যবিবরণী* , রংপুর, শ্রীমনোহর বর্ম্মা, ১৯২০।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *একাদশ সম্মিলনী কার্য্যবিবরণী* , রংপুর, শ্রীমনোহর বর্ম্মা, ১৩২৭।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *ঊনবিংশ বার্ষিক সম্মিলন প্রতিবেদন,* ভোটমারী হাইস্কুল প্রাঙ্গন, ১৫-১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৫।

জটেশ্বর ক্ষত্রিয় সমিতি: *উপেন্দ্রনাথ বর্মনের অভিভাষন* , জটেশ্বর, জটেশ্বর ক্ষত্রিয় সমিতি, ১৩৬১।

দাস, রিপুঞ্জয়: *মহারাজবংশাবলী,* নৃপেন্দ্রনাথ পাল (স), কোচবিহার, ১৩৮৩।

নস্কর, সনৎকুমার ও অন্যান্য(স): *পৌণ্ড্র মণীষা,* সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসংঘ, ২০১২।

বঙ্গীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি: *সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা,* কলকাতা, ১৯৮৬।

বর্মন, উপেন্দ্রনাথ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস* , ৪র্থ সংস্করণ ,জলপাইগুড়ি, বিজয়কুমার বর্মন, ১৪০১ সন।

বর্মন, উপেন্দ্রনাথ: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত,* জলপাইগুড়ি, ১৩৭৯ সন, চতুর্থ সংস্করণ, জলপাইগুড়ি, শিবেন্দ্রনাথ রায়, ১৪০৮।

বর্মন, উপেন্দ্রনাথ : *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি* , জলপাইগুড়ি, বিজয় চন্দ্র বর্মন, ১৩৯২।

বর্মন, উপেন্দ্রনাথ : *জলপাইগুড়ি জেলা আনন্দমঠ শতবার্ষিকী উৎসব (১৯৮২) এ প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।*

বর্মন , উপেন্দ্রনাথ: *রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ, প্রবচন, হেঁয়ালী,* জলপাইগুড়ি, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, ১৩৮৫।

বৈরাগী, রাধাকৃষ্ণ দাস: *গোসানী মঙ্গল,* নৃপেন্দ্রনাথ পল (স): কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী, ১৯৯২।

মুন্সী, জয়নাথ: *রাজোপাখ্যান,* বিশ্বনাথ দাস (স), কলকাতা, মালা প্রকাশনী, ১৯৮৯।

রায়, কুঞ্জবিহারী (স): *ক্ষত্রিয় সমিতি কার্য্যবিবরণী,* জলপাইগুড়ি, পঞ্চানন স্মারক সমিতি, ১৩৮৯।

রায়, দীপক কুমার : রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন বর্মা, কলকাত, ছায়া পাবলিকেশন, ২০১৬।

রায়, মণিভূষন : *নব পর্যায়ে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির অষ্টম ও নবম বার্ষিক সম্মেলন,১৩৭০,* ডাউকিমারী, ১৯৬৪।

সরকার, পঞ্চানন: *নাদিম পরামানিকের পাঠা* , রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩১৬, পুনঃমুদ্রণ, বাঘধেনুক, জলপাইগুড়ি, নর্থ ইস্টার্ন ফাউন্ডেশন ফর সোসাল সাইন্সেস, ১৪০৮, পৃ.-পৃ. ১-৩।

সরদার, রাইচরন: *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা* , সনৎকুমার নস্কর ও অন্যান্য(স) : *পৌণ্ড্রমনীষা,* সোনারপুর, পৌণ্ড্রমহাসংঘ, ২০১২।

সিংহ , ক্ষেত্রনাথ: *রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার জীবনী বা রঙ্গপুর ক্ষত্রিয় সমিতির ইতিহাস,* রংপুর, নিত্যানন্দ বর্মা, ১৩৪৬, নৃপেন্দ্রনাথ পাল (স), কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী, ২০০৮।

সংস্কৃত

বৃহৎধর্মপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন(স.): ২য় সংস্করণ, কলকাতা, বঙ্গবাসী ইলেট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৪.

শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা, গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস,

সহযোগী উপাদান

অসমীয়া

ভকত, দ্বিজেন্দ্রনাথ:*রাজবংশী ভাষা সাহিত্যর পরিচয়* , গোলকগঞ্জ, সেন্টার ফর এথনিক স্টাডিস অ্যান্ড রিসার্চ, ২০০০।

সরকার, অম্বিকাচরণ: *কোচ রাজবংশী জাতির ইতিহাস আরু সংস্কৃতি,* বংগাইগাও, ১৯৭২।

ইংরেজী

Bandopadhyay, D: Land Reforms in West Bengal: Remembering Harekrishna Konar and Binay Chaudhury, *Economic and Political Weekly, Vol. XXXV. (No-21, 27th May 2000).*

Bandyopadhyay , Sekhar*: Caste, Politics and the Raj* (1872-1937), Calcutta, K.P. Bagchi & Co., 1990.

Bandyopadhyay , Sekhar*: Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal 1872-1947,* Richmond ,Surry, Curzon Press, 1997.

Bandyopadhyay, Sekhar*: Changing Border, Shifting Loyalties: Religion,* C*aste and the Partition in 1947* , Working Paper No.2, The Asian Studies Institute , Victoria University of Wellington, 1998.

Bandyopadhyay , Sekhar*: Caste, Culture and Hegemony* , New Delhi, Sage Publications, 2004.

Bandyopadhyay, Sekhar, Dasgupta, Abhijit and Van Schendel, William (eds): *Bengal: Communities, Development and State* , New Delhi, Manohar, 1994.

Banerjee Dilip: *Election Recorder, An Analytical Reference, West Bengal 1862-2012*, Kolkata, Star Publishing House, 2012.

Barma, Sukhbilas (ed): *Sociopolitical Movements in North Bengal (A Sub-Himalayan Tract)*, 2 Vols., New Delhi, Global Vision Publishing House, 2007.

Barman, Rup Kumar: *Contested Regionalism: A New Look on the History, Cultural Change and Regionalism of North Bengal and Lower Assam,* Delhi, Abhijeet Publications, 2007.

Barman, Rup Kumar: *From Tribalism to State: Reflection on the emergence of the Koch Kingdom,* Delhi, Abhijeet Publications, 2007.

Barman, Rup Kumar: Partition of Bengal and Struggle for Existaence of the Scheduled Castes: Impact of Partition (1947) on the Rajbanshis of North Bengal, *Voice of Dalit , Volume 2, No 2(July-December),* 2009, পৃ. ১৪১-১৬৩।

Barman, Rup Kumar: *The Partition of India and Its Impact on the Scheduled Castes of Bengal* , New Delhi, Abhijeet Publications, 2012.

Barman, Rup Kumar: 'From Pods to Poundra: A Study on the Poundra Kshatriya Movement for Social Justice 1891-1956', *Voice of Dalit, Vol-7, No.1, (January-June, 2014),* পৃ.-পৃ. ১২১-১৩৭।

Barman, Rup Kumar: 'State formation, Legitimacy and Cultural Change', *The Nehu Journal, VoI. XII, No.1(January-june 2014),* পৃ.-পৃ. ১৭-৩৫।

Barman, Rup Kumar: From Ethnographic Subject to Self-Respect Movement: The Scheduled Castes of Colonial Bengal in Historiographical Perspective, *The Quarterly Review of Historical Studies, Vol-LIV, Nos 3 & 4 (October 2014-2015)*, পৃ.পৃ. ৩৬-৩৭।

Barman, Rup Kumar: 'Changing Identities of the Scheduled Castes in Colonial and Post-Colonial Bengal,' in Sanjay K. Roy and Rajatsubhra Mukhopadhyay (eds): *Ethnicity in the East and North-East India,* '(New Delhi, Gyan Publishing House, 2015, পৃ.-পৃ. ৯৫-১১৪।

Barman, Rup Kumar: 'Yes! The Scheduled Castes Can write: Reflections on the Creative and Assertive Writings of the Scheduled Castes of Colonial Bengal', *Contemporary Voice of Dalit, Volume 8, No. 1 (May 2016),* পৃ.-পৃ. ৪৭-৬১।

Basu, Swaraj: *Dynamics of a Caste Movement: The Rajbanshis of North Bengal, 1910-1947,* (New Delhi, Manohar, 2003).

Basu, Swaraj*:* 'Colonial State and Indigenous Society: The Creation of the Rajbanshi Identity of Bengal', in Sekhar Bandyopadhyay, Abhijit Dasgupta, William Van Schendel (eds): *Bengal: Communities, Development and State* , New Delhi, Manohar, 1994, পৃ.পৃ. ৪৩-৬৪।

Bhattacharyya, Pranab Kumar : *Kamata Cooch Bihar in Historical Perspective,* Kolkata, Ratna Publication, 2000.

Chandra, A.N.: *The Sannyasi Rebellion,* Calcutta, 1977.

Chatterjee, Debi,: *Ideas and Movements against Caste in India*, Calcutta, Print O Graph Publishing, 1998.

Chatterjee, Joya : *Bengal Divided; Hindu Communalism and Partition 1932-47*, Cambridge University Press, 1994.

Chatterjee, Partha: *The Land Question,* Calcutta, K. P. Bagchi & Co. 1984.

Chatterjee, Partha: *The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism,* Delhi, Oxford University Press, 1997.

Chatterjee, Suranjan: 'New Reflections on the Sannyasi, Fakir and Peasants War', *Economic and Political Weekly , Vol. 19.No.4 (January 28, 1984),* পৃ-পৃ. PE 2-PE 13;

Chatterji, Suniti Kumar : *Kirata- Jana- Kriti: The Indo-Mongoloids, Their contribution to the History and Culture of India* , Calcutta, The Asiatic Society, 1951.

Chattopadhyay, Gautam *: Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle 1862-1947* , Delhi, Indian Historical Studies, 1984.

Das, Dhirendra Nath: *Regional Movements: Ethnicity and Politics,* Delhi, Abhijeet Publications, 2005.

Das, Naren: Uttar Banga Tapasili Jati O Adibashi Sangathan (UTJAS): A Dalit Student Movement, in Sukhbilas Barma (ed): *Socio-Political Movement in North Bengal, Vol .I* , New Delhi, Global Vision Publishing House, 2007., পৃ. পৃ.১৩৭-১৬৪।

Dasgupta, Atis: The Fakir and Sannyasi Rebellion , *Social Scientists , Vol.10, No 1(January ,1982),* পৃ-পৃ.৪৪-৫৫।

Debnath, Sailen(ed): *Social and Political Tensions in North Bengal since 1947,* Siliguri, N.L. Publishers, 2007.

Dirks, Nicholas B. : *Castes of Mind: Colonialism and Making of Modern India*, New Delhi, Permanent Black, 2008.

Dutt, Nripendra Kumar: *Origin and Growth of Caste in India* (*Volume I & Volume II Combined),* Calcutta, Firma KLM Mukopadhyay, Pvt. Ltd, 1986.

Guha, Ranajit (ed): *Subaltern Studies-I: Writings on South Asian History and Society*, Delhi, Oxford University Press, 1982

Kashyap, Subhas C.: *Our Constitution: An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law* , New Delhi, NBT, 2007.

Kumar, Radha : The Troubled History of Partition, *Foreign Affairs, Vol. 79 (Jan/ Feb. 1997).*

Mandal, Ranjit Kumar: *Ray Saheb Panchanan: Life and Times,* New Delhi, All India Forum for Development of the Rajbanshis, 2002.

Moon, Vasant Moon (ed): *Dr. Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches, Vol-9,* Bombay, Govt. of Maharastra, 1991.

Moore, R.J.: *Churchill, Cripps and India 1939-1945*, Oxford, Clarendon Press, 1979.

Nath, D.: *History of Koch Kingdom,* Delhi, Mittal Publications, 1988.

Paswan, Sanjay and Jaideva, Paramashi (edited): *Encyclopaedia of Dalits in India: Human rights: new Dimensions in Dalit Problems, Vol-4 Leader,* Delhi, Kalpaz Publications, 2004.

Potter, D.C.: Manpower shortage and the end of colonialism: The Case of Indian Civil Service, *Modern Asian Studies, 7 (1993),* পৃ.-পৃ. ৪৭-৭৩.

Ray, Haripada : The Genesis of Uttarkhanda Movement, in Sukhbilas Barma (ed): *Socio-Political Movements in North Bengal (A Sub-Himalayan Tract);* (New Delhi, Global Vision Publishing House, 2007), Vol.I, পৃ.- পৃ. ১১২-১২১।

Sanyal, Charu Chandra: *The Rajbanshis of North Bengal,* Calcutta, The Asiatic Society, 1965.

Sanyal, Hitesranjan: *Social Mobility in Bengal,* Calcutta, Papyrus, 1985.

Sarkar, I.: *The Kamtapuri Movement: Towards a separate State,* in G.C Rath (ed): *Tribal Development in India*, New Delhi, Sage, 2006, পৃ.-পৃ. ১৫৩-১৬৫।

Sarkar Mahua: *The Other Backward Classes in Bengal : Exclusion, Exploitation and Empowerment ,* An unpublished article in an ICSSR

sponsored Project with thrust area on the Other Backward Classes , Exclusion, Empowerment and Modernisation.

Sarkar, Sumit : *Modern India 1885-1947* , Bombay, Macmillan India Limited, 1996.

Singh, Anita Inder: *The Origins of the Partition of India 1936-1947*, Delhi, Oxford University Press, 1987.

Singh, Ekta: *Caste System in India: A Historical Perspective* , Delhi, Kalpaz Publications, 2005.

Wilson, Jon E.: A Thousand Countries to Go , *Past & Present , No.189 (November , 2005),* পৃ-পৃ. ৮১-১১০।

Yagati, Chino Rao: *Dalit Studies: A Bibliographical Handbook*, New Delhi, Kanishka Publishers and Distributors, 2003.

বাংলা

ঘোষ, আনন্দগোপাল: 'উপেন্দ্রনাথ বর্মন ও তৎকালীন উত্তরবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতি ', ইছামুদ্দিন সরকার (স): *ঐতিহ্য ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ,* ডিব্রুগড়, এন.এল. পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ.-পৃ. ৪৬০-৪৭৮।

চৌধুরী, নির্মল চন্দ্র: *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজবংশী সম্প্রদায়,* জলপাইগুড়ি, ১৯৮৫।

চ্যাটার্জী, জয়া: *বাংলা ভাগ হলঃ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশবিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭,* আবুজাফর (অনুবাদক), ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস, লিমিটেড, ২০০৩।

ডাকুয়া, দীনেশ: *কামতাপুরী একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী জনবিরোধী আন্দোলন,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩, পৃ. ২৪।

দাশ, নির্মল: *উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ* , কলকাতা, ওরিএন্টাল বুক কোঃ, ১৯৮৪।

পোদ্দার, অরবিন্দ: *পশ্চিমবাংলা, রাজনৈতিক সমাজতান্ত্রিক বৃত্তে পঞ্চাশবছর,* কলকাতা, প্রত্যয়, ২০০০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও দাশগুপ্ত, অভিজিৎ (স) : *জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ,* দিল্লী, আইসিবিএস, ১৯৯৮

বর্ম্মন, কলিন্দ্রনাথ: ‘*একটি বিরাট জিজ্ঞাসা ওরা বাঙালী না বাহে?* ’ , শিলিগুড়ি, পঞ্চানন আশ্রম, ১৩৭৭)।

বর্মন, রূপ কুমার: ‘জাতি পরিচিতি গঠন, উত্তরণ ও এলিট নেতৃত্ব : ঔপনিবেশিক বাংলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি সমীক্ষা’ , *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৮,* কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪, পৃ. পৃ ২৮৩-২৯১।

বর্মন, রূপ কুমার: বিভাজন ও সংযোজনের অনুরণন : জেলা কোচবিহার, বাংলা বিভাজন ও কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ; *উত্তর প্রসঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা-১* , কোচবিহার, দেবব্রত চাকী, ২০১১.

বর্মন, রূপ কুমার: বাংলার নিম্নবর্ণীয় (তপশিলি) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান, বিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি, *অন্তর্মুখ, পর্ব -৩, সংখ্যা ৩, (জানুয়ারী-মার্চ, ২০১৪),* পৃ.পৃ. ১০৬-১২১।

বর্মা, সুখবিলাস: *রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়,* ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পাদিত): *ঐতিহ্য ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ,* ডিব্রুগড়, এন.এল.পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ.-পৃ. ১৫৫-১৮১।

বসু, জ্যোতি: *যতদূর মনে পড়ে, রাজনৈতিক আত্মকথন,* দ্বাদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) : *১৯৬৪ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী,* একবিংশতিতম মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

মজুমদার, বীরেশ: *শ্যামাপ্রসাদ ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব,* কলিকাতা, জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৬।

মণ্ডল, শিবেন্দ্রনারায়ন: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* , গৌরীপুর, ইণ্ডিয়া প্রেস, ১৯৭২।

মল্লবর্মন, অদ্বৈত: *তিতাস একটি নদীর নাম,* অচিন্ত্য বিশ্বাস (স): *অদ্বৈত মল্লবর্মন রচনা সংগ্রহ* , কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০০০।

রায়, সুপ্রকাশ: *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম,* কলকাতা, ১৯৬৬।

হালদার, বিমলেন্দু: পৌণ্ড্র সমাজ ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ, *সমাজ দর্শন (আগষ্ট ২০০৯),* পৃ.পৃ. ৪-৬।

হোড়, সোমনাথ: *তেভাগার ডায়েরী,* কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৯১।

পত্র-পত্রিকা

উত্তরবঙ্গ, সাপ্তাহিক ১ এপ্রিল, ১৯৬৫।

পরিবর্তন (১৬ই আগষ্ট, ১৯৮০)।

বঙ্গীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি: সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৮৬।

সমাজ দর্শন (আগষ্ট , ২০০৯)।